নীলকণ্ঠ

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩·১·১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা·৬

পাঁচ টাকা

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৬
প্রচ্ছদ শিল্পী : শিবপ্রসাদ দাস

উৎসর্গ

শ্রীমতী মঞ্জু দে

কল্যাণীয়াসু

: রচনাকাল :

৪ঠা ফেব্রুয়ারি : ১৯৫৮ : মঙ্গলবার সকাল

থেকে

৯ই এপ্রিল : ১৯৫৯ : বৃহস্পতিবার সকাল

কলিকাতা

এই লেখকের

অন্য নগর
এই মর্ত্তভূমি
দূরের মিছিল
মনে মনে
মুখর লণ্ডন
ছায়া মারীচ
নতুন বাসর
ইভনিং ইন প্যারিস
জন সম্রাট
ব্যালেরিনা
দুর্গতোরণ
অন্তঃপুর
প্রদক্ষিণ
সুধাসঙ্কেত
স্মরণচিহ্ন

नीलकंठी

॥ এক ॥

আলো আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিল দিবানাথ। একেবারে দরজার মুখে। মূক অন্ধকারের মতো। বাইরে শরতের ক্লান্ত আলো তখনও মিলিয়ে যায়নি। হয় তো গোধূলি।

বেরুবার মুখে দিবানাথকে দেখে থমকে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল ঊর্মিলা। মূর্তিমান বাধা হয়ে সে যেন তার সামনে যাবার পথ আগলে আছে।

ঊর্মিলা অপ্রসন্ন হল। টিপটা বেঁকে গেছে কিনা কে জানে। যদিও পাখা চলছে বন বন করে তবুও গুমোট গরমে ঘাম জমে ওঠে কপালে। ঊর্মিলা বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মুখে আলগোছে রুমাল বুলিয়ে নিল একবার।

আজও তার কাছে কি চায় দিবানাথ? কেন সে সরে যায়না সামনে থেকে। অন্ধকারের মতো আস্তে আস্তে নয়, ট্রেনের দমকা চঞ্চলতায় মুহূর্তে সরে যাওয়া গাছ পাথরের মতো।

মুখে কথা আসেনা ঊর্মিলার। চুপ করেই সে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে যাওয়ার কথাও বলতে পারে না দিবানাথকে।

দিবানাথ আস্তে কথা বলল, বেরুচ্ছ?

তার প্রসাধন দেখে কি সেকথা বুঝতে পারেনা দিবানাথ? বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে ঊর্মিলার মুখে। একবার ঘড়ি দেখে। কিন্তু আলো জ্বালায় না। উত্তর দেয়না দিবানাথের প্রশ্নের।

ঊর্মিলা কথা না বললেও দিবানাথ জিজ্ঞেস করল আবার, কোথায় যাচ্ছ?

একটু কাজ আছে—

হঠাৎ হেসে উঠল দিবানাথ, কোন কাজ নেই। আমি জানি তুমি অজয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ—

জানেন তো জিজ্ঞেস করছেন কেন?

ঊর্মিলা মুখ নামায়। মেঝের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। দিবানাথের মুখের দিকে তাকাতে চায় না—ইচ্ছেও করে না। সরে যায়না দিবানাথ। দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকে।

বল?

কি বলব? উত্তেজনার শিহর খেলে ঘরের দেয়ালে। যা শুনছি তা কি সত্যি?

কি শুনছেন?

ম্লান হাসি লেগে থাকে দিবানাথের মুখে। বাইরে মিলিয়ে যাওয়া গোধূলির আলোর মতো, তুমি নাকি অজয়কে বিয়ে করবে?

ঊর্মিলার মাথার মধ্যে কেমন এক অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয় দিবানাথের প্রশ্ন শুনে। মেজাজটা থিতিয়ে যায়। শুধু দিবানাথকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কিছুই করতে পারে না ঊর্মিলা। কথা বলতেও যেন কষ্ট হয়।

নিশ্চল হয়ে দিবানাথ আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। হতাশার একটা রেখা ফুটে ওঠে তার চোখে। তার পক্ষে বোঝা কঠিন হয় না যে ঊর্মিলা তার কথার উত্তর আর দিতে পারবেনা। এমন

স্পষ্ট প্রশ্ন করেছিল বলে নিজেই লজ্জা পায় দিবানাথ। কিন্তু অন্য কি কথা বলে এই অস্বস্তিকর অবস্থা কাটিয়ে উঠবে হঠাৎ ভেবে পায় না।

আমার কথায় কিছু মনে কর না, অকারণে একটা হাত পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে দিবানাথ বলে, তুমি যদি নিজের থেকে আমাকে সামান্য ইঙ্গিত দিতে তাহলে আমি তোমাকে এমন প্রশ্ন করতাম না—

উর্মিলা বাধা দেয়, ইঙ্গিত দেবার কথা আপনি কেন বলছেন আমি বুঝতে পারছি না, একটু থামে উর্মিলা, আপনার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ছিল সেকথা ঠিক, কিন্তু এমন কোন সম্পর্ক ছিল না যার জন্যে জীবনের সব কথা আপনাকে জানাতে হবে—আপনার অনুমতি নিতে হবে—

উর্মিলা! দিবানাথের গলার স্বর অস্বাভাবিক রকম দৃঢ় শোনায়, তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। মনে সেই শ্রদ্ধা নিয়েই আমাকে চলে যেতে দাও, অন্ধকারে এক দৃষ্টিতে উর্মিলার মুখের দিকে তাকিয়ে দিবানাথ বলে, অবান্তর কথা বলে শুধু আমার কাছে নয়, কারুর কাছে কখনও নিজেকে ছোট কর না, কয়েক পা পিছিয়ে আসে দিবানাথ, আমি যাই।

সরে গেল। চলে গেল। উর্মিলা জানে আর কোনদিনও আলো আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকতে আসবে না সে। না আসুক। কিন্তু আলো আসবে চারদিক থেকে। তাই তো চায় উর্মিলা।

ঘর কিন্তু তখন হালকা অন্ধকারে ভরে গেছে। আলোর সুইচটাও আর দেখা যাচ্ছে না। সেটা কোথায় উর্মিলা জানে বলেই যেন মনে মনে দেখতে পায়। তবু সেটার কাছে সে

এগিয়ে যায় না। কিছুক্ষণ আলো জ্বালাতে ইচ্ছে করে না তার।

পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে ঊর্মিলা। অন্ধকারেই। কয়েক-মুহূর্তের জন্যে বাইরে বেরুবার কথা যেন ভুলে যায়। একটু আড়ালে থাকতে চায়। সকলের অলক্ষ্যে নিজের সঙ্গে কিছুক্ষণ বোঝাপড়া করে নিতে চায়। কিন্তু তা কতক্ষণের জন্যেই বা।

মা এখনও ফেরেননি। দাদা বৌদিও বাড়িতে নেই। বুড়ি ঝি আর চাকর কথা কাটাকাটি করছে রান্না ঘরে। আর হাওয়া হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে গেছে। আলো মিলিয়ে গেছে বাইরে। রাস্তার সামনেই ঘর। কিন্তু পথিকের গলার স্বর আর পায়ের শব্দ কানে যায় না ঊর্মিলার।

দিবানাথের কাছে অতটা কঠিন হয় তো না হলেও চলত। একটু চেষ্টা করলেই হালকা হাসি হেসে সব ব্যাপারটাকে ঊর্মিলা সহজ করে নিতে পারত। দিবানাথ স্পষ্ট প্রশ্ন করলেও হাসি-মুখে অস্পষ্ট উত্তর দিলে হয় তো এই ঘরে বসে থাকা অসহ্য মনে হত না।

ছোট কথা নিয়ে বেশি ভাবে আর তুচ্ছ কথা বড় করে দেখে বলে নিজেকে অনেক সময় ক্ষমা করতে পারে না ঊর্মিলা। শুধু দিবানাথের সঙ্গে কেন, তার অন্যান্য অনেক বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ স্বরে ঝাঁজ প্রকাশ পায় ঊর্মিলার। পরে নিজেই দুঃখ পায় সে। অবসাদে ভেঙে পড়ে। আর মনে হয়, সে এখনও জানে না কখন কোথায় কতটা বলা উচিত।

অজয়ের সঙ্গে সম্পর্ক এমন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করবার কোন অধিকার এখনও যে সে পায়নি সেকথাটা আর একটু আগে বুঝতে

পারলে অন্ধকারে চেয়ারের ওপর তাকে এতক্ষণ এমনভাবে বসে থাকতে হত না।

নিজেকে নির্লজ্জ দীন বলে উর্মিলার মনে হয়। আশ্চর্য, অজয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটা সে জাহির করতে পারল কেমন করে। উর্মিলা যেন একটু ভয় পায়। যদি কথাটা কোন রকমে অজয়ের কানে যায় তাহলে কেমন করে লজ্জার বোঝা বহন করবে সে। এমনি অন্ধকারেই বোধ হয় বসে থাকতে হবে দিনের পর দিন।

কিন্তু দিবানাথকে বুঝিয়ে দেবার সময়ও তো হয়েছিল। মনে মনে লজ্জা পেলে হবে কি, সেকথাটাও ভেবে দেখবার দরবার বইকি উর্মিলার। অজয়ের পাশে সে ঐশ্বর্য নিয়েই যেতে চায়, দৈন্য নিয়ে নয়। দৈন্যের মতোই দিবানাথ যে তার জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেকথাটা কাউকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা নেই উর্মিলার।

সে নিজেও তো জানত না যে এই ঘরের বাইরে, যতীন দাস রোড পেরিয়ে জীবনের পরিধি চলে গেছে অনেক দূর অবধি। এত দূর যে দিবানাথ হারিয়ে যায়, ম্লান হয়ে যায়, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

একমাত্র দিবানাথকেই তাদের বাড়িতে দেখত উর্মিলা। আর কাউকে নয়। আর যাদের দেখত, তারা দেখতে পায়নি তাকে। দেখতে পেলেও, দিবানাথের চোখ দিয়ে দেখেনি সেকথা ঠিক।

একটু একটু করে সব কথাই মনে পড়ে উর্মিলার। একেবারে প্রথম দিন থেকে আজ অবধি। কিন্তু এই শেষবার। এমন ভাবনা ভেবে জীবনে কোন দিন সে আর এতটুকু কষ্ট পাবে না। কোন দোষ নেই তার।

যদিও প্রাণপণে সব দিক বজায় রাখবার চেষ্টা করেন কমলা; তবুও সংসারে অগোছাল ভাবটাই বেশি। শান্তির নিস্তব্ধতা আছে, আনন্দের কোলাহল নেই। প্রথম প্রথম কিছু বুঝতে পারত না উর্মিলা। বাড়ি ফিরে মাকে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করত, মা, বাবা, কোথায়?

ছায়া নামত কমলার মুখে। মেয়েকে আদর করে বলতেন, কলকাতার বাইরে বাবার আপিস কি-না। তোমার বিয়ের সময় ছুটি নিয়ে আসবেন তিনি। তখন তোমার বাবাকে দেখবে মা—

কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে শিখল উর্মিলা। এখন মাকে সে আর তার বাবার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে না। অন্য কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সে বলে, বাবা বাইরে আছেন। ছুটিতে-ছুটিতে আসেন। কিন্তু উর্মিলার বাবাকে কখনও দেখতে পায় না তার কোন বন্ধু-বান্ধব। সে নিজেও দেখতে চায় না তাঁকে। একান্ত প্রয়োজন না হলে বাবার নামও উচ্চারণ করে না কখনও।

কিন্তু কথাটা জানে সবাই। এত বড় কথা গোপন করা যায় না। কমলাও গোপন করতে চান না। সব সময় সতর্ক থাকেন, পাছে নিজের করুণ ইতিহাস ছেলে মেয়েদের কাছে বলতে বলতে হঠাৎ স্বামীর নিন্দে করে বসেন—পাছে জিতেন্দ্রনাথের ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে তাঁর সন্তান।

কমলা তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কথাই বলেন না ছেলে মেয়েদের। নিজের ঘাড়েই সব দোষ নেন। কথা বলতে লজ্জায় গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। চোখ বন্ধ করে তিনি বলেন। বলতে তাঁকে হবেই।

তোমার বাবা বড় ঘরের ছেলে ছিলেন। কিন্তু আমাকে বিয়ে করবার পর তোমার দাদু তাঁর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তোমার বাবার জেদ ছিল সাংঘাতিক। তিনি একটা চাকরি জোগাড় করে নিলেন। সামান্য চাকরি। আমাকে নিয়ে একটা ছোট বাড়িতে এসে উঠলেন।

কথা বলতে বলতে কমলা ফোঁপাতে থাকেন। একটু পরেই মনে হয় নিজের মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন তাই সাবধান হয়ে চোখের জল চাপবার চেষ্টা করেন।

কমলা বিষাদের ছায়া এ বাড়িতে ফেলতে চান না। নিজে সারা-জীবন ধরে দুঃখ ভোগ করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু এতটুকু দুঃখ যেন কোনদিনও তাঁর ছেলে মেয়েদের স্পর্শ করতে না পারে। তাই বাড়িতে সব সময় আনন্দের প্রবাহ বইয়ে দিতে চান। ছেলে মেয়েদের ছেলেমানুষীর সঙ্গে সমানে তাল মেলান। জোরে জোরে হাসেন। ছুটি থাকলেই ওদের সঙ্গে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান।

চোখের জল কঠিন হাতে মুছে ফেলেন কমলা। বিদ্রোহ করে একবার জ্বলে উঠতে ইচ্ছে করে। সমস্ত শক্তি দিয়ে স্বামীর অমানুষিক আচরণের প্রতিবাদ জানাতে চান। কিন্তু না, মেয়ের কাছে কিছুতেই তিনি ছোট হতে পারবেন না। বিষ ছড়িয়ে দেবেন না মনে। ঊর্মিলা যেন কোনদিনও তার বাপকে ঘৃণা করতে না শেখে। সে জানুক, দোষ কারুরই নয়, দোষ শুধু কমলার ভাগ্যের। যদিও ভাগ্য এখন আর মানেন না তিনি।

কমলা বলতে থাকেন, তোমার দাদু একদিন অভিশাপ দিয়ে গেলেন আমাকে—তাঁর যে ছেলেকে আমি ছিনিয়ে নিয়েছি তাকে বেশিদিন আমিও রাখতে পারব না, কথা বলতে বলতে কমলা হঠাৎ

থেমে যান। স্থির দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, একা একা যখনই সেকথা ভাবতাম তখনই আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে যেত। তোমার বাবাও সেকথা জানতেন।

দিনে দিনে তাঁর পরিবর্তনও আমি লক্ষ্য করছিলাম। তিনি যেন ঝিমিয়ে যাচ্ছেন। বিষণ্ণতার অদ্ভুত প্রতিমূর্তির মতো সেই ছোট ঘরে তিনি চলাফেরা করতেন। হাসতেন না। কথা বলতেন আস্তে। ক্লান্ত স্বরে।

ঊর্মিলা জিজ্ঞেস করে, কেন মা?

বলেছি না বড়লোকের ছেলে? কষ্ট তো হবেই সকলকে ছেড়ে অমনভাবে থাকতে। অথচ সব সময় ভয় পাছে আমি আঘাত পাই—তাই আমাকে বোঝাতেন, ভাল একটা চাকরি জোগাড় করতে পারছেন না বলেই ভাবনায় পড়েছেন। আমি অসুবিধার মধ্যে আছি—এটা তাঁর ভাল লাগছে না।

বলতাম, কিন্তু তোমার এভাবে বাস করবার কথা আমিও ভাবতে পারছি না। তাই, হাতটা টেবিলের ওপর আস্তে রাখেন কমলা, লেখাপড়া তো কিছু কম শিখিনি, একটা ভাল ইস্কুলে পড়াই কিছুদিন—

কথা শেষ করতে পারতাম না। ঊর্মি! তিনি কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কিছু বলতেন না বটে, কিন্তু তোমার বাবার সে চেহারা দেখে আমার চাকরি করবার সাধ উড়ে যেত।

ছেলেবেলায় ঊর্মিলা মার কথা শুনে কি বুঝত কে জানে। জ্ঞান হবার পর থেকে সে কিন্তু মাকে চাকরি করতেই দেখছে। সে দেখছে দিনরাত্রির পরিশ্রমেও ক্লান্তি কখনও আসে না তার মার শরীরে। মুখে হাসি। দেহে লাবণ্য। বিরক্তির লেশমাত্র নেই কোথাও।

কলকাতা শহরে সবদিক বজায় রেখে একটা বড় সংসার ঠিক মতো চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। কমলা শুধু ইস্কুলে পড়ান না, সকালে দুজন আর বিকেলে তিনজন ছাত্রীকেও বাড়ি গিয়ে পড়াতে হয় তাঁর। তা ছাড়া দু-একজন এ বাড়িতেও পড়তে আসে মাঝে মাঝে। কিন্তু কখনও কোন অভিযোগ তোলেন না কমলা। হয় তো কোনদিন রসিকতার সুরেই ছেলে মেয়ের সামনে বলে বসেন, ব্যস, এখন উর্মির একটা ভাল বিয়ে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি!

মায়ের মৃত্যুর কথায় বোধহয় তত বিচলিত হয় না উর্মিলা। নিজের বিয়ের কথাটা ভেবেই একটু লজ্জা পায়। মুখ নামিয়ে বলে, আগে দাদার বিয়ে দাও মা।

ছেলের কথা ভেবেই হয় তো কমলা মৃত্যুর জন্যে সহজ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। পড়াশুনোয় রীতিমতো ভাল শিবেন! প্রথম শ্রেণীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পাশ করে দিন কয়েক হল একটা সরকারী কলেজে দর্শনের অধ্যাপকের কাজ পেয়েছে। তার বিয়ের কথাটা এখন ভাববার দরকার বইকি কমলার।

শিবেন উর্মিলাকে তাড়া দিয়ে বলে, থাম তুই। সব সময় পাকা পাকা কথা ভাল লাগে না আমার—

পাকা কথা বললাম কখন? ফস করে মাকে কথাটা বলেই ফেলে উর্মিলা, জান মা, দাদা বোধহয় বাণীদিকেই বিয়ে করবে—

শিবেন কিছু বলবার আগে হেসে ওঠেন কমলা, বেশ তো। লক্ষ্মী মেয়ে বাণী। শিবু আর দেরি করিস না বাবা, এবার তো চাকরি হল—বুঝলি না, সংসারের কত সুবিধা হবে বৌমা এলে।

চিৎকার করে ওঠে শিবেন, ঊর্মি কি করে সারাদিন? সংসারের সুবিধা-অসুবিধার কথা ও ভাবতে পারে না?

ঊর্মিলাও গলার স্বর তোলে, না না না। আমার পড়াশুনো আছে, গানের ইস্কুল আছে—

কমলা বলেন, ঠিক কথাই তো রে শিবু, হাসি ফুটে ওঠে তাঁর মুখে, ওইটুকু মেয়ে কত দিক আর সামলাবে বল? তার চেয়ে বাণীকে তাড়াতাড়ি আমি এ সংসারে নিয়ে আসি। দুজনে মিলে সংসারটা কিছুদিন চালিয়ে নিক। তোদের কল্যাণে আমি বিশ্রাম করে নি কিছুদিন!

কে তোমাকে বারণ করেছে বিশ্রাম করতে? আগে তুমি ট্যুশানিগুলো ছাড়। এই বয়সে অত পরিশ্রম করলে শরীর ভেঙে পড়বে একেবারে।

সব ছাড়ব রে শিবু, টেনে টেনে কথা বলেন কমলা, সব ছাড়ব। দাঁড়া না ঊর্মির বিয়েটা চুকিয়ে দিই আগে—

শিবেন মায়ের কথা শুনে বিরক্ত হয়ে ওঠে, একটার পর একটা বাধা তোমার সব সময় থাকবে। তুমি কোনদিন ছুটোছুটি করা ছাড়বে না।

তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক রে শিবু। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন মুহূর্তের জন্যেও অক্ষম না হয়ে পড়ি। কাজ না থাকলে আমি বাঁচতে পারব না রে।

কমলার কথা বলবার ধরনই এমন। কিন্তু আসল কথাটা বোঝবার বয়স ঊর্মিলার এখন হয়েছে। কমলা প্রতি মুহূর্তের সচেতনতায় টুকরো কথার ফাঁকে ফাঁকে জিতেন্দ্রনাথের ক্রটি যতই গোপন করে চলতে চান ততই অস্বাভাবিক কড়া ঝাঁজের ছিটেয়

ঊর্মিলার মনটা যেন জ্বলে যায়। স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার এক কণাও বাপের জন্যে জমা থাকে না কোথাও। জ্বালা আর বিতৃষ্ণা মিশে এক অদ্ভুত অনুভূতি পেয়ে বসে ঊর্মিলাকে। সে বোঝে তার জন্যে কমলার ভাবনার শেষ নেই। শুধু ভাবনা নয় একটা বিশ্রীরকমের ভয়ও বোধহয় আছে।

কিন্তু ভয় কি ঊর্মিলার নিজেরও একেবারে নেই! কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যাওয়া, হাসতে হাসতে হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে ওঠা, আলোচনা করতে করতে হঠাৎ নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়া তো আজকাল ঊর্মিলার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেক বুঝে তাকে চলতে হয়। অনেক ভেবে তাকে কথা বলতে হয়। আর সব চেয়ে বড় কথা হল, মিথ্যার সাহায্য নিয়ে কৌশলে তাকে জিতেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে হয়।

ঊর্মিলা স্বরে অহঙ্কার কাঁপিয়ে কখনও কাউকে বলতে পারে না যে সে যখন দু বছরের আর তার দাদা যখন সাত বছরের তখন তাদের সকলকে ফেলে এক নিষ্ঠুর অমানুষ ভাল চাকরি খোঁজবার নাম করে দিল্লী চলে যান। তারপর অসুখের ভান করে বারবার টাকা চেয়ে পাঠান কমলার কাছ থেকে। সারা দিনরাত টাকা জোগাড়ের চেষ্টায় ছুটোছুটি করে বেড়ান তার মা। একটি একটি করে অলঙ্কার বিক্রি করেন। উন্মাদিনীর মতো ছুটে যেতে চান দিল্লীতে স্বামীর কাছে।

কিন্তু তখন অনেক দায় কমলার। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। অর্থাভাব। এমন কেউ তাঁর ছিল না যার ওপর সংসারের দায়িত্ব চাপিয়ে দিল্লীতে স্বামীর কাছে চলে যেতে পারেন।

জিতেন্দ্রনাথ সেরে উঠলেন বটে একদিন কিন্তু কলকাতায় আর

ফিরে এলেন না। তাঁর যে অসুখ করেছিল সেকথা ঊর্মিলার আজ আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। সব মিথ্যা। ওটাও তার বাবার টাকা আদায় করবার একটা ছল। ঊর্মিলার মনে হয়, কমলার কাছ থেকে অসুখের ভান করে টাকা নিয়ে, সেই টাকায় তিনি দিল্লীতে বসে আর একটা বিয়ে করেছিলেন।

শুধু যে সেই একবারই কমলার কাছ থেকে জিতেন্দ্রনাথ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন তা নয়, আজও দিল্লীর ছাপ মারা খাম আসে মাঝে মাঝে। ঊর্মিলার কাছেও অনেক সময় তার মার নাম লেখা চিঠি দিয়ে যায় ডাকপিওন। চিঠি দেখেই বুঝতে দেরি হয় না তার, এ চিঠি জিতেন্দ্রনাথের লেখা। কি লেখা আছে সেকথাও যেন ঊর্মিলা বুঝতে পারে। নিশ্চয়ই টাকার কথা লিখেছেন তার বাবা।

মা কিন্তু সব সময় অন্য কথা বলেন। আমরা কেমন আছি উনি জানতে চান। তোদের ওঁর খুব দেখতে ইচ্ছে করে—এইসব কথা লিখেছেন আর কি।

কে জানে লিখেছেন কিনা। না লিখলেই বা কি এসে যায় ঊর্মিলার। সে নিজে জিতেন্দ্রনাথের কোন কথাই কিন্তু জানতে চায় না আর। ঊর্মিলার জীবনের পরিধি সংকীর্ণ করে দিয়েছেন তার বাবা। তাঁর জন্যে এতটুকু মমতা নেই ঊর্মিলার মনে।

হয় তো লেখেন তার মাকে ছেলেমেয়েদের কথা জিতেন্দ্রনাথ। কিন্তু সেটা বোধ হয় শুধু লৌকিকতার খাতিরে লিখতে হয় বলেই লেখেন। ছেলেমেয়েদের কথা আসল বিষয়বস্তু নয় তাঁর চিঠির, কিছুদিন পর মণিঅর্ডারের কুপন দেখেই সেকথা স্পষ্ট বুঝতে পারে ঊর্মিলা। আর মার ওপর রাগ হয় তার।

কি প্রয়োজন তাঁর একজন অমানুষের জন্যে সারা জীবন দুঃখ

ভোগ করবার—নিজেকে বঞ্চিত করে এক অকৃতজ্ঞ প্রবঞ্চকের খেয়াল চরিতার্থ করবার। উর্মিলার জীবনে জীবন্ত অভিশাপ হয়ে সারা দিন রাত ক্ষত বিক্ষত করছে তাকে তার বাপ। সে জানে এই পারিবারিক ওলট-পালটের জন্যে তার নিজের পরিধি নিদারুণ ভাবে সীমিত। জিতেন্দ্রনাথের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবাদ হিসেবে যেন চলা-ফেরার গণ্ডি টানা হয়েছে উর্মিলার জীবনে।

যদিও শিবেনের বিয়েটা একদিন বেশ ভালভাবেই দিলেন কমলা। ইচ্ছে করেই একটু বেশিরকম আয়োজন করেছিলেন তিনি। অনেক আলো জ্বলে উঠেছিল। অনেক লোক এসেছিল। অলঙ্কার, আবরণ আর অজস্ররকম উপহারের স্তূপ জমে উঠেছিল শিবেনের ফুলশয্যার রাতে।

কিন্তু সেইদিনই একসময় উর্মিলা লক্ষ্য করেছিল কী অস্বাভাবিক করুণ হয়ে উঠেছিল তার মায়ের মুখ। কয়েকদিন ধরে একটা চিঠির অধীর প্রতীক্ষা করেছিলেন তিনি। হয় তো ভেবেছিলেন শেষ অবধি নিজেই এসে পড়বেন জিতেন্দ্রনাথ। বিস্মিত চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবেন তাঁর সন্তানের দিকে। কত বড় হয়ে উঠেছে তাঁর সেই ছোট্ট শিবু! বাণীকেও সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আশীর্বাদ করে যাবেন।

অতিথিরা চলে গেল একে একে। কোলাহলও মিলিয়ে এল রাত গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে। অজস্র ফুলে ভরে উঠেছে দাদার ঘর। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। হঠাৎ মাকে কোথাও খুঁজে পেল না উর্মিলা। কমলা গেলেন কোথায়। এ সময় বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবার কথা নয় তাঁর।

সব ঘর খুঁজে স্নানের ঘরেও উঁকি দিল উর্মিলা। দরজা খোলা। অন্ধকার। মা নেই কোথাও। কাউকে কিছু বলতে পারে না উর্মিলা, শুধু এপাশে ওপাশে ঘুরে মাকে খুঁজে বেড়ায়।

ছাদের এক কোণে কমলা দাঁড়িয়ে আছেন। দূর থেকে দেখেও উর্মিলা বুঝতে পারে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমে উঠেছে তাঁর মনে। এই আনন্দের রাতে মূর্তিমতী বিষাদের মতো তার মা হয় তো বাবার কথা ভেবেই একান্তে চোখের জল ফেলছেন।

বিরক্তিতে কপালটা কুঁচকে যায় উর্মিলার।

জিতেন্দ্রনাথের কথা ভাবতে ইচ্ছে হয় না আজ তার। নাম মুখে এনে অমঙ্গলের সূচনা করতে মন চায় না দাদার বৌভাতের দিন। কেন কমলা সকলের অলক্ষ্যে এখানে দাঁড়িয়ে সেই অমানুষের কথা ভাবছেন। আস্তে আস্তে উর্মিলা তাঁর কাছে এগিয়ে যায়।

মা? বোধ হয় একটু জোরেই ডেকে ওঠে সে।

চমকে ফিরে দাঁড়ান কমলা, কে? উর্মি। কি হয়েছে রে?

তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ মা?

এই একটু হাওয়া লাগাচ্ছিলাম, কমলা তাড়াতাড়ি বলে যান, গরমটা আজ একটু বেশি পড়েছে না রে?

তুমি কাঁদছিলে মা?

যাঃ, কাঁদব কেন? এই মানে—ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেন কমলা। শক্ত করে চেপে ধরেন মেয়ের হাত। বুকে জড়িয়ে ধরেন মেয়েকে।

একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় উর্মিলা। মায়ের কান্নার তোড়ে তার বুকেও হঠাৎ কান্না জমে ওঠে। অদ্ভুত ধরনের একটা বিকট যন্ত্রণা। মার মাথাটা বুকে চেপে রাখে সে অনেকক্ষণ। বাপের ওপর রাগ

থাকে না তার এখন। মায়ের দুঃখটাই বড় হয়ে ওঠে। তারপর হঠাৎ বোধহয় দুজনেরই একসঙ্গে মনে হয়, আজকের রাতে এমন করে কাঁদতে নেই।

লেখাপড়া শিখে মায়ের মতো ইস্কুলে কাজ নিতে চায় না ঊর্মিলা। কমলা যে ইস্কুলে পড়ান সেকথা কাউকে বলতে আজ-কাল তার বেধে যায়। এ বংশে তার জন্ম অস্বীকার করতে পারলে ঊর্মিলার বুকের ওপর থেকে যেন একটা ভারী পাথর সরে যেত।

সেই পাথর সরিয়ে দেবার প্রাণপণ চেষ্টায় লেখাপড়া করে সে। গান শেখে। নাচের ইস্কুলে যায়। কলেজে অভিনয়ের ব্যাপারেও সকলকে ছাড়িয়ে যেতে চায়।

প্রত্যেকে মূল্য দিক তার গুণাবলীর! তাকিয়ে দেখুক তার রূপের দিকে। একমাত্র তারই নানা বর্ণচ্ছটায় ঘুচে যাক তার পরিবারের অপযশ।

ঊর্মিলার জীবনের ওপর জিতেন্দ্রনাথের ছুঁড়ে দেয়া অভিশাপ যে গণ্ডি কেটেছে তা সে ছাড়িয়ে যেতে চায় বলেই নিজেকে বিকশিত করবার এত উদ্যম তার। দাদার কথা তখন মনে থাকে না তার। মার কথাও নয়। নিজের ক্ষমতা দিয়ে শুধু জিতেন্দ্রনাথকে পরাজিত করে সমাজের সব চেয়ে উঁচু ধাপে পৌঁছতে চায় ঊর্মিলা। তার স্বপ্ন। তার জেদ।

দাদার সঙ্গে তার এদিক থেকে আগাগোড়া অমিল। বৌদির সঙ্গেও। মা বোধহয় তাকে একটু একটু সমর্থন করেন। অন্তত, তার কোন কাজে বাধা দেন না বরং কথায় কথায় উৎসাহ দেন।

অবাক হয়ে তার নাচ দেখেন। চোখ বন্ধ করে গান শোনেন। বারবার তার বুদ্ধির প্রশংসা করেন।

শিবেনও কখনও কিছু করতে বারণ করে না উর্মিলাকে। একটু বেশি রকম প্রশংসাই করে বসে মাঝে মাঝে। উর্মিলার মনে হয়, দাদা তাকে স্নেহ করে বলেই অত বাড়িয়ে দেয়। আর বৌদিও পতিভক্তির চরম আদর্শ হিসেবে দাদার কথায় ঘন ঘন সায় দেয়।

বাড়িতে একটু বেশি আদর পায় উর্মিলা। জিতেন্দ্রনাথের ভাবনা তাকে বিচলিত করতে না পারে বলেই হয়তো একটু বেশি রকম সতর্কতা অবলম্বন করেন বাড়ির সকলে। কিন্তু তা এই পরিবারের ওপর উর্মিলার আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয় না। অভিশাপের মতোই ভাবনাটা কাঁটা ফোটায় তাকে। মেজাজ রুক্ষ করে তোলে।

উর্মিলা মনে মনে অস্বীকার করতে চায় এ বাড়ির প্রত্যেককে। শিক্ষয়িত্রীর মেয়ে, চরিত্রহীন উধাও বাপের সন্তান আর এক সামান্য অধ্যাপকের বোন—কোনটাই সে মেনে নিতে পারে না নিজের ক্ষেত্রে। জ্বলে যায়। ছটফট করে। এদের প্রশংসার কোন অর্থ খুঁজে পায় না তাই।

যেন একতাল পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছে সে। মাথা তুলতে গেলেই একটা কঠিন আঘাতে আবার লুকিয়ে পড়তে হয়। পাঁচজনের কটাক্ষ টুকরা টুকরা জ্বলন্ত বারুদের মতো ফোস্কার অনুভূতি এনে দেয়।

তবে চোখের সামনে উর্মিলা দেখে শিবেন মেনে নিয়েছে সব। নিজেকে মানিয়েও নিয়েছে এই অস্বস্তিকর পরিবেশে। সহজ সাধারণ জীবন, যা কাম্য সাধারণ মানুষের, তাই তো খুশি মনে বেছে নিয়েছে তার দাদা। বৌদিও। তা না হলে শিবেনের মতো ছেলেকে বিয়ে করবার মধ্যে কি মাধুর্য দেখতে পাবে বাণী।

সকাল আসে প্রতিদিনের মতোই ওদের কাছে। ক্লান্ত দুপুর গড়িয়ে যায়। সন্ধ্যাও আসে ঠিক তেমনি করেই। ওরা কখনও কোন অভাবনীয়র স্পর্শে নতুন হয়ে ওঠে বলে মনে হয় না উর্মিলার। জীবনটা কেমন চাপা-চাপা মনে হয় ওদের। আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, উদ্দীপনার কোন চিহ্নই উর্মিলা দেখতে পায় না ওদের দেহে মনে।

নির্জনে কখনও কখনও উর্মিলার ভাবনার আকাশ কল্পনার ভিজে রঙ লেগে থম থম করে। এক-একটি মানুষ একেবারে অন্য রকম হয়ে এসে দাঁড়ায় তার চোখের সামনে। জন্মাবার ক্ষমতা নিজের হাতে থাকলে বোধহয় এক মুহূর্তে তা প্রয়োগ করে তেমন কোন পরিবারেই নিজের জন্ম সূত্র বেঁধে দিত উর্মিলা।

সংসারটা হত ভদ্র রকমের জীবন্ত। ধানভরা ক্ষেতের মতো ঐশ্বর্য প্রত্যেকটি মানুষকে সহজভাবেই সজীব করে তুলত সব সময়। রাতের অন্ধকার আর দিনের আলো প্রাণের জোয়ারে বেঁচে থাকা সার্থক করে তুলত উর্মিলার।

সংসারের ভার বহন করতে করতে শীর্ণ শুকনো হয়ে উঠত না মার মুখ। বয়স বেড়ে উঠত না রাতারাতি। পড়াশুনো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট কলেজের মাস্টার হয়ে 'দাদা শেষ করে দিত না তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। আর একজন সাধারণ ঘরোয়া মেয়ের মধ্যে শুধু বুদ্ধির স্ফূরণ দেখে তাকে আনত না জীবনসঙ্গিনীর সম্মান দিয়ে।

এক একটি মানুষ হত যৌবনের প্রতীক। নির্ভেজাল আলোর স্বাক্ষর। স্বচ্ছন্দ গতিতে আসা যাওয়া করত যেখানে খুশি সেখানে। সূর্য কিরণের মতো। প্রত্যেকের পরিচয় দিতে গর্বিত হাসির ছটায় সুন্দর হয়ে উঠত উর্মিলার ঠোঁট।

কিন্তু তা হবার নয়। তাই চোখ-জ্বালা করা কুয়াশায় ঢেকে যায় উর্মিলার কল্পনার আকাশ। শুধু জ্বালাটাই থেকে যায়। আর কিছু নয়।

উর্মিলা যদি জীবনের এমন কোন প্রতীকের সন্ধান পায়, অর্থাৎ সে নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করে কাউকে তাহলে হয়তো সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন তার মা। ছেলের বিয়ে ঘটা করে দিয়েও, কমলা ভাল করে জানেন যে মেয়ের বেলায় এমন যোগাযোগ ঘটে যাওয়া সহজ নয়।

যদিও তাঁর মেয়ের রূপ গুণ অনেকের ঈর্ষার কারণ ঘটায় তবুও ভাল ছেলের সন্ধান পেলে, মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব করতে বেধে যায় কমলার। কারণ অভিভাবকের পক্ষ থেকে বাধা যে আসবেই সে-বিষয়ে আজকাল তাঁর আর কোন সন্দেহ নেই। তাই মেয়ের বিয়ের কথা বেশি করেই তিনি ভাবেন।

এসব কথা বুঝে জ্বলে ওঠার বয়স উর্মিলার অনেকদিন হয়েছে। আর বাপের অপযশ উপলক্ষ্য করে আক্রোশ ছড়িয়ে পড়েছে পরিবারের প্রত্যেকের ওপর। কিন্তু কলঙ্ক ছাড়িয়ে যাবে না তার অহঙ্কার। পলাতক বাপকে এক অস্বাভাবিক দ্বন্দ্বে আহ্বান জানিয়ে কেমন উগ্র উল্লাসের স্বাদ পায় উর্মিলা।

আর সেই সময় এসে দাঁড়ায় দিবানাথ। হয়তো কাছাকাছি আর কোন মানুষের দেখা নেই বলে একেবারে পাশেই এসে দাঁড়ায় উর্মিলার।

উর্মিলা দেখে। এত কাছে কাউকে কখনও দেখেনি বলেই দিবানাথকে দেখতে মন্দ লাগে না তার। কিন্তু সেটা বোধহয় শুধু চোখের দেখাই। দিবানাথকে দেখতে দেখতে মন ভরে যায় না

পরিপূর্ণতার স্বাদে। তবু হঠাৎ কখন উর্মিলার মনে ছায়া পড়ে দিবানাথের।

শিবেনের কাছে আসত দিবানাথ প্রথম প্রথম। পড়ত। গল্প করত। অনেক কথা বলত কমলার সঙ্গে। আর আসতে যেতে চোখে চোখ পড়ত উর্মিলার। তখন হাসত দিবানাথ। সহজ মিষ্টি হাসি। উর্মিলাও চেষ্টা করত তেমন করে হাসতে।

ভাল আছেন ?

হ্যাঁ, উর্মিলা তাকাত দিবানাথের দিকে।

দিবানাথ দাঁড়িয়ে পড়ত, শুনলাম দিনরাত পড়ছেন—

না না। কিছুই তো করিনি সারা বছর—

আরও ভাল করে হাসত দিবানাথ, থার্ড ইয়ার থেকে মোটে তো ফোর্থ ইয়ার। এত পড়ে না কেউ।

কথা বলত না উর্মিলা। কথা শুনত। নিজের কিছু দেখাবার উৎসাহ জাগত না মনে কিন্তু মাথা তুলে দেখত দিবানাথের মুখ চোখ আর কপাল। কিছুই দেখবার মতো নেই দিবানাথের— উর্মিলা যা কিছু দেখতে চায়। তবু কথা শুনতে শুনতে দেখতে হত দিবানাথকে। আর তা শুধু চোখের দেখাই।

উর্মিলা নিজেই হয়তো বুঝতে পারেনি প্রথম প্রথম যে দিবনাথ একটা বড় অভাব ঘুচিয়ে দিয়েছিল তার। তার কাছে একেবারে প্রথম থেকেই কোন সঙ্কোচ ছিল না উর্মিলার। সঙ্কোচ বলতে সে কিন্তু শুধু তার গণ্ডির কথাই বোঝে।

বাড়ির পরিবেশে তৃপ্তি নেই। বাড়ির মানুষগুলি ম্লান। বাইরে বেরুলে অস্বস্তি। বাইরের জগতে হিসেবী পদক্ষেপ। উর্মিলা তাই ছিল একেবারে একা। একেবারে নিঃসঙ্গ।

যেই হোক দিবানাথ, সে যেমনি হোক, চুল-চেরা বিশ্লেষণ করবার অবসর উর্মিলার ছিল না। অভাব পূরণের উল্লাসটাই সব চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার কাছে। আর সেই প্রথম বোধহয় গণ্ডির বাইরে পা বাড়িয়েছিল উর্মিলা।

উর্মিলার জীবনে দিবানাথ প্রথম বাইরের মানুষ যার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চমকে উঠত না সে। অপযশ গোপন করবার সতর্কতায় শঙ্কিত হয়ে করতে হত না কথার হিসেব। সে এ বাড়ির সব মানুষকে চেনে। সকলের সব কথা জানে। উর্মিলার পলাতক বাপের কথাও।

দিবানাথের সামনে দাঁড়ালে বুক অনেক হালকা হয়ে যেত উর্মিলার। সহজ স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতে দ্বিধা হত না। এলোমেলো কথার ভিড়ে মাঝে মাঝে হয়তো নিজেই হারিয়ে যেত। তখন আরও কাছে আসবার সুযোগ পেত দিবানাথ।

কিন্তু কাছে আসাই মানে চিরকালের জন্যে কাছে থাকা নয়। মনের কথা বলা মানেই মন দেয়া নয়। পরিচয় মানে আত্মার সঙ্গে নিগূঢ়-যোগ নয়।

যদিও সে-কথাটা বুঝতে উর্মিলার সময় লেগেছিল। দিবানাথের সঙ্গে তার সম্পর্কের রূপ স্পষ্ট হয়েছিল অজয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হবার পর।

দু একটা সকাল, কয়েকটা সন্ধ্যা, কতগুলি মুহূর্ত মাঝে মাঝে নাড়া দিত উর্মিলার দেহ মন এক অস্বাভাবিক দুর্নিবার বেগে আর যদিও তখন দিবানাথের বিপুল শক্তিতে পরাজিত হত জিতেন্দ্রনাথ কিন্তু তবুও বিজয়িনীর উল্লাস আর এক আশ্চর্য জগতের সন্ধান তাকে দিত না।

সেইখানেই ঊর্মিলার হার হত তার বাপের কাছে। কিন্তু কে জানে তখন জয়ের উদ্‌ভ্রান্ত উল্লাসে মনে মনে দিবানাথ মেতে উঠত কিনা।

সে-খবর ঊর্মিলা আজ আর রাখতে চায় না। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত নতুন তথ্য সে আবিষ্কার করতে পেরেছিল দিবানাথকে উপলক্ষ্য করেই। সে-কথাটা কাউকে বোঝাতে পারেনি ঊর্মিলা। নিজেকেও নয়। হয়তো তাই দিবানাথের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে পারেনি সম্পর্কের রূপটা।

যখন বাইরের কোন মানুষ ঊর্মিলার অধিকারবোধ সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তোলেনি, যখন শুধু জিতেন্দ্রনাথের কলঙ্ক নিশ্বাস বন্ধ করা যন্ত্রণায় সারা দিন রাতের অস্বস্তি দিত—তখন এই অপযশ প্রধান ছিল। যেন এই কাঁটা তুলে নিতে পারলেই আর কিছু কাম্য থাকত না ঊর্মিলার। মুক্তির আনন্দে জীবন সার্থক হয়ে উঠত।

তার মায়ের ভাবনাটা যে ঠিক এই রকম সেকথা ঊর্মিলার অজানা নেই। এমন একজন মানুষ, অবস্থা যার মোটামুটি স্বচ্ছল, চেহারায় খুব বেশি জৌলুস না-ই বা থাকল, লেখাপড়া জানা আছে কিছু—তার হাতেই মেয়েকে তুলে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারেন তিনি।

এমন একজন সাধারণ মানুষকেও যে ঊর্মিলার জন্যে পাওয়া যাবে সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে কমলার। জিতেন্দ্রনাথের কথা শুনে পিছিয়ে গেছে অনেকেই—আরও কতজন যাবে কে জানে।

তাই হঠাৎ দিবানাথের আগমন, ঊর্মিলার সঙ্গে তার টুকরো টুকরো আলাপ আশার কম্পিত শিখা জ্বালায় কমলার মনে। হোক দেরি। কিন্তু গড়ে উঠুক আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে দিবানাথের

সঙ্গে উর্মিলার এমন সম্পর্ক যা চিরকালের। শেষ কর্তব্য পালন করে দায়মুক্ত হন কমলা।

আশার কম্পিত শিখা স্থির প্রদীপ হয়ে ওঠে দিবানাথের সহজ কথায় আর সরল হাসিতে। তার মনের প্রসার যে সাধারণ সীমা ছাড়িয়ে যায় সেকথা কমলা বুঝতে পারেন সহজেই। আলাপ-আলোচনায় সংশয় মুছে যায় কমলার।

উর্মি ঘাবড়ে গেছে, কমলা বলেন, পড়াশুনোয়ও খারাপ নয়, জান দিবানাথ, তবু কেন যে ভয় পায়, একটু থেমে তিনি আবার বলেন, ছেলেবেলা থেকেই সব বিষয়ে মেয়ে ভয় পায়। বড় ভীতু উর্মি—

না না, দিবানাথ বলে, ভীতু হবে কেন? পরীক্ষাটাই আমাদের ভয় দেখায়, উর্মিলাকে লক্ষ্য করে দিবানাথ বলে, কই কিছু বলছেন না যে? মাসিমা আপনাকে ভীতু বলছেন—

উর্মিলা কিছু বলবার আগে কমলা বলে ওঠেন, তুমি আবার ওকে আপনি আজ্ঞে বলে কথা বল কেন দিবানাথ? শিবেনের বন্ধু তুমি, উর্মি অনেক ছোট শিবুর চেয়ে। এই উর্মি, তুই কিছু বলিস নি দিবানাথকে?

হাসে উর্মিলা। রসিকতার সুরে বলে, বলেছি। উনি শোনেন না তো কি করব।

দিবানাথ লজ্জায় ফেলে না উর্মিলাকে। তার রসিকতা সমর্থন করে খুশি হয়। বলে, ওঁর পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তখন না-হয় আপনি যা বলছেন তাই করা যাবে।

দিবানাথের রসিকতা হয়তো বুঝতে পারে উর্মিলা। কিন্তু কমলা ভেবে পান না সম্বোধন পরিবর্তন করবার সঙ্গে পরীক্ষার সম্পর্ক

কোথায়। ভাবেন, একটা যোগাযোগ নিশ্চয় আছে। না হলে দিবানাথ ও-কথা বলবে কেন।

পরীক্ষা হয়ে গেল একদিন উর্মিলার। ভাল যে করবে তা সে জানত—সতর্ক হয়ে উঠেছিল আরও ভাল করবার জন্যে। জন্মের ব্যাপারে তার হাত না থাক কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে তার হাত আছে আর সে যা স্পর্শ করে তাই সোনা হয়ে যায়—এমন একটা প্রমাণ সে দিতে চায় প্রত্যেককে। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়ে বাঁচতে চায় পৃথিবীতে।

সেই প্রথম তাকে তুমি বলে দিবানাথ। উর্মিলাকে মনে করিয়ে দেয়, কমলার সামনে একদিন সে বলেছিল, পরীক্ষা হয়ে গেলেই সম্বোধন পরিবর্তন করবে। রসিকতা ভেবে কথাটা তখন একেবারে হালকা ভাবে নিয়েছিল উর্মিলা—ভুলে গিয়েছিল। আজ দিবানাথের কথায় নতুন করে মনে পড়ল সব।

দিবানাথ জিজ্ঞেস করে, আপত্তি আছে কোন?

না না, কি যে বলেন, দিবানাথের গলার স্বর বড় মধুর শোনায় উর্মিলার কানে, আপনি বুঝি লোকের সঙ্গে খুব লৌকিকতা করতে ভালবাসেন?

মোটেই না।

তাহলে একটা ছোট ব্যাপার এত বড় করে নিচ্ছেন কেন?

দিবানাথ কথা বলেনা। আন্তরিকতার আমেজ পায় উর্মিলার কথায়। চুপ করে ও দেখে উর্মিলাকে। উর্মিলাও বুঝতে পারে তার দৃষ্টির অর্থ। মাথা নামায়।

কোথাও যাচ্ছ নাকি এখন?

গানের ইস্কুলে, মাথা তোলে উর্মিলা, সপ্তাহে দুদিন যেতে হয়।

আজ আর না-ই বা গেলে, সহজ হয়ে আসে দিবানাথের সম্বোধন, দূর থেকে মাঝে মাঝে তোমার গান শুনেছি বটে কিন্তু কাছ থেকে গোটা গান শোনা হয় নি একদিনও, একটু থামে দিবানাথ, যদি তোমার বিশেষ ক্ষতি না হয়—

উর্মিলা হেসে বলে, একটু আগেই তো বললেন আপনি লৌকিকতা করেন না ?

দিবানাথও জোরে হাসে, তাই বলে ক্ষতি করব নাকি লোকের ? ক্ষতি আর লৌকিকতা—এই দুটো কথার অর্থ একেবারে আলাদা।

উর্মিলা বসে পড়ে। বোধহয় এই প্রথমবার নিয়মের ব্যতিক্রম হয় তার। ঘরে বাইরে নিজেকে বিকশিত করবার কাজে কোন-দিনও ফাঁকি দেয়নি সে। আজ গানের ইস্কুলে না যাওয়া হয়তো নিজেকে একেবারে বঞ্চিত করা নয় বলেই মনে হল উর্মিলার। কিন্তু একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলল ও। ইচ্ছে করেই।

কাছে এগিয়ে আসছে দিবানাথ। উর্মিলাও তাকে হয়তো আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কিন্তু এমন একজন মানুষের সামনে নিজেকে তুলে ধরবার জন্যেই কি এতদিন ধরে প্রস্তুত হয়েছে সে। একে শোনাবার জন্যেই গান শিখেছে। কটু অনুভূতি জাগে উর্মিলার মনে। তবু গাইতে হয়।

গান গাইতে গাইতে আজ প্রথম সঙ্গীতের ওপর অনুরাগ হারায় উর্মিলা। গলা কেঁপে যায়। মনে হয়, গান না শিখলেও কোন ক্ষতি হত না। যদি জানত এমন মানুষকে গান শোনাতে হবে তাহলে গানের ইস্কুলে নিয়ম করে যাবার আগ্রহ থাকত না তার।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না

উর্মিলা। একটা নিষ্ঠুর মানুষকে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করবার যন্ত্রণায় সে নিজেই ছটফট করে।

সব জেনেশুনেও উর্মিলার কাছে এগিয়ে আসছে দিবানাথ। তার গভীর সমবেদনায় ঢাকা পড়েছে পরিবারের অপযশ। দিবানাথ নিঃসন্দেহে মহৎ। তবে কেন তাকে উর্মিলা তুচ্ছ করতে চায়? কোন সাহসে অবজ্ঞা করে?

উর্মিলার সবকিছু হয়তো ম্লান হয়ে যাবে পাঁচজনের কঠিন বিচারে। কেউ মূল্য দেবে না তার কোন গুণের—আজও তো দিবানাথের মতো চোখ নিয়ে কেউ দেখেনি তাকে—কেউ বিচার করেনি তার মতো মন নিয়ে।

যদি আঘাত খেয়ে থমকে দাঁড়ায় দিবানাথ, যদি সরে যায় তাহলে আবার সেই নিঃসঙ্গ দিন আর রাত ঠিক তেমনি করেই মূক করে রাখবে উর্মিলাকে। কোন সহজ মানুষ একা থাকতে চায়। কেন নিঃসঙ্গ দিন কাটাবে উর্মিলা। তার চেয়ে থাক দিবানাথ তার কাছের মানুষ হয়ে। উত্তাপ না থাকলেও আবেশ ছড়াক মনে। উর্মিলাকে জ্বালিয়ে তুলতে না পারলেও ঘুম পাড়িয়ে দিক।

গান শেষ হল উর্মিলার। কমলা নেই। দাদা বৌদি ওপরে আছে কি-না সে ঠিক জানে না। অন্ধকার জমেছে ঘরে। উর্মিলা আলোর সুইচ টিপল। সে জানত দিবানাথ তার প্রশংসা করবেই। তাই তাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। যদিও দিবানাথের প্রশংসায় তার খুব আগ্রহ নেই।

আর একটা গাও।

ম্লান দৃষ্টিতে দিবানাথের দিকে তাকিয়ে উর্মিলা বলল, না. আজ আর নয়।

কেন ? শরীর খারাপ লাগছে তোমার ?

খুব ভাল নেই শরীর—

হবেই, দিবানাথ হাসল, এত পরিশ্রম কর তুমি, শরীর ভাল থাকবে কেমন করে।

ঊর্মিলা উত্তর দেয়না দিবানাথের কথার। ভাবনা তোলপাড় করে মন। পরিশ্রম সে করেনি। বোধহয় পণ্ডশ্রম করেছে। হঠাৎ সে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঝিমিয়ে পড়ে। দিবানাথ কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

তুমি কি এত ভাব ঊর্মিলা ? আগেও লক্ষ্য করেছি সব সময় একটা ভাবনা তোমার লেগে আছে—

না না, ঊর্মিলা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে, কিছু ভাবি না, শরীরটা বিশেষ ভাল নেই কি-না।

এবার পড়াশুনো বাদ দাও কিছুদিন। খুব বিশ্রাম করে নাও। আর গান যা শিখেছ তারপর বোধহয় আর কিছু শেখবার নেই। কষ্ট করে কেন শুধু শুধু ইস্কুলে যাও ?

ঊর্মিলা হাসে। সহানুভূতির মধুর স্বাদ লেগে থাকে দিবানাথের কথায়। কিন্তু তার কথা শুনে মন ভরে ওঠে না ঊর্মিলার। একটা ঠাণ্ডা মানুষ। একজন অতি সাধারণ অধ্যাপক। দাদার বন্ধু। দাদারই মতো। চেহারা, পোশাক, ভাবভঙ্গি—কোনদিন ঊর্মিলা কল্পনা করেনি এমন।

তবু সে বসে থাকে। তবু সে কথা শোনে। আর হঠাৎ এক সময় আবার তার বাপের কথাই মনে পড়ে যায়। আজ এই মুহূর্তে ঊর্মিলার কিন্তু রাগ থাকেনা জিতেন্দ্রনাথের ওপর। মনে হয়, হার হয়েছে তার নিজের।

আজকের এই ভাবনার কথাই দিবানাথকে উর্মিলা মন খুলে বলতে পারে না। কাউকেই থেমে থেমে ছেড়ে ছেড়ে বলতে পারে না যে, প্রথমে সে শুধু একজন পুরুষকেই একাগ্রভাবে কামনা করেছিল। সে যেই হোক। সন্দেহ ছিল বাপের অপযশ হবে তার কামনার তপ্ত প্রতিবাদ।

ভুল ভাঙল উর্মিলার দিবানাথকে দিয়ে। সে জুড়িয়ে দিল প্রতি-বাদ। আর মনের আক্রোশটাও জুড়িয়ে গেল উর্মিলার। তখন মনে হল, আক্রোশের ওপরেও আরও কিছু আছে, বাপকে হারিয়ে দেবার পরেও আর এক যুদ্ধ আছে। এ যুদ্ধ অহঙ্কারের। তাতে হার হয়েছে উর্মিলার। তার একটা বিশেষ সত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। তাই তৃপ্ত করতে পারে না দিবানাথ।

বাড়িতেই ছিল শিবেন আর বাণী। দূর থেকে উর্মিলার গান শুনতে পায় ওরা। বোধহয় কোথাও বেরুবে তাই একটু দেরি করেই একেবারে প্রস্তুত হয়ে এ ঘরে আসে। ঘরে ঢুকেই দেখতে পায় উর্মিলা আর দিবানাথকে।

বাণী হেসে ফেলে, এই যে দিবানাথবাবু। কতক্ষণ?

খুব বেশিক্ষণ নয়। বস শিবু, দিবানাথ উঠে দাঁড়ায়।

না না, আমরা বসব না। আগে থেকেই ঠিক করেছি বেরুব। বাণীর দাদার খুব অসুখ।

চল, আমিও তাহলে বেরিয়ে পড়ি তোমাদের সঙ্গে, দিবানাথ পা বাড়ায়।

আ হা হা, বাণী যেন প্রাণপণে বাধা দেয়, আপনি কোথায় যাবেন এখন? উর্মির গান ভাল লাগলনা বুঝি?

খুব ভাল লেগেছে।

তাই একটা শুনেই উঠে যাচ্ছেন? কী আশ্চর্য! রস গ্রহণ করবার শক্তি কমে গেছে মনে হয় আপনার?

দিবানাথ আবার বসে পড়ে। হাসে না। অপ্রস্তুত হয় বাণীর কথায়। ওরা বেরিয়ে যায়। দিবানাথ বসে থাকে চুপ করেই। উর্মিলার সঙ্গে কথা বলতে পারে না অনেকক্ষণ। এ সময় এই ঘরে আর কেউ থাকলে যেন ভাল হত।

কমলা ফেরেন নি এখনও। পড়াতে গেছেন। উর্মিলার লজ্জা করে এমন ভাবে বসে থাকতে। নতুন কথার কোন সূত্র খুঁজে পায় না। বাণীর রসিকতার অর্থ উপভোগ করতে পারে না মন দিয়ে।

যেন দিবানাথের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলবার জন্যে উর্মিলা উন্মুখ হয়ে বসে আছে। যেন এ বাড়ির সকলে কৌশলে তাকে ঠেলে দিচ্ছে দিবানাথের কাছে। তার মুখোমুখি বসে থাকতে থাকতে নিজেকে দীন কাঙালীনির মতো মনে হয় উর্মিলার।

আর একটু পরেই কমলা ফিরে আসবেন। দেখবেন ওদের দুজনকে এমন ভাবে বসে থাকতে। বিরক্ত হবেন না। প্রতিবাদও জানাবেন না। খুশি হবেন কমলা। দিবানাথের মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যাবেন। হয়তো এক সময় উর্মিলাকে বলতেও পারেন, তোর সৌভাগ্য উর্মি!

তাই বলবার কথা না থাকলেও উর্মিলাকে চুপ করে বসে থাকতে হবে দিবানাথের সামনে। ইচ্ছে না থাকলেও মালা গাঁথতে হবে কণ্ঠস্বর দিয়ে। যদি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যায় তাহলে আবার এই বাড়ির দেয়াল তাকে বন্দিনীর মতো যন্ত্রণা দেবে দিনের পর দিন।

দিবানাথ এখনও কথা বলেনি একটাও কিন্তু উর্মিলা বুঝতে

পারে সে তাকে দেখছে। তার সুধা আর রূপ। তার লাবণ্য আর প্রসাধন। তার স্বাস্থ্য আর প্রাণ। বিমূঢ় হয়ে দেখছে দিবানাথ। অনেকক্ষণ ধরে দেখবে, আশা মিটবে না তার। দেখতে দেখতে চঞ্চল হয়ে উঠবে। ছটফট করবে। দিশা হারাবে।

মৃদু একটা সঙ্কেত উর্মিলার মনে বেজে ওঠে। যেন একটির পর একটি কাঁটা ফুটছে গায়ে। একটু একটু করে যন্ত্রণা দিচ্ছে। উঠে যেতে পারে না উর্মিলা। দিবানাথের দৃষ্টির বাইরে পালিয়ে যেতে ভয় পায়।

কাল গানের ইস্কুল আছে নাকি ?

উর্মিলা চমকে উঠে বলে, না তো।

বাড়ি থাকবে বিকেলে ?

উর্মিলা কথা বলে না। মাথা নাড়ে। সে জানে এবার থেকে রোজ আসবে দিবানাথ। কাছ থেকে আরও কাছে। তারপর ডাকবে উর্মিলাকে ? বুকে টেনে নেবে। আর ছাড়বে না।

এমনি করেই পাকে পাকে মেয়েদের তো বাঁধে সব পুরুষ। কেউ সঙ্কেত পেলেই সরে যায়। আর ভাগ্য কাউকে সরে যাবার সুযোগ দেয় না। তাকে বাঁধা পড়তেই হয়।

আমি কাল আসব আবার।

যন্ত্রের মতো উর্মিলা বলে, আসবেন।

যাবার আগে আন্তরিকতার দৃঢ়স্বরে দিবানাথ বলে যায়, আজ জোর করলাম না উর্মিলা, কিন্তু কাল আমাকে বলতেই হবে কি তোমার ভাবনা—

নিজের যন্ত্রণা গোপন করবার জন্যে উর্মিলা হাসে, কিছু নয়। শরীরটা ভাল নেই বলেই চুপ করে আছি।

শরীর খারাপের নীরবতা নয় এটা, সমবেদনার রেশ কাঁপে দিবানাথের কথায়, তোমার মনে যেন একটা সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব চলেছে, কাল সব চেয়ে আগে আমাকে সেকথা জানতে হবে তারপর অন্য কথা।

ঊর্মিলা আরও ভাল করে হেসে বলে, যদি কালও এমন মন খারাপ দেখেন তাহলে কারণটাও নিশ্চয় জানাব আপনাকে।

বিদায় নিয়ে চলে যায় দিবানাথ। আর ঊর্মিলা প্রস্তুত হয় মনে মনে। এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। সে নিজে ধরা পড়ুক দিবানাথের কাছে। ধরা তাকে পড়তেই হবে। কিন্তু গোপন থাক তার এই যন্ত্রণার কথা। তার দ্বন্দ্ব দিবানাথের কাছে যেন লুকনো থাকে চিরদিন। ঊর্মিলা সতর্ক হয়। কাল থেকে চেহারাটাই বদলে ফেলবে সে।

পরদিন কিন্তু বাড়িতে আসে না দিবানাথ। তার সঙ্গে ঊর্মিলার রাস্তায় দেখা হয়ে যায়। বসন্তর শেষ। রোদ প্রখর। চারটে বেজেছে সবে। কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে ঊর্মিলা। আজ থেকে কলেজ ছুটি। পরীক্ষার ফল তার খুব ভাল হয়েছে।

একটু ভয় ছিল ঊর্মিলার। সাধনার সঙ্গে পাল্লা দিতে সে কিছুতেই পারছিল না। অন্য কলেজ থেকে এসে মেয়েটা ভর্তি হয়েছে তাদের ক্লাসে। কথাবার্তা বলে না কারুর সঙ্গে। বই খুলে মুখ বুজে বসে থাকে সারাদিন।

এবার কথা ফুটেছে তার মুখে। চমকে গেছে ঊর্মিলার নম্বর দেখে। অবাক হয়ে সাধনা তার দিকে তাকায়। আলাপ করে। জানতে চায় মাঝে মাঝে ঊর্মিলার সঙ্গে আলোচনা করে পড়বার সুযোগ হবে কিনা।

উর্মিলা বলে, সে নিজেই তো পড়ে না বেশি। নাচ গান নিয়েই থাকে সারাদিন।

সাধনা বিশ্বাস করে না উর্মিলার কথা। ভাবে, সে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। ভাবুক। দু একজনকে এড়িয়ে গিয়ে গর্ব অটুট রাখতে না পারলে চলবে কেন উর্মিলার।

সাধনার সঙ্গে কথা শেষ করে উর্মিলা বেরিয়ে আসে কলেজ থেকে। বেশ গরম পড়েছে। কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ব্যাগ থেকে রুমাল বের করতে ইচ্ছে হয় না তার।

ট্র্যামের আশায় দূরে তাকিয়ে উর্মিলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তায়। রোদ এসে লাগছে মুখে। সে একটা মোটা খাতা দিয়ে নিজেকে যথাসাধ্য আড়াল করবার চেষ্টা করে। বর্ষার ছাতাটা আনতে ভুলে গেছে আজ।

ট্র্যাম কিন্তু আসে না অনেকক্ষণ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উর্মিলার পায়ে ব্যথা ধরে যায়। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও মুশকিল। অনেকের দৃষ্টি এসে পড়ে তার ওপর। লোকগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে তাকে। বয়স্ক লোকেরাও অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে। কেউ কেউ তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলে যায়। শুনতে পেলেও সব কথার মানে বুঝতে পারে না উর্মিলা।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ ?

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে পিছন ফিরে উর্মিলা দিবানাথকে দেখে। মাঝ রাস্তায় একজন সঙ্গী পেয়ে যেন একটা দুর্ভাবনা কেটে যায় তার। তাছাড়া উর্মিলার মনটা আজ পাখির পালকের মতো হালকা হয়ে আছে। সকলকে পিছনে ফেলে নিজের নাম একেবারে ওপরে তুলতে পেরেছে বলে উল্লাসের রেশ ফুটে উঠছে রোমকূপে।

হঠাৎ দেখা হয় নি কিন্তু এখন, হাসিমুখে দিবানাথ সত্য স্বীকার করে, আমি ইচ্ছে করেই এদিকে এসেছি।

বেশ করেছেন, ঊর্মিলাও হেসে বলে, কিন্তু কেন?

পরীক্ষার ফল কেমন হল জানবার আগ্রহ হয়েছিল দিন কয়েক থেকে—

মুখ বেঁকিয়ে ঊর্মিলা বলে, ভারী তো পরীক্ষা, তারপরই কিন্তু হাসে আবার, ফার্স্ট হয়েছি, বলেই দিবানাথের মুখের দিকে কৌতুক ভরা চোখে সে তাকিয়ে থাকে।

হবেই, কথা শুনে যেন একটুও অবাক হয়নি দিবানাথ। ব্যাপারটা যেন খুবই স্বাভাবিক। ঊর্মিলাকে বলে যায় সে, তোমার যে খুব বুদ্ধি সেকথা তোমাকে দেখে আমি অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলাম।

ঊর্মিলা খুশি হয়। একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার ট্র্যাম এসে গেছে। ওটা ধরতে ইচ্ছে করছে না ঊর্মিলার কিন্তু দিবানাথের সঙ্গেই বা কি কারণে দাঁড়িয়ে থাকবে তাও ঠিক করতে পারছে না। ভদ্রলোক রোদে পুড়ে দেখতে এসেছে ঊর্মিলাকে। তাকে রাস্তায় ছেড়ে সে লাফিয়ে ট্র্যামে উঠবে কেমন করে।

কোথায় যাবেন আপনি এখন?

তুমি কোথায় যাবে?

আমি তো বাড়ি—

তাকে কথা শেষ করতে দেয় না দিবানাথ, বাড়ি একটু পরে যাবে। আমি পৌঁছে দিয়ে আসব। এখন চল চৌরঙ্গীতে গিয়ে কোথাও চা খাওয়া যাক?

মৃদু স্বরে ঊর্মিলা বলে, চলুন।

পাতলা রঙের ছোঁয়া বোধহয় লাগে উর্মিলার মনে। কিন্তু তা হয় নিতান্ত অকারণেই। ওটা তার একটা বিলাস মাত্র। জীবনে প্রথমবার এক অনাত্মীয়ের সঙ্গে বন্ধু হিসেবেই চা খেতে এসেছে বলে শরীরে শিহরণ খেলে যায়। যেই হোক দিবানাথ—তার পাশে বসে এই মুহূর্তে নিজেকে পরিপূর্ণ মনে হয় উর্মিলার। বেঁচে থাকবার একটা অবলম্বন সে যেন খুঁজে পায় নিজের মধ্যেই।

দুএকজন চেনা মেয়ে তাদের দেখেছে। ট্র্যামে, রাস্তায় আর রেস্তোরাঁয় ঢোকবার সময়। দেখুক। সুপ্ত একটা আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে উর্মিলার মনের মধ্যে। দিবানাথকে দেখাতে চায় এই পৃথিবীর প্রত্যেককে ডেকে ডেকে। তার চেনা-অচেনা যত মানুষ আছে—সকলকে।

এতদিন উর্মিলা শুধু দেখেই এসেছে প্রত্যেকের বন্ধু-বান্ধব। শুনে এসেছে উগ্র সুবাস ছড়ানো কত মধুর গল্প। ঝুণুর বরের কথা, মঞ্জুর বন্ধুর কথা, মীরার প্রেমের কাহিনী।

কিন্তু একমাত্র তাকেই যেন একেবারে পরিত্যাগ করে এক নির্জন কোণে ঠেলে রেখেছিল এই বিরাট বিশ্ব। সে একেবারে একা। তার একান্ত নিজের বলে দেখাবার কোন মানুষ ছিল না। কোন অভিসার ছিল না। কোন কাহিনীও গড়ে ওঠে নি তার জীবনে আর পাঁচজনকে শোনাবার জন্যে। তাই আজ রেস্তোরাঁয় বসে নতুন দৃষ্টিতে দিবানাথের দিকে উর্মিলা তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

দিবানাথ বলে, তোমার চেহারা দেখে আমি আজ নিশ্চিন্ত হলাম। কাল বাড়ি ফিরে সারারাত আমারও খুব ভাবনা হয়েছিল—

ব্যস্ত হয়ে উর্মিলা বলে, কেন? কি হয়েছিল কাল?

তোমার মুখে চিন্তার একটা বিকট রেখা ফুটে উঠেছিল। আমি

শুধু ভাবছিলাম সেই সাংঘাতিক ভাবনাটা কি, যা তোমার চেহারা বিকৃত করে তোলে—

তাকে থামিয়ে দিয়ে মাঝ পথে ঊর্মিলা বলে ওঠে, আজ কেমন দেখছেন ?

আজ ভাবতে দেখছি না বলেই তো এতক্ষণ কিছু জিজ্ঞেস করি নি তোমায়।

আজ কিন্তু সত্যি একটা ভাবনা আছে আমার, ঊর্মিলা মুখ টিপে হাসে।

দিবানাথ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করে, বল, কি ভাবনা তোমার আজ ?

ঊর্মিলা সহসা উত্তর দেয় না। দিবানাথের কৌতূহলে আনন্দ পায়। রসিকতা করে কিছুক্ষণ ভোগাতে চায় তাকে। ঊর্মিলার ভাবনায় সে যে ভোগে একথা বুঝতে পেরেছে বলেই এই ইচ্ছে হয় ঊর্মিলার।

চায়ের কাপটা আস্তে সরিয়ে দিয়ে টেবিলের ওপর দুই হাত রেখে আবার দিবানাথ জিজ্ঞেস করে, বল ?

ঊর্মিলা সত্যি ভাবনা ভাঙে এবার, বাড়ি গিয়ে কি বলব তাই ভাবছি। আমি কলেজ থেকে রোজ সোজা বাড়ি চলে যাই। আজ দেরি দেখে মা হয় তো ভাববেন—

দিবানাথ ঊর্মিলার ভাবনা দূর করবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমি তো শিবুকে বলেছি যে আজ তোমার কলেজে দেখা করতে আসব।

একটা বিবর্ণ আভা ফুটে ওঠে ঊর্মিলার মুখে, চা খেতে আসবার কথাও বলেছেন ?

ঠিক তা বলি নি, তবে অত ভেব না, ও ঠিক বুঝতে পারবে যে

তুমি কোন বিপদে পড় নি, দিবানাথ গলার স্বর হালকা করে তোলে, আমার সঙ্গে কোথাও না কোথাও বেশ নিরাপদ আশ্রয়েই আছ।

এই জায়গাটা বুঝি খুব নিরাপদ ? এবার কিন্তু তত স্বতঃস্ফূর্ত নয় ঊর্মিলার হাসি।

নিশ্চয়ই, দিবানাথের মুখটা যেন আরও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, আমি যেখানে তোমাকে নিয়ে যাব সে-জায়গা তোমার কাছে চিরকাল নিরাপদ হয়ে থাকবে।

বাইরে আর রোদ নেই। রাস্তার ওপারে ময়দানের মাঠে আর গাছে চৈত্র অপরাহ্ণের তেজ পাণ্ডুর হয়ে এসেছে। অল্প অল্প হাওয়া উঠেছে। গরম কাটে না কিন্তু ঘাম শুকিয়ে যায়।

সবে অফিস ছুটি হল বোধ হয়। দেখতে দেখতে রাস্তা ভরে ওঠে অজস্র মানুষের ভিড়ে। কোলাহল জাগে। শব্দ করে বাস যায়। ট্যাক্সি ছোটে। ঊর্মিলা কথা বলে না। চুপ করে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

ঝিমিয়ে গেছে সে। একটু আগের সেই প্রাণের আবেগ নেই। দিবানাথের কাছে নিজেকে হঠাৎ দীন মনে হয় ঊর্মিলার। মা দাদা আর বৌদির ওপর চাপা বিদ্বেষ জেগে ওঠে। তার গর্ব কেন তারা এমন করে চূর্ণ করে দেয়!

দিবানাথ লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি। শিবেনকে আগে থেকে বলে ব্যবস্থা পাকাপাকি করেই এসেছে। কে জানে, হয়তো রসিকতা করে আজ এখানে চা খেতে আসবার কথাও জানিয়ে এসেছে! শিবেনের আপত্তি হবে না একথা বেশ ভাল করে জানে বলেই তাকে আগে থেকে জানাবার সাহস পেয়েছে দিবানাথ।

ভাবতে ভাবতে গম্ভীর কঠিন হয়ে ওঠে ঊর্মিলার মুখ। হালকা

মনটা আবার ভারী হয়ে যায়। তার নিজের কোন কৃতিত্ব খুঁজে পায় না সে দিবানাথের সঙ্গে সকলের অলক্ষ্যে এই মুখোমুখি বসে থাকায়। যেন কেউ নেই ওদের এই নির্জন আলাপে বাধা দেবার—কেউ নেই আপত্তি করবার।

কে জানে দিবানাথ মনে মনে ভাবছে কি-না ঊর্মিলাকে কাছে আসবার সুযোগ দিয়ে সে তাকে ধন্য করেছে। অপযশ তুচ্ছ করে নিজের মহত্বের পরিচয় দিয়েছে। হয়তো একথা ভাবছে বলেই প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারের রেখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার মুখ।

ঊর্মিলার ব্যক্তিত্বের মূল্য সম্পর্কে বোধহয় সে একেবারেই সচেতন নয়। তার বাড়ি থেকে কোন বাধা আসবে না বলেই সে সোজাসুজি তাকে নিমন্ত্রণ করবার সাহস পেয়েছে আজ।

যদি এতটুকু সন্দেহ থাকত দিবানাথের তাহলে ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে কলেজের গেটে এসে দাঁড়াত। ঊর্মিলার মন পাবার চেষ্টায় চেহারাটা করুণ হয়ে উঠত তার। ভীত চাহনি, দিশাহারা ভাব আর ইতস্তত সতর্ক পদক্ষেপ ঊর্মিলার মনেও ঝঙ্কার তুলতে পারত সমবেদনার অনাস্বাদিত গভীর কোন সুরের—যা বেজে ওঠেনি এতদিন।

কিন্তু এত কথা, ভাববার কোন মানে হয় না এখন। দিবানাথ নিশ্চয়ই স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে ঊর্মিলার ব্যাপারে কোন দায় নেই তার। কোন সন্দেহ নেই। ঊর্মিলার মতো অন্য কোন বাড়ির অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলবার ইচ্ছে যদি দিবানাথের হত তাহলে হয়তো তাকে পাবার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারত। এমন কি, অনেকেই হয়তো দিবানাথকে মেনে নিতে পারত না আর সে পেতনা সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার।

কিন্তু ঊর্মিলার ক্ষেত্রে কেউ কোন প্রশ্ন করবে না দিবানাথকে।

তার যোগ্যতা নিয়ে তো কোন কথা উঠবেই না তাদের সংসারে। উর্মিলার মনের কথা ভেবে দেখবে না কেউ। দেখবার উপায়ও নেই।

যেন দিবানাথের চেয়ে আর কোন শ্রেষ্ঠ মানুষ উর্মিলার জন্যে নেই এই পৃথিবীতে। যেন উর্মিলার সৌভাগ্যের সীমা নেই বলে সে এসে দাঁড়িয়েছে তার সীমিত পরিধির গণ্ডি পেরিয়ে। তাকে আঁকড়ে ধরে রেখে নিজের জীবন সার্থক করে তুলুক উর্মিলা—বিকশিত করে তুলুক।

দিবানাথের কাছে নিজের মান বজায় রাখবার ক্ষীণ চেষ্টা করে উর্মিলা, আপনি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন সে কথাটা তো না বললেই হত দাদাকে—

কেন বল তো ? উর্মিলার ইঙ্গিত ধরতে না পেরে দিবানাথ বলে, আমি ইচ্ছে করেই বলেছি শিবনাথকে। ভাবলাম তাকে না জানিয়ে দেখা করতে এলে হয়তো তুমি অসন্তুষ্ট হতে পার।

সলজ্জ হাসি হাসে উর্মিলা, আর বলবেন না। এবার থেকে যা বলতে হয় আমিই বলব।

দিবানাথের কাছে উর্মিলার ইঙ্গিত এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হঠাৎ খুব সহজেই সে যেন পার হয়ে আসে অনেক সমুদ্র আর অনেক দুস্তর পাহাড়। মনের এই সূক্ষ্ম আনন্দ প্রকাশ করবার ভঙ্গি এই মুহূর্তে আবিষ্কার করতে পারে না দিবানাথ। শুধু উর্মিলাকে দেখে। শিবেনের বোন হিসেবে নয়, একান্ত আপনার জন হিসেবেই। কিন্তু সেদিন আর বেশি কথা সে বলতে পারে না।

বৌদি স্পষ্ট ভাষায় কিছু বলে না বটে কিন্তু নানা কৌশলে

উর্মিলাকে আজকাল বুঝিয়ে দেয় যে তার গোপন অভিসারের কথা এ বাড়ির কারুর অজানা নেই। উর্মিলা এতটুকু প্রশ্রয় দেয় না তাকে। সরে যায় কিম্বা অন্য কথা তুলে প্রসঙ্গর পরিবর্তন করে। কিন্তু নানা কথা কানে আসে তার।

কমলা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তাকে নিয়ে। তার জন্যে অনেক বেশি ভাবনা করে আজকাল শিবেন। আর হয়তো বাণীর সাহায্যেই জানবার চেষ্টা করে তার বর্তমান মনের অবস্থা। যদিও উর্মিলা জানেনা দিবানাথের সঙ্গে কোন কথা হয়েছে কিনা কিন্তু তার মনে হয়, ত্বজনের সম্পর্ক যে গভীর হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে মা বৌদি আর দাদার কোন সন্দেহ নেই।

কতগুলো কারণও আছে। বাড়ির লোকের দৃষ্টি এড়ায় না যে সব কিছু থেকে আজকাল উর্মিলার মন চলে গেছে। আগামী বছরেই তার আসল পরীক্ষা কিন্তু বেশিক্ষণ সে বই খুলে বসে না। গানের ইস্কুলে যাবার কথা তার আজকাল মনেই থাকে না। আর এক সময় কমলাকে জানিয়ে দেয় যে অনেক বয়স হয়েছে, এখন আর নাচ শিখে সময় নষ্ট করবার কোন মানে হয় না।

কমলা হেসে বলেন, তোর যা খুশি কর। কিন্তু শরীরের দিকে নজর রাখিস উর্মি। তোর চেহারাটা দিন দিন বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে—

উর্মিলার কথার অন্য অর্থ করে হয়তো খুশিই হন কমলা। এইবার নিশ্চিন্ত হয়েছেন তিনি। মেয়ের ভাবনা ভেবে খোলা চোখে ছটফট করে আর রাত কাটাতে হবে না তাঁকে। কোন ভাল ছেলের সন্ধান পেলে তার অভিভাবকের সঙ্গে দেখা করে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে সতর্ক হয়ে স্বামীকে বাঁচিয়ে মেয়ের কোষ্ঠী হাতে

তুলে দিতে হবে না। তারপর মুখে অন্ধকার মাখিয়ে অন্ধকারেই ছটফট করতে হবে না তাঁকে।

মেজাজ ঠিক রাখা কিন্তু সম্ভব হয় না উর্মিলার পক্ষে। এতদিন সে যেন শুধু পণ্ডশ্রম করে এসেছে। একটির পর একটি নষ্ট করেছে দিন। তার শিক্ষা, তার কলাবিদ্যা, তার রূপ আর প্রসাধন—সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে গেছে। আর কিছু প্রয়োজন নেই তার। যত গুণ আছে যেন তার একটিও না থাকলে কোন ক্ষতি হত না। দিবানাথের মতো মানুষের জন্যে এত আয়োজন অস্বাভাবিক রকম বেশি মনে হয় উর্মিলার।

কি উর্মি, কৌতূহল চেপে রাখা আর সম্ভব হয় না বাণীর পক্ষে, শুনলাম কাল নাকি অনেক রাত অবধি তোমরা লেকের ধারে ঘুরে বেড়িয়েছ ?

শুনলে বুঝি ? তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে উর্মিলার গলার স্বর, শুনে কি বললে তোমরা ?

উর্মিলার আশ্চর্য ভাবান্তরে বাণী রীতিমতো চমকে যায়। তবু হাসতে হাসতেই বলে, বলব আর কি, শুনে খুব খুশি হলাম। ভাবলাম, কবে উৎসবের সাড়া পড়ে যাবে বাড়িতে আর আমরা সকলে আনন্দে মেতে উঠব।

তাই নাকি ? বৌদিকে ব্যঙ্গ করবার লোভ ঠেকাতে পারে না উর্মিলা, তোমাদের বাড়ির অল্পবয়সী মেয়ে কার না কার সঙ্গে রাত অবধি বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে শুনে রাগ হল না তোমাদের ?

রাগ হবে কেন ? লোকটি যে আমাদের খুব চেনা।

হোক না। দুর্নামের ভয় নেই তোমাদের ?

বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে আবার দুর্নামের ভয় থাকে নাকি ?

কবে বিয়ে ঠিক হল? একটু চুপ করে থেকে উষ্ণ স্বরে ঊর্মিলা বলে, আর একথা শুনে শুভ ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বা তোমরা খুশি হবে কেন? কোন্ ভদ্র বাড়ির মেয়েকে এমন করে ঘুরে বেড়াতে দেয়? আমার বাবার একটা বিশ্রী অতীত আছে বলে বোধ হয় মেয়েকে জোর করে কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্যেই শুধু এ বাড়ির লোকের পক্ষে এমন সৃষ্টিছাড়া ঘটনার কথা শুনে আনন্দ পাওয়া সম্ভব, একসঙ্গে এত কথা বলে ঊর্মিলা অনেকক্ষণ ধরে হাঁপাতে থাকে।

বাণী অপ্রস্তুত হয়ে যায়। ঠিক বুঝতে পারে না ঊর্মিলার জ্বালা কোথায়। নিজে কি ভুল করেছে তাও ধরতে পারে না। অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে চায়। ঊর্মিলাকে আর কোন কথা বলতে সাহস হয় না তার।

কিছু একটা না বললে চলে না বলেই শেষ অবধি ফিস ফিস করে ওঠে, আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম ঊর্মি। বানিয়ে বানিয়ে বললাম এসব। দিবানাথবাবু কখনও আমাদের এ ধরনের কোন কথা বলে নি—

বললেই বা কি হত, গলার ঝাঁজ মিলিয়ে যায় না ঊর্মিলার, তোমরা সকলে খুশিতে গলে যেতে। একবারও মুখ ফুটে আপত্তি জানাতে পারতে না।

আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা স্বরে বাণী জিজ্ঞেস করে, তোমার কি দিবনাথ-বাবুকে বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই ঊর্মি?

নেই কি আছে সেকথা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে বল? একজন কেউ যে আমার সম্পর্কে কোন দিন কোন উৎসাহ প্রকাশ করতে পারে, ব্যাপার দেখে মনে হয় তোমাদের কাছে সেটা কল্পনার অতীত ছিল—

বাণীর দম্ভে আঘাত লাগে, তুমি ভুল করছ উর্মি। এসব কথা অন্তত আমার ছোট মাথায় আসে না। সুখবরের সম্ভাবনা থাকলে চিরকাল সকলে আনন্দ প্রকাশ করে বলেই তো জানি।

কিন্তু শুধু সম্ভাবনার কথা ভেবে বাড়ির লোকের এতখানি রাশ আলগা করে দেওয়াও তো ঠিক নয়। আমি বাইরে বেরুলেই তোমারা মনে কর দিবানাথের সঙ্গেই গেছি। অনেক রাত করে ফিরলেও কাউকে কিছু বলতে শুনি না—

বাণী বাধা দেয়, তোমার স্বভাব সকলে ভাল করে জানে বলেই হয়তো কেউ কিছু বলা প্রয়োজন মনে করে না।

শুধু একটা সম্ভাবনার আশায়? ঠোঁট বেঁকিয়ে উর্মিলা শাণিত হাসি হেসে বাণীকে বলে, কিন্তু একটা কথা তোমরা বোঝ না কেন বৌদি যে এই সম্ভাবনার শেষ যে কোন মুহূর্তেই হতে পারে, উর্মিলা একটু থেমে নীরস স্বরে বলে, দিবানাথ যদি কাল হঠাৎ মরে যায় তখন কি অবস্থা হবে আমার?

রূঢ় আঘাতে একেবারে মূক হয়ে যায় বাণী। উর্মিলার প্রতি-দিনের কোমল ব্যবহারের সঙ্গে আজকের তিক্ত ঝাঁজের কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না। দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। অবসন্ন হয়ে পড়ে। আর কোন কথা না বলে এখুনি এ ঘর থেকে চলে যেতে চায়। ভাবে হয়তো দিবানাথের সঙ্গে কলহ করে মেজাজ খারাপ হয়ে আছে উর্মিলার।

একটু পরে ছেড়ে ছেড়ে উর্মিলাই বাণীকে শোনায় আবার, শুধু বাবার দুর্নামের জন্যেই এত রাশ আলগা করে বাড়ির লোক। তার ওপর যদি আমার দুর্নাম রটে, মানে দিবানাথ সরে যায় তখন কি করব আমি?

প্রশ্ন করলেও বাণীর উত্তরের অপেক্ষা না করে অসঙ্কোচে ঊর্মিলা নিজেই জবাব সাজিয়ে দেয়, তখন মাত্র একটি লোককে কৌশলে ধরে রাখবার জন্যে হয়তো তোমরা কেউ আমাকে আর সাহায্য করবে না। আমাকে নিজেই তা করতে হবে। একজনের পর আর একজনকে আনতে হবে আমার জীবনে—আর, দু'এক মিনিট ইতস্তত করে ঊর্মিলা বলেই ফেলে, হয়তো বেঁচে থাকবার জন্যে টাকা-পয়সাও নিতে হবে তাদের কাছ থেকে—

ঊর্মি! সব ভুলে যায় বাণী। কানে যেন যন্ত্রণা হয় তার। চিৎকার করে সে ঊর্মিলাকে থামায়। তারপর চলে যায় সেখান থেকে।

থরথর করে কাঁপতে থাকে ঊর্মিলার শরীর। ফণা তুলে বিষ ঢেলে দিয়েছে সে ঠিক জায়গায়। খুলে যাক ওদের চোখ কান। বলুক বৌদি দাদাকে সব কথা। ওরা একটু সতর্ক হোক। অন্তত একবার ঊর্মির ঘন ঘন বাইরে যাওয়ার বিরুদ্ধে মৃদু আপত্তি করে দিবানাথের কাছে তার মূল্য কিছু বাড়িয়ে দিক। আর শুধু সেই কারণে যদি সরে যায় দিবানাথ—যাক।

সব কিছু ছাড়িয়ে সব চেয়ে ওপরে শুধু ঊর্মিলার অহঙ্কার বিষধর সাপের মতোই ফণা মেলে থাকে। উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তার মুখ।

কিন্তু উত্তেজনার চিহ্ন নেই দিবানাথের চোখে মুখে। উৎকট চিন্তার মুহুর্মুহুঃ আক্রমণ থেকেও সে বোধহয় একেবারে মুক্ত। নিবিড় প্রশান্তির স্থির আভা যেন সর্বক্ষণ উজ্জ্বল করে রাখে দিবানাথের দেহ।

হয়তো তখন তাকে লক্ষ্য করতে করতে সেই আভার বর্ণছটা

উর্মিলার মুখেও তুলি বুলিয়ে যায়। অস্বস্তি উত্তেজনা আর জ্বালার রূপটা ম্লান হয়ে আসে নিজের মনের মধ্যে।

উর্মিলা অনর্গল কথা বলে দিবানাথের সঙ্গে। কোথাও বেড়াতে বেড়াতে, কোন গাছতলায় বসে কিম্বা কোন প্রেক্ষাগৃহে বিরামের অবসরে। দিবানাথ শোনে। তার প্রশ্নের উত্তর দেয়। অল্প কথায় উর্মিলার সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেবার চেষ্টা করে। দিবানাথের আন্তরিকতা অনুরণন তোলে উর্মিলার মনে। যেন তার জন্যে ভাবনার শেষ নেই দিবানাথের!

অন্য কিছু মনে থাকে না তখন উর্মিলার। এক একটি মুহূর্ত খণ্ড খণ্ড হীরকের মতো আসে দিবানাথের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে, আলাপ-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে। অন্ধকার কাঁপা প্রেক্ষাগৃহ, গাছের ছায়া দোলা জল আর এলোমেলো বাতাসের অস্থিরতা এক-মাত্র দিবানাথকেই সত্য করে তোলে উর্মিলার কাছে তার বাইরের আর ভেতরের অভাব অহঙ্কার পেরিয়ে।

তুমি কি ভাল করে খাও না উর্মিলা?

কেন? খাই তো।

দিবানাথ বলে, তাহলে কেন এত শুকিয়ে যাচ্ছে তোমার চেহারা? উর্মিলা কিছু বলবার আগেই সে আবার বলে, মাসিমা ব্যস্ত মানুষ। হয়তো সব সময় তোমার দিকে ঠিক লক্ষ্য রাখতে পারেন না—

আমি কচি খুকি নাকি? উর্মিলা হেসে তাকায় দিবানাথের দিকে। মা ঠিকই লক্ষ্য রাখেন।

তাহলে?

আমার শরীর খুবই ভাল আছে। আপনি কেন শুধু শুধু আমার চেহারা খারাপ দেখেন বুঝতে পারি না—

আমিও সব সময় বুঝি না, হয়তো কিছু একটা বলতে চায় দিবানাথ। কিন্তু উর্মিলা ধরতে পারে যেকথা সে ভাবে সেকথা বলতে তার সাহস হয় না। তাই সে একেবারে অন্য কথায় চলে আসে, আজকাল তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি যেন একেবারেই ব্যস্ত নও, লঘু পরিহাস করবার চেষ্টা করে দিবানাথ, যেন আমার সঙ্গে দেখা করা ছাড়া তোমার আর অন্য কোন কাজ নেই!

যন্ত্রের মতো উর্মিলা বলে, না নেই।

কেন তুমি সব ছাড়লে উর্মিলা?

কিছু করতে আর ইচ্ছে করে না। সব পণ্ডশ্রম বলে মনে হয়। কথা বলে না দিবানাথ। উর্মিলা যা ভেবে ক্লান্তি প্রকাশ করে তা বোঝা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অন্য অর্থ বুঝে দিবানাথের সুখের আভা আরও গাঢ় আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্পষ্ট কোন কথা না বললেও বিনিময়ের বাধা পরিচয়ের গৌরবে লুপ্ত হয়ে যায়।

আর উমিলা ভাবে, এমন অগ্রগমনে আশঙ্কা নেই। এখনও দায় গ্রহণ করবার কোন প্রশ্ন আসেনি দিবানাথের দিক থেকে। যদি আসে তাহলে সে প্রচুর সময় চাইবে। আর যতদিন আসবে না ততদিন এমনি পরিচয় রাখবে তার সঙ্গে। কথা বলবে আর কথা শুনবে। ভাববে আর ভাবাবে। পরিচয় থাকলেও অপরিচয়ের একটা রহস্য ছড়িয়ে রাখবে দুজনের মাঝখানে। অর্থাৎ নিজেকে সে মুক্ত রাখবে যতদূর সম্ভব! যেন ভবিষ্যতে কোন কারণেই দিবানাথ তার ওপর অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিতে না পারে!

কোন অনাত্মীয় যখন আজও আত্মীয় হয়ে ওঠেনি উর্মিলার তখন দিবানাথ থাক না আপাতত তার অবলম্বন হয়ে। নিজের কাছেই স্বীকার করতে যথেষ্ট সঙ্কোচ হয় উর্মিলার তবুও সে সতর্ক হয়ে

ভাবে। কম্পিত আশার একটা ক্ষীণ শিখাও বোধহয় জ্বলে ওঠে তার চোখের সামনে। যদি কখনও এমন কেউ এসে দাঁড়ায়, যাকে দেখে জীবনের সব হিসাব গোলমাল হয়ে যাবে উর্মিলার, সব ভুলে তাকে পাবার নেশায় সে ব্যাকুল হয়ে উঠবে, তখন যেন দিবানাথকে পিছনে সরিয়ে দিতে তার দ্বিধা না হয়। তাই আজকের এই বন্ধন দায়হীন করে রাখতে চায় উর্মিলা—যথাসম্ভব শিথিল করে তার ব্যবহারেরও একটা মাত্রা বজায় রাখতে চায়।

আসছে বছর পরীক্ষা দেবে না?

ইচ্ছে নেই। নাচ গান সবই তো ছেড়ে দিলাম। কোন কিছুতেই মন লাগেনা আমার আজকাল।

উর্মিলা আশা করে কিছু একটা তাকে বলবে দিবানাথ। অনুরোধ করবে আবার লেখাপড়ায় মন দিতে। যা ছেড়ে দিয়েছে নতুন উৎসাহে আবার তা ধরতে। সব ছেলেই তো চায় যে একটি মেয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে দশজনের মধ্যে—সূর্যমুখী ফুলের মতো ফুটে থাকবে সকলের ওপরে।

দিবানাথ কিছুই বলেনা উর্মিলাকে। যেন সে কিছুই চায় না—কিছুই আশা করে না তার কাছ থেকে। একটা ছোট কলেজে দিনের পর দিন ঘাড় গুঁজে যাওয়া ছাড়া যেমন দিবানাথের নিজের জীবনে আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই তেমনি হয়তো সে মনে করে উর্মিলার জীবনেও কোন অভিলাষ থাকবে না। যারা দিবানাথের মতো শান্ত আর সাধারণ মানুষ তারা হয়তো এমনি হয়। দিন কাটিয়ে যায় এমনি করে অনেকের মধ্যে একজন হয়ে।

কিন্তু উর্মিলা বাঁচতে চায় না তেমন করে। যা আছে শুধু তাই সম্বল করে প্রতিকূল অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেয়া তার

স্বভাব নয়। শান্ত সংযত আর অল্পে সন্তুষ্ট জীবনের বিরুদ্ধে সে এক জীবন্ত দুঃসহ প্রতিবাদ। তাই দিবানাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার ভান হঠাৎ ব্যঙ্গ করে ওঠে তাকে। টান টান হয়ে ওঠে তার ফিকে সবুজ শিরা। চোখ জ্বলে যন্ত্রণায়। দিবানাথ দেখতে পায় না কিন্তু বিরক্তির রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঊর্মিলার মুখে।

সে না বলে পারে না, আপনি বোধহয় কোন মানুষের কাছ থেকে কিছুই আশা করেন না?

দিবানাথ যদিও হাসে কথা বলতে বলতে কিন্তু তার হাসি একেবারেই ভাল লাগে না ঊর্মিলার, আশা করি বলেই তো তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়।

কিন্তু আমি যে সব ছেড়ে দিলাম, নীরস গলার স্বরে চেষ্টা করেও দরদ ঢালতে পারে না ঊর্মিলা, কই তা শুনে আপনি তো কিছুই বললেন না?

তোমার ভাল লাগার ওপরে আমি যেন কোনদিনও না যাই ঊর্মিলা, দিবানাথ একটু কাছে সরে আসে তার, তোমার খুশি আর খেয়ালের বাধা হয়ে নয়, সঙ্গী হয়েই আমি থাকতে চাই। তুমি যা করে আনন্দ পাও তাই করবে আর সে-আনন্দের অনেকখানি ভাগ পরিপূর্ণ মন নিয়ে আমিও যেন গ্রহণ করতে পারি।

দর্শনশাস্ত্রে রস খুঁজে পায় না ঊর্মিলা। তাই দর্শনের অধ্যাপকের থেমে থেমে বলা এই কথাগুলিও তার ভাল লাগে না। ম্লান ঠাণ্ডা হয়ে আসে চারপাশ। জোর করে নিজের বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করে সে। তার খেয়াল-খুশির শেষ দিবানাথের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তো সে করে দিয়েছে। এখন যা আছে তা আর যা-ই হোক, খেয়াল-খুশির প্রকাশ একেবারেই নয়। তাই

ভরা মন নিয়ে উর্মিলার আনন্দের ভাগ গ্রহণ করবার সুযোগ দিবানাথ কোনদিনও পাবে না।

দিবানাথের বাড়িতে গিয়েছিল উর্মিলা। সেই প্রথমবার। বাড়িতে মানুষ আর কেউ নেই। শুধু দিবানাথ। একা যাওয়া শোভন নয়। কিন্তু শঙ্কারও নয় বলেই যেতে দ্বিধা করেনি উর্মিলা। আর যাই ঘটুক, দিবানাথের স্বভাবের পরিবর্তন যে রাতারাতি হয়ে অঘটন ঘটাতে পারে না তার জীবনে সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিল বলেই যাওয়া সহজ হয়ে উঠেছিল উর্মিলার পক্ষে।

দিবানাথ কিন্তু বাণী আর শিবেনকেও আমন্ত্রণ জানাতে চেয়েছিল। বলেছিল, উর্মিলাও আসুক তাদের সঙ্গে। আপত্তি উঠেছিল উর্মিলার দিক থেকেই। দিবানাথকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, একটা শর্ত আছে না ও পক্ষের কাছে তাদের নির্জন যোগাযোগ গোপন রাখবার।

প্রথমে খুব বেশি অবাক হয়নি উর্মিলা। দিবানাথের মতো মানুষের বসবাসের পরিবেশ যে কতকটা এমনি হবে তা আন্দাজ করা আগেই উচিত ছিল তার।

দিবানাথের বাড়িতে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে আঘাতের একটা ঠাণ্ডা ঝাপ্টা এসে লাগে উর্মিলার মুখে। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভাবে, এখানে না এলেই তার জন্যে সান্ত্বনার কিছু রেশ তোলা থাকত কল্পনার রঙে রেখায়।

একখানি ছোট ঘর। গ্রীষ্মের প্রখর অপরাহ্নে আলো আসতে বাধ্য হয় বটে এ ঘরে, কিন্তু তাও যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। তার মধ্যে জোর করে কয়েকটা বইএর আলমারী ঢুকিয়ে অতিথির দম বন্ধ করবার কাজ আরও সহজ করে তোলা হয়েছে। ঘরে শুধু বই আর বই।

এই ঘরে থাকতে আপনার অসুবিধা হয় না ? ইচ্ছে থাকলেও বিস্ময় গোপন করতে পারে না উর্মিলা।

কিছু না, হেসে দিবানাথ বলে, বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন।

খাওয়া-দাওয়া করেন কোথায় ?

এই টেবিলেই। বইগুলো তখন সরিয়ে রাখি খাটের ওপর, উর্মিলার পাশে একটা কাঠের চেয়ারে বসে পড়ে দিবানাথ, বুঝতে পারছি আমার সংসার দেখে তুমি খুব অবাক হচ্ছ। কিন্তু জান উর্মিলা, আমার প্রয়োজন খুবই সামান্য। অনাবশ্যক আড়ম্বরে আমি হাঁপিয়ে উঠি। আর এমন কেউই তো আমার নেই যার জন্যে ঘরখানাকে বাড়িয়ে ফেলব।

সংসারের সব কাজও কি আপনি নিজে করেন ?

করতে পারলে আমিই সব চেয়ে খুশি হতাম। কিন্তু সময় বড় কম। চাকর আছে একটা। ভয়ানক বুদ্ধিমান। বাড়িতে যতক্ষণ থাকি সেই আমাকে চালিয়ে বেড়ায়।

এখানে বসে থাকতে পারছে না উর্মিলা। বাইরে হ্রাস হয়ে আসছে সূর্যের তেজ। উর্মিলাও নিভে যাচ্ছে একটু একটু করে। দিবানাথের শান্ত কণ্ঠস্বর, উত্তাপহীন ভঙ্গি, শোভন ব্যবহার তাকে ঠেলে দিচ্ছে আলো থেকে অন্ধকারে, কোলাহল থেকে মূকের রাজ্যে, জীবন থেকে এক ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মধ্যে।

এ স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করবার শক্তি শেষ অবধি থাকবে না উর্মিলার। শুধু ঠাণ্ডা কথার ভিড়ে তৃপ্ত হয়ে দিবানাথের দীন নিঃসঙ্গ সংসারে সে কিছুতেই কাটাতে পারবে না দিনের পর দিন।

কাঠের কঠিন চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে মনের নিদারুণ যন্ত্রণায় উর্মিলা কর্তব্য ঠিক করে ফেলে। এই খেলা শেষ করে

দিতে হবে। শুধু ভানের ওপর ভরসা করে নিজেকে প্রবঞ্চনা করবার কোন মানে হয়না আজ তার কাছে।

উর্মিলার মতো আকাঙ্ক্ষা-বিলাসী মেয়ের কি প্রয়োজন দিবানাথের মতো একজন ম্লান মানুষের? সে পরীক্ষা দেবে। চাকরি করবে। নর্তকী হবে। গান গাইবে। ছবিতে নামবে। যদি কোন মানুষ তার জীবনে না আসে জাগরণের সঙ্গী হয়ে—না আসুক! অনেক কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলে বিশ্বকে সে আকর্ষণ করবে। তাকে জুড়িয়ে দিতে দেবেনা দিবানাথকে—শেষ করে দিতে দেবে না।

উর্মিলা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলুন ফিরি।

না, দিবানাথ হাসে।

আমার ভাল লাগছে না এখানে বসে থাকতে।

ভয় করছে?

জানি না। দয়া করে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, উর্মিলা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলুন।

চা হচ্ছে, চা খেয়ে যাও।

ইচ্ছে করছে না। চলুন। সত্যি বলছি, এখানে বসে থাকতে আমার কান্না পাচ্ছে—নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—

কিন্তু কেন উর্মিলা? দিবানাথ উঠে দাঁড়ায়। এক পা এগিয়ে আসে। শক্ত করে উর্মিলার হাত চেপে ধরে বলে, একদিন তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তুমি উত্তর দাওনি। আজ তোমাকে বলতেই হবে, কি তোমার ভাবনা? কি তোমাকে থেকে থেকে এত পীড়া দেয়—এমন আশ্চর্য করুণ গম্ভীর করে তোলে?

কিছু না।

তোমাকে বলতেই হবে, উর্মিলার হাতে আরও জোরে চাপ দেয় দিবানাথ, আমি বুঝতে পারি একটা চিন্তা তোমাকে ক্ষত বিক্ষত করে তোলে মাঝে মাঝে—

যদি বলি আপনারই চিন্তা ? উর্মিলা হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু দৃঢ় বন্ধন দিবানাথের। সে পারে না ছাড়াতে।

যারই চিন্তা হোক, বল কি তোমাকে পীড়া দেয় ? দিবানাথ উগ্র বন্য হয়ে ওঠে।

উর্মিলার ঠোঁট কাঁপে কয়েকবার। মাথার মধ্যে প্রবল যন্ত্রণা হতে থাকে। ইচ্ছে করে দিবানাথের কাছে সব ভেঙে বলে হাত ছাড়িয়ে ছুটে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে। সব শুনে দিবানাথ যেন আর কোনদিন তার সামনে না আসে।

হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে যায়। দিবানাথের ঠোঁট তপ্ত ইস্পাতের মতো মনে হয় উর্মিলার। আলো মুছে যায়। হাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। অশুচি স্পর্শে জ্বলে উঠে উর্মিলার শরীর। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে কঠিন ধাক্কায় সে দূরে সরিয়ে দেয় দিবানাথকে। দীর্ণ স্বরে চিৎকার করে ওঠে, এ কি করলেন ?

অপ্রস্তুত দিবানাথ কথা বলতে পারে না। মুখ নামায়। অনু-তাপ কাঁপে চোখের তারায়। প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে বোধহয় সে যে কোন শাস্তি নিতে পারে উর্মিলার কাছ থেকে। বিমূঢ় অবস্থায়ও মার্জনার ভাষা সাজাতে থাকে মনে মনে।

কেন আপনি আমাকে এখানে নিয়ে এলেন ? কেন আমাকে এমন করে অপমান করলেন ? কেন—কেন ? উঃ—মাথায় হাত দিয়ে সেই কাঠের চেয়ারেই আবার বসে পড়ে উর্মিলা। যেন আর একটু পরেই জ্ঞান হারিয়ে যাবে তার। মাথা ঘুরছে, শরীর কাঁপছে, দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে।

আমাকে মাপ কর—

উর্মিলার চোখ বেয়ে জল পড়তে থাকে, কি ভেবেছেন আপনি আমাকে? রাস্তার মেয়ে—

উর্মিলা! নিজেকে ফিরে পায় আবার দিবানাথ, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি।

এই বুঝি আপনার শ্রদ্ধার নমুনা? দিবানাথের মুখে কালি ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে উর্মিলার, বাবার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই সেকথা আপনি ভাল করে জানেন বলেই আমার ভদ্রতার সুযোগ নিলেন—উর্মিলা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

তাকে আর স্পর্শ করবার সাহস হয়না দিবানাথের। দূর থেকে ভারী স্বরে বলতে থাকে, উর্মিলা! আমাকে তুমি যত ইচ্ছে অপমান কর কিন্তু এসব কথা কখনও বল না। হীন মন নিয়ে আমি তোমাকে কোনদিনও দেখিনি।

আপনার দৃষ্টি বিচার করবার এতটুকু প্রবৃত্তি আমার নেই—কোনদিনও ছিল না। জানেন না, আমার বাবা এখানে থাকলে আপনি আমার কাছে ঘেঁষতে পারতেন না, উর্মিলা উঠে দাঁড়ায়। অল্প অল্প অন্ধকারেও দিবানাথ বুঝতে পারে আগুন ঠিকরে পড়ে তার চোখ থেকে, কি আছে আপনার আমাকে দেবার? আপনার বিছে? বাঁধা ধরা সামান্য মাইনে? এই ঘর? আর আপনার ইনিয়ে বিনিয়ে বলা বোকা বোকা কথা? কি সম্বল করে আপনি আমার মতো মেয়েকে পাবার কল্পনা করেন? স্পর্ধার সীমা নেই আপনার—উর্মিলা ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে যায়।

একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে থামিয়ে দ্রুতবেগে সে উঠে পড়ে। খুব শিক্ষা হয়েছে তার। জীবনে আর কোনদিনও

দিবানাথ বলে, আমার এক মুহূর্তের দুর্বলতা হয়তো তোমাকে সাংঘাতিক বিচলিত করেছিল। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, তোমার সম্বন্ধে অন্য কিছু ভেবে অন্যায়ভাবে সুযোগ গ্রহণ করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

আমি সব জানি। আপনি এসব কথা আর তুলবেন না।

তোমাকে যোগ্য সম্বর্ধনা জানাবার ক্ষমতা যে আমার নেই সেকথা ভুলে শুধু আমি মস্ত ভুল করেছিলাম—

কেন আপনি বারবার একথা তুলছেন? অনুতাপের ছোঁয়ায় উর্মিলার স্বর মৃদু হয়ে ওঠে, সেদিন হঠাৎ বোধহয় আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি নিজের অবস্থার কথা ভুলে আপনাকে যা-তা বলে আঘাত দিয়েছিলাম।

দিবানাথ থেমে যেতে পারে না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার সেই কথাই তোলে, আমি শুধু তোমাকেই দেখেছিলাম। তোমাকেই চিনেছিলাম—বোঝবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম। হয়তো বুঝেও ছিলাম, এতক্ষণ পর দিবানাথ হাসে, তুমি কিন্তু আমাকে এতটুকুও বুঝতে পার নি উর্মিলা। আমার দুঃখ শুধু সেইখানে।

না বুঝতে পারলে আপনার বাড়িতে যাব কেন? আপনি যখনই বলেন তখনই আপনার সঙ্গে সব জায়গায় যাই কেন?

তাহলে শুধু একটি প্রশ্নের জবাব দাও। কেন সেদিন তুমি তোমার বাবার কথা তুলেছিলে?

কতগুলি অস্বস্তিকর মুহূর্তের মাঝে উর্মিলা ছটফট করে। দিবানাথের কথার উত্তর দিতে পারে না সহজে। সেকথা হঠাৎ বলে ফেলেছিল বলেই আজ আবার সে নিজে দিবানাথের সঙ্গে ভাব করেছে। কৌশলে সেকথা ভুলিয়ে দেবার জন্যে তাকে ঘরে এনে বসিয়েছে।

উর্মিলা তার যে ক্ষত আপ্রাণ চেষ্টায় সযত্নে গোপন করে চলতে চায়, যা তার মনের একমাত্র দুর্বলতা, অসতর্ক মুহূর্তে উত্তেজনার দাহে তাই সে মূর্খের মতো প্রকাশ করে ফেলেছে দিবানাথের কাছে। আকণ্ঠ লজ্জায় শরীর হিম হয়ে আসে উর্মিলার।

তোমাকে দেখবার পর আমি নিজের সব কিছু একেবারে বিস্মৃত হয়েছিলাম। আমার খেয়াল ছিল না অন্ধকার ছোট ঘরে তোমাকে নিয়ে যাওয়া শোভন নয়। আমার শ্রদ্ধা আমার দৈন্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল বলে আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম—

আমি সব বুঝেছি। আপনি চুপ করুন। সেসব কথা যদি এখনও না ভুলতে পারেন তাহলে আমি ঘর ছেড়ে চলে যাব।

সেদিন চুপ করে গিয়েছিল বটে দিবানাথ, কিন্তু তারপরও উর্মিলা অনেকদিন তাকে হাসতে দেখেনি। দু একবার সে তার সঙ্গে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ালেও বেশি কথা বলেনি দিবানাথ। শুধু উর্মিলার কথা শুনে গেছে।

এ যেন আর এক নতুন যন্ত্রণা। সেদিন কঠিন হয়ে সেখানেই সে যদি সম্পর্ক চুকিয়ে দিত তাহলে নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার কোন ভাবনাই হত না তার। কিন্তু তা করতে সে পারে নি। উৎকট লালসার ঝাঁজে বিকৃত কথার তোড়ে দিবানাথকে চরম আঘাত দিয়েছিল বলে সে নিজেই একটা মিটমাট করতে চেয়েছিল। যার ওপর তার অনুরাগ প্রবল নয়, তাকে নিয়ে ভাবনা করা, তার মান ভাঙাবার চেষ্টা হাস্যকর মনে হয় উর্মিলার।

দাদা বলে, দিবানাথ বাড়ি বদলাবে। সুন্দর একট ফ্ল্যাট পেয়েছে পার্ক সার্কাসে। একা মানুষ, কি দরকার ওর অত ভাড়া দিয়ে টাকা নষ্ট করবার বুঝিনা—

কত ভাড়া? উর্মিলা জিজ্ঞেস করে।

দেড়শো-দুশো হবে বোধহয়। দুটো ভাল ট্যুশানি জোগাড় করেছে তাই।

তোমার বন্ধু পাগল নাকি?

শিবেন হেসে বলে, সে-খবর তুই তো ভাল জানিস! প্রমাণ পাস নি বুঝি এখনও?

লজ্জা পায় না উর্মিলা। শিবেনের ওপর রাগ হয়। কিন্তু দাদাকে মুখের ওপর কিছু বলতেও বেধে যায়। দিবানাথের কথা ভেবে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে। সামর্থ্য নেই কিন্তু উর্মিলার কাছে দম্ভ বজায় রাখবার জন্যে তার উদ্যম শুরু হয়েছে। যেন মোটামুটি ভদ্রগোছের একটা বাড়ি দেখাতে পারলে সে তার হাত ধরে গিয়ে উঠবে সেখানে।

আর একদিন শিবেন কমলাকে বলে, দিবানাথ যে শীগগির বাইরে চলে যাচ্ছে মা, এবার উর্মির একটা ব্যবস্থা কর?

কমলা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করেন, কোথায় যাচ্ছে রে?

গোয়ালিয়র। খুব বড় একটা চাকরি পেয়েছে সেখানে। প্রফেসারি ছেড়ে দেবে শুনলাম—

আজ কিন্তু হাসি আসে না উর্মিলার। তার মনের গোপন দৈন্য যেন দিবানাথ প্রকাশ্য দিবালোকে সুন্দর করে সাজিয়ে ছড়িয়ে দেয়। সে বুঝতে পেরেছে কি চায় উর্মিলা। তাই তাকে বোঝাতে চায় সে কত সহজে তার দাবী মেটাতে পারে। প্রচ্ছন্ন আক্রোশে জ্বলে গেলেও কর্তব্য স্থির করতে পারে না উর্মিলা।

কিন্তু লোকটা এত বড় মূর্খ যে বুঝতে পারে না রাতারাতি গাড়ি বাড়ি আর চাকরি দেখাতে পারলেই চেহারাটা অন্য রকম হয়ে যায় না

মানুষের। কথা বলবার ধরনও বদলায় না। তেমন আত্মীয়াও সৃষ্টি করা যায় না। তাহলে উর্মিলা নিজের বেলায় তা করে মাথা তুলে চলাফেরা করতে পারত পাঁচ জায়গায়। দিবানাথের কথা ভেবে দুঃখ হয় তার। ওর এখনকার অবস্থা কতকটা উর্মিলার মতোই। যেখানে খুশি যাক, যা ইচ্ছে করুক। কি এসে যায় উর্মিলার।

তবু সে দিবানাথকে বলে, শুনলাম বাড়ি বদলাচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

কেন ?

যেখানে আছি সেখানে ভদ্র কাউকে নিয়ে যাওয়া যায় না বলে।

কিন্তু যেখানে যাচ্ছেন সেখানে কখনও যদি ভদ্র কেউ না যায় ? দিবানাথ উত্তর দেবার আগেই উর্মিলা আবার জিজ্ঞেস করে, চাকরি ছেড়ে বাইরে যাচ্ছেন কেন ?

দিবানাথ হেসে বলে, চাকরি ছেড়ে যাচ্ছি না। আরও ভাল চাকরি নিয়ে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি।

হঠাৎ ভাল চাকরির কি দরকার হল ?

ভালভাবে বাঁচার দরকার সকলের।

দিবানাথের এমন বাঁকা বাঁকা কথা শুনতে শুনতে ধৈর্য হারিয়েছে উর্মিলা। বিরক্ত হয়েছে। তবু শুনতে হয়। তার মতো এমন করুণ অবস্থা যেন পৃথিবীর কোন মেয়ের কখনও না হয়। চলতে চলতে কথা আসে না আর উর্মিলার মুখে।

আজ উর্মিলাই দিবানাথের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। বলেছিল ছুটির সময় কলেজের সামনে এসে দাঁড়াতে। তারপর কোথাও বসে কথা বলা যাবে। কতগুলো দরকারী কথা আছে তার।

আসলে এতদিন পর একটু ভয় পেয়ে গেছে উর্মিলা। সত্যি যদি দিবানাথ এখান থেকে চলে যায় তাহলে যত যন্ত্রণাই তার জন্যে থাক, তার অনুপস্থিতিতে ক্ষতিও কম হবে না উর্মিলার। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে যাবে। অনাত্মীয় পুরুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও সে আর শুনতে পাবে না। তখন হয়তো শুধু নিজেরই দীর্ঘশ্বাস তার নিঃসঙ্গ অবস্থাকে ব্যঙ্গ করে যাবে। লোকটা চলে যাবে শুনেই চারপাশ কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে উর্মিলার।

দক্ষিণ কলকাতার একটা পার্কে বেড়াতে বেড়াতে উর্মিলা বলে, আপনি এখান থেকে যাবেন না। আমার একটা কথা শুনুন। কোন দরকার নেই অন্য চাকরি নেবার।

এতদিন পর দিবানাথের মুখে আগের মতো সেই হাসি ফুটে ওঠে, বেশ যাব না।

বাড়িও বদলাবার দরকার নেই। যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন! আমার সব ভুলে শুধু অভদ্র আচরণটাই বড় করে নিয়ে কেন আপনি আমাকে ছোট করে দেখবেন? এ আমি সহ্য করতে পারব না—কিছুতেই না—

উর্মিলার গলার স্বর শুনে চমকে যায় দিবানাথ। অশ্রু সংবরণের ব্যর্থ চেষ্টায় দিশাহারা হয়ে পড়েছে সে। অন্য কোথাও থাকলে হয় তো কেঁদেই ফেলত।

খুশির দমকা ঝাপটায় অভিমান ভেঙে যায় দিবানাথের। বেশ জোরেই সে বলে ওঠে, অভিমান সকলেই করে। আমিও করেছিলাম। তোমার চোখের জলে তা ভাঙল। এখন কেন দূরে যাব?

তাড়াতাড়ি রুমাল বের করে উর্মিলা বলে, আমি চোখের জল ফেলিনি।

কোথাও আর যেতে হয় না। ঊর্মিলার কথা পথেই শেষ হয়ে যায়। দিবানাথ অনুরোধ জানিয়েছিল আর কিছুক্ষণ বাইরে থাকতে। কিন্তু বাড়িতেই ফিরে যায় ঊর্মিলা। অনেক নিঃসঙ্গ মুহূর্ত সে যেন ছিনিয়ে নিতে চায় কোলাহলের এই পৃথিবী থেকে।

কমলা লক্ষ্য করেন মেয়েকে। ঊর্মিলা নিভে যাচ্ছে। ঝিমিয়ে যাচ্ছে। স্বভাব-সুলভ লজ্জায় হয়তো কোন কথা বলতে পারছে না মাকে। ওদের আর দূরে দূরে রাখা সমীচীন মনে করেন না কমলা। এবার বিয়েটা চুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলে সবদিক রক্ষা হয়।

দিবানাথের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই কমলার। মেয়ের বেলায়ও হয়তো নেই। ওদের দুজনের সঙ্গেই খোলাখুলি একটা আলোচনা করা দরকার মনে করেন তিনি।

শিবেন বলে দিবানাথ নাকি ঊর্মিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব আকারে ইঙ্গিতে অনেকদিন আগেই তার কাছে পেশ করে রেখেছে। এখন ঊর্মিলার মত জানবার ভার কমলার।

কপাল ভাল কমলার। কপাল ভাল ঊর্মিলার। দিবানাথের মতো ভাল ছেলে আজকাল কজন পায়। সংসারে কেউ নেই তার। সেখানে গিয়েও এ বাড়ির মতো স্বাধীনভাবে ঊর্মিলা চলাফেরা করবে। সামান্য কটাক্ষের আশঙ্কা নেই কারুর কাছ থেকে। দিবানাথের বুকজোড়া স্নেহ আর সজাগ দৃষ্টি পরিপূর্ণভাবে ঊর্মিলাকে সুখী করবে বলেই কমলার মনে হয়।

মেয়ে সুখে থাকবে, সম্মান পাবে—এর চেয়ে আনন্দ আর নেই তাঁর। পাছে কোন বিঘ্ন আসে, কোন অঘটন ঘটে তাই তাড়াতাড়ি একটা উপসংহারে পৌঁছবার চেষ্টায় তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

উর্মি এদিকে আয়, বালিস তুলে খাটে ঠেস দিয়ে কমলা ডাকেন, আজ দিবানাথ আসবে নাকি রে?

আন্দাজে হাতের বইটার একটা পাতা খুলে উর্মিলা বলে, উনি তো রোজই আসেন।

আঃ, বইটা একটু রাখ না মা। আমার কাছে আয়।

কি বলছ? শরীর খারাপ হয়েছে বুঝি তোমার? হাতের বাংলা গল্পের বইটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে উর্মিলা কমলার পাশে এসে বসে।

তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে কমলা বলেন, তোদের মত ননীর শরীর নয় আমার যে একটু এদিক-ওদিক হলেই খারাপ হবে—

আদুরে মেয়ের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে উর্মিলা বলে, আমি বুঝি ননীর পুতুল?

কি জানি মা, কিন্তু চেহারাটা তোর যা হচ্ছে দিন দিন, এবার একটা বড় অসুখ না হলে বাঁচি। কথা তো শুনবি না কারুর। টেবিলে রাখা ঘড়িটা টুক টুক শব্দ করে। বাণী নিঃশব্দে এসে এক গ্লাস দুধ রেখে যায় উর্মিলার সামনে।

উর্মিলা রাগারাগি করে। দুধ খেতে চায় না। তাই বোধহয় বাণী ইচ্ছে করেই কমলাকে দেখিয়ে শব্দ করে গ্লাসটা রাখে টেবিলের ওপর। উর্মিলা আজ প্রতিবাদ করে না। খেয়াল করে না বৌদি কি রাখল তার হাতের কাছে।

বৌদির কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে উর্মিলা। বোধহয় দাদার কাছ থেকেও। মা আছেন বটে তার খুব কাছাকাছি! কিন্তু উর্মিলার মনে হয়, সে এদের কারুরই নয়। দিবানাথের মতো যেন

সকলেই। কাছে আছে অথচ কাছে টানবার আকর্ষণ শক্তি নেই কারুর মধ্যে।

দিবানাথের কথাই তোলেন কমলা, মন খুলে বল উর্মি, দিবানাথকে তোর খুব ভাল লোক বলে মনে হয় কিনা?

উনি খুব ভাল লোক মা, উর্মিলা বুঝতে পারে কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করবেন এবার কমলা। একটু অস্বস্তি বোধ করে। প্রস্তুত হয়ে নিতে চায় মনে মনে। কিছু গোপন না করে মার কাছে সত্যি কথাটাই স্বীকার করতে হবে। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার সেটাই বোধহয় একমাত্র উপায়।

কমলা মেয়ের গায়ে হাত রেখেই একটু ভূমিকা করেন, বড় হয়েছিস এখন, নিজের ভালমন্দ বুঝতেই তো পারিস। আমি আর কি বলব বল। তুই সুখী হলেই আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে মা, গলার স্বর যেন ভিজে ওঠে কমলার, বল দিবানাথকে বিয়ে করলে তুই সুখী হবি কি-না?

চমকে ওঠে না উর্মিলা। মার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকায়। প্রবল অনুরোধের নীরব ভাষা ফুটে উঠেছে তাঁর দুই চোখে। তিনিও মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেন উর্মিলার একটি কথায় পিঠের ভারী বোঝা নেমে যাবে তাঁর—বিপুল দায়িত্ব থেকে এক মুহূর্তে তিনি মুক্তি পাবেন।

মার চেহারা দেখে মায়া হয় উর্মিলার। সে যা বলতে চেয়েছিল তা বলতে পারে না। আঘাতের এত বড় অঙ্গার ছুঁড়ে মেরে কমলার মুখ বিষন্ন করে তুলতে বেধে যায় তার।

দিবানাথের সঙ্গে আমি কথা বলব? শিবু বলছিল—

হঠাৎ হালকা হাওয়ার ঢেউ তুলে উর্মিলা কথা বলে, আমি পরীক্ষা দেব না বুঝি ?

না হয় বিয়ের পরেই দিলি—

আমি বিয়ে না করলে কি হয় মা ? আমি চাকরি করব। আমার জন্যে ভেবে ভেবে মুখ ভার করতে হবে না তোমায়।

কমলা হাসেন। মেয়েকে নানাভাবে বোঝান। মার কথায় মাধুর্য খুঁজে পায় না উর্মিলা। বিয়ে করে কি অবস্থা হয়েছে তার মায়ের সেকথাও মনে হয়। স্পষ্ট ভাষায় একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না বটে তাঁর কথা কিন্তু নিজের মতামত না জানিয়েই কি একটা ছল করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আর ঠিক তখন দিবানাথ প্রবেশ করে এ বাড়িতে।

হয়তো কমলার নীরব অনুরোধ উর্মিলা রক্ষা করত। দিবানাথের শ্রীহীন সংসারে নিজেকে জোর করে মানিয়ে নিত। রুদ্ধ অভিমানের বোঝা বুকে নিয়ে একের পর এক কাটাত ঠাণ্ডা দিন। তা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না তার।

কিন্তু এক সন্ধ্যায় জীবনের রূপটা পাল্টে গেল উর্মিলার চোখে। নিজের মূল্য সম্পর্কে সে হঠাৎ আশ্চর্য রকম সচেতন হয়ে উঠল। তার মনের যত সুপ্ত কামনা যেন এক-একটি মানুষের রূপ ধরে চোখের সামনে ফুটে উঠল।

শরতের প্রথম। বর্ষণের বিরক্তি নেই। প্রকৃতির ভিজে আর একটানা ইঙ্গিত থেকে থেকে সব কাজের কথা ভুলিয়ে দেয়।

ওরা এসেছিল সন্ধ্যেবেলা। অজয়, তার দুই বোন রুকি আর বুকি। এসেছিল সোজাসুজি উর্মিলার কাছেই। স্পষ্ট ভাষায়

বুঝিয়ে দিতে যে তাকে বাদ দিয়ে তাদের কিছুতেই চলবে না।

ওদের এই হঠাৎ আবির্ভাব, কথাবার্তা বলবার ধরন, সহজ আন্তরিকতার স্নিগ্ধ একটা রূপ উর্মিলাকে বিস্মিত করেছিল। ওদের তিনজনের দিকেই সে তাকিয়েছিল অনেকক্ষণ। বিস্ময় গোপন করবার ব্যর্থ চেষ্টা না করেই।

কোথায় নাকি প্রবল বন্যা হয়ে গেছে। সেই বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্যে ওরা একটা অভিনয়ের আয়োজন করেছে এই মাসের শেষ সপ্তাহে। সেই কারণেই উর্মিলার কাছে তারা এসেছে। নাচ আর গানের সম্পূর্ণ ভার তাকে নিতেই হবে।

যদিও বেশ জোরে কথা বলছিল রুকি আর বুকি তাহলেও উর্মিলা ওদের সব কথা ভাল করে শুনতে পায়নি। তার মনটা নিজের অজ্ঞাতে অন্য কিছুর আকর্ষণে শ্রবণশক্তি একান্ত দুর্বল করে তুলেছিল বোধহয়।

আলো জ্বেলেছিল সে অনেক আগেই। কিন্তু এরা যেন আলোর চেয়েও উজ্জ্বল। শাণিত দীপ্ত শরীর। ঐশ্বর্য-বিচ্ছুরিত মুখ। কথায় কথায় উল্লাস। চোখে-মুখে আনন্দের স্বাদ। এই তো এসেছে কয়েক মুহূর্ত আগে কিন্তু এর মধ্যেই জীবনের জোরালো আশ্বাসে যেন সারা ঘর ভরে তুলেছে। আর তাই বিস্ময় ফুটে উঠেছে উর্মিলার চোখে। সশ্রদ্ধ বিস্ময়।

রুকি আর বুকির শাড়ি খুব বেশি মূল্যবান নয়। কিন্তু পরবার ধরনটা একেবারেই অন্যরকম। চুল ছোট করে কাটা বলেই যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে ওদের। হাতে কোন অলঙ্কার নেই। গলার হারটাও সোনার নয়—হীরেরও নয়। বোধহয় কোন

পাহাড়ী পাথরের। সে ওদের দেখে নিয়েছে বেশ ভাল করে।

কথা না বলেও যে একজন মানুষ আর একজনের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে সেকথা অজয়কে দেখবার আগে তার জানা ছিল না। দীর্ঘ চেহারা। মুখে বিনয়ের স্পষ্ট ভাব ফুটে উঠেছে। পরিচ্ছন্ন বিলিতি পোশাকে তাকে এঘরে বেমানান মনে হয়েছিল ঊর্মিলার।

রুকি বলল, কাল থেকে রিহার্স্যাল। আপনার অনেক কাজ। রোজই যেতে হবে—

ঊর্মিলা হেসে বলল, আমি কি পারব ?

খুব আস্তে কথা বলল অজয়, নিশ্চয়ই। বলুন আপনাকে কখন আমরা নিতে আসব ?

আপনাদের রিহার্স্যাল আরম্ভ হয় কখন ?

এই ধরুন, সাড়ে ছটা-সাতটায়।

কোথায় ?

এলগিন রোডে—আমাদেরই এক বন্ধুর বাড়িতে।

কাছেই। নিতে আসবার দরকার কি ? আমি একাই যেতে পারব—

ওঃ নো, রুকি বাধা দিয়ে বলল, ছাটস নট ফেয়ার। দাদা নিয়ে যাবে আপনাকে। কাল থেকে কিন্তু ?

কথা না বলে মাথা নেড়ে হাসল ঊর্মিলা। বাড়িতে কেউ ছিল না তখন। ওদের একটু চা খাইয়ে দিলে ভাল হত বোধহয়। কিন্তু শেষ অবধি কেমন সঙ্কোচ হল ঊর্মিলার, কিছু খাবার কথা ওদের সামনে তুলতেই পারল না।

ওরা চলে যাবার পরও ওদের কথা সে ভুলে যেতে পারল না। ওরাই যেন হঠাৎ সকলকে ছাড়িয়ে তার মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল। তার এত কাছে আজ একটু আগে যারা এসেছিল, হয়তো মনে মনে তাদেরই কামনা করে এসেছিল ঊর্মিলা এতদিন সব সময়।

কিন্তু এমন মানুষ তার কাছে আসেনি কখনও। ঊর্মিলা তাদের দেখেছে এখানে ওখানে। মার্কেটে কিংবা সিনেমায়। দূর থেকে। কোন অপরিচিত জগতের ধরা-ছোঁয়ার বাইরের মানুষের মতোই। তাদের দেখেছে আর অবাক হয়েছে—তাদের সঙ্গে মিশে যাবার কল্পনায় বিভোর হয়ে থেকেছে সারাদিন—সারারাত। আজ ওরাই এসেছিল ঊর্মিলাকে নতুন কথা শুনিয়ে তার চোখের সামনে নতুন পৃথিবী তুলে ধরতে।

ঊর্মিলার মনের যত দ্বন্দ্ব হঠাৎ যেন কয়েক মুহূর্তে একেবারে ঘুচে গেল। ভারী বোঝাটাও নেমে গেল বুক থেকে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। ঘোরাফেরা করতে লাগল সেই ঘরে। জানলায় দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। গান গাইতে লাগল গুণ গুণ করে। আবার কাল অজয়কে দেখবে ঊর্মিলা।

কি ভাবছ? দিবানাথ এসে গেছে ঠিক সময়।

চমকে ঘুরে দাঁড়াল ঊর্মিলা। আজ বোধহয় একটু ভাল করেই দিবানাথের দিকে তাকিয়ে দেখল। কী সাংঘাতিক প্রভেদ। কী আশ্চর্য অমিল! একজন জীবন আর অন্যজন যেন মৃত্যু। আলো আর অন্ধকার! একজন পুরানো সকল কিছু ভুলিয়ে নতুন জন্মের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। আর একজন সেই পুরানো অন্ধকার পরিবেশেই যেন নিশ্বাস বন্ধ করে লুপ্ত করে দিতে চায় আলোর জগৎ।

দিবানাথকে দেখতে দেখতে নিদারুণ অস্বস্তিতে বুক ভরে উঠল ঊর্মিলার। সে চোখ নামিয়ে নিল।

আজ তোমাকে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে ঊর্মিলা—

দিবানাথ ভেবেছিল কথা শুনে হাসি ফুটে উঠবে ঊর্মিলার মুখে। আর আকস্মিক রূপান্তরের বিবরণও অবশ্য জানতে চাইবে। কিন্তু কোন কৌতূহল প্রকাশ করল না সে। আবার ফিরে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখতে লাগল।

একটু পরে বেশ আস্তেই ঊর্মিলা বলল, কাল আপনি আসবেন কি ?

আমি তো রোজই আসি।

দিবানাথের কথা যেন শুনতেই পায়নি ঊর্মিলা, কাল সন্ধ্যেবেলা আমি কিন্তু বাড়ি থাকব না—কাল থেকে এ মাসের শেষ অবধি রোজ বিকেলে আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।

মুখ ম্লান হয়ে গেল দিবানাথের, কোথায় যাবে ?

ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে ঊর্মিলা বলল, থিয়েটার করতে। এই তো একটু আগে সব ঠিক করে ফেললাম।

কিন্তু তোমার যে পরীক্ষা ?

হোক না। আমি সব ঠিক করে নেব।

দিবানাথকে আসল ব্যাপারটা সহজভাবে বুঝিয়ে দিল সে। কারা এসেছিল—তারা দেখতে কেমন—কি কথা বলল তারা—সমস্তই বলল দিবানাথকে। কিন্তু প্রকাশের তীব্র ইচ্ছায় মনটা বেশি মাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠলেও অজয়ের নাম উচ্চারণ করতে পারল না তার সামনে কিছুতেই।

ঊর্মিলা তাকিয়ে রইল দিবানাথের দিকে এক দৃষ্টিতে। সে যেন

একেবারে নীরব হয়ে গেছে হঠাৎ। হবেই। হোক। উর্মিলার এমন উচ্ছ্বসিত মূর্তি দিবানাথ আর কখনও দেখেনি বলেই কথা যেন জুড়িয়ে গেছে তার। একটা তুচ্ছ ঘটনা উপলক্ষ্য করে উর্মিলার এত খুশি হয়ে ওঠবার কি কারণ থাকতে পারে সে কথা হয়তো বুঝতে বিলম্ব হয় দিবানাথের।

তাহলে আমি কবে আসব আবার ? আস্তে উর্মিলাকে জিজ্ঞেস করে দিবানাথ।

আসবেন যেদিন হয়, একটু থেমে তার প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝতে না পারার ভান করে উর্মিলা বলে, আমি না থাকলেও মা দাদা কিম্বা বৌদি—কেউ না কেউ তো থাকবেই—

কোন কথা বলে না দিবানাথ। আহত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে চুপচাপ। সে ঠিক বুঝতে পারে না কেন উর্মিলা একথা বলে। আজও কি সে তার মনের খবর রাখে না। যদি রেখেই থাকে তাহলে তার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের তো বুঝতে দেরি হবার কথা নয় যে এ বাড়িতে আজকাল উর্মিলার কাছেই সে আসে। কিন্তু মুখ ফুটে তাকে কোন কথা বলতে পারে না দিবানাথ।

সে কিছুক্ষণ বসে থাকে। থেকে থেকে টুকরো টুকরো আলোচনা করে উর্মিলার সঙ্গে। উর্মিলাও ছেড়ে ছেড়ে উত্তর দেয়। হঠাৎ যেন কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে তার। বোধহয় সেকথা বুঝতে পেরে তাকে একা থাকবার অবসর দিয়ে একটু তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে যায় দিবানাথ। সে চলে যাবার পরও ঘর ছেড়ে যায় না উর্মিলা। অনেকক্ষণ ধরে ভাবে, তার সঙ্গে আলাপ না হলেই বোধহয় সবচেয়ে ভাল হত।

সেই রাতেই আজকের অতিথিদের কথা কমলাকে জানিয়ে দেয়

উর্মিলা। মার অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই তাই আগেই রাজি হয়ে গেছে। সে জানে কমলা তার কোন কাজে কোনদিনই বাধা দেবেন না।

সব শুনে কমলা বললেন, ভালই তো। তবে দিবানাথকে বলেছিস? সে আবার কিছু মনে না করে—

মার কথা শুনে রেগে ওঠে উর্মিলা, উনি কি মনে করেন না করেন তা দিয়ে আমার দরকার কি? কি যে বল মা, তার ঠিক নেই। তোমাদের কথার মানে বুঝতে পারি না সব সময়।

কমলা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, দিবানাথ তোকে অন্য চোখে দেখে, তাই সে কি চায় না চায় তোর সেকথা একটু-আধটু জানবার দরকার বই কি মা—

কোন দরকার নেই, মাকে বাধা দিয়ে উর্মিলা বলে ওঠে, পরের মন জুগিয়ে চলবার একটুও ইচ্ছে নেই আমার।

কমলা হাসিমুখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, ঝগড়া করেছে বোধহয় দিবানাথের সঙ্গে। মেয়ের মেজাজ কিন্তু কড়া মনে হয় না কমলার। তার দোষ কখনও দেখতে পান না তিনি।

রোজকার মতো পরদিন আবার আসে দিবানাথ। উর্মিলা তখন বাইরে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে অজয়ের অপেক্ষায়। দিবানাথকে দেখে তার মুখের প্রসন্ন ভাবটা মিলিয়ে যায়। বারণ করে দেয়া সত্ত্বেও আজ কেন এসেছে ও বুঝতে পারে না। হয়তো উর্মিলার কথা বিশ্বাস করতে পারেনি তাই পরীক্ষা করতে এসেছে। কিম্বা দেখতে এসেছে সে কাদের সঙ্গে কোথায় যায়।

দেখুক ভাল করে। উর্মিলা ভাবে। নিজের সঙ্গে তুলনা করুক

অজয়ের। তারপর সরে যাক। মুক্তি দিক তাকে। অজয়কে মাত্র একদিন কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছে উর্মিলা। আর কিছু ঘটুক বা না ঘটুক, আর তাকে দেখুক বা না দেখুক, তার মতো মানুষ যে এই পৃথিবীতে আছে সেকথা জানবার পর দিবানাথের মতো মানুষের সঙ্গে সব পরিচয় সে লুপ্ত করে দিতে চায়।

দিবানাথ বলল, জানি তুমি থাকবে না, তবু এলাম।

উর্মিলা বলতে চেয়েছিল, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু সেকথা না বলে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দিবানাথের দিকে তাকিয়ে বলল, একটু পরেই যাব—

তোমার সঙ্গে একদিন দেখা না হলে বড় খারাপ লাগে তাই শুধু দেখতে এলাম—

মোটরের শব্দ শুনে উৎসুক চোখে তাড়িতাড়ি উঠে দাঁড়াল উর্মিলা। অজয় এসে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে এদিকে। ঠিক এ সময় দিবানাথকে অসহ্য মনে হচ্ছে উর্মিলার।

আসুন, হেসে উর্মিলা বলল, বসুন।

না বসব না। একটু দেরি হয়ে গেছে বোধহয়। আপনি যাবেন তো এখুনি ?

চলুন।

দিবানাথের দিকে তাকিয়ে দেখল না উর্মিলা। অজয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়ারও প্রয়োজন মনে করল না। যেন দিবানাথকে একেবারেই চেনে না সে। অজয়ের সঙ্গে আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে সে মোটরে উঠল।

অজয় লক্ষ্য না করলেও চলতে চলতে এক সময় দিবানাথের দিকে

তাকিয়ে দেখেছিল উর্মিলা। অদ্ভুত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। উর্মিলার করুণা জাগল না তার ওপর। তার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওকে আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না সে।

দিবানাথের বিষণ্ণ দৃষ্টি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে যদিও বেশি দেরি লাগল না উর্মিলার। অজয় একটু জোরেই গাড়ি চালায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অনেক দূরে চলে এল সে। হয়তো দিবানাথ তখনও তাদের বাড়ির দরজায় ঠিক তেমনি করেই দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে অজয় বলে, রুকি বলেছিল আরও এক ঘণ্টা আগে আপনাকে নিয়ে যেতে। কিন্তু একটা মীটীং ছিল অফিসে তাই দেরি হয়ে গেল। কাল আরও তাড়াতাড়ি আসব—

ব্যস্ত হয়ে উর্মিলা বলে, আপনি সোজা অফিস থেকে আসছেন? দেখুন তো কী অন্যায়—কাল থেকে আমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই চা খাবেন—

অজয় হেসে বলে, অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু অফিস থেকেই আমি চা খেয়ে বেরিয়েছি।

ল্যান্সডাউন রোড ধরে ওরা এলগিন রোডে এসে পড়ল। বাঁ দিকে ঘুরেই ডান দিকের একটা গেটওলা বড় বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল অজয়। দারোয়ান ছুটে এসে গেট খুলে দিল। মোটরে উর্মিলাকে নিয়ে ভেতরে চলে এল সে।

উর্মিলা নামবার আগে তাড়াতাড়ি নেমে দরজা খুলে সে বলল, আসুন।

মোটরের শব্দ পেয়ে রুকি বুকি আর আরও অনেকে এসে দাঁড়িয়েছে সিঁড়িতে। উর্মিলার দিকে তাকিয়েদেখে ওরা হাসল।

যেন সকলে তারই জন্যে অপেক্ষা করছে। কৌতূহলী চোখে ওকে দেখছে। দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। উর্মিলা ওদের দৃষ্টি দেখেই সেকথা বুঝতে পারে।

বাড়িটা খুবই বড়। কলকাতার কোন নামকরা ব্যারিস্টারের বাড়ি। উর্মিলা যদিও তাঁর নাম শোনেনি কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারে ঐশ্বর্যের গাঢ় রঙ লেগে আছে সবখানে। তাঁরই ছেলের বউএর উৎসাহে এই আয়োজন করা হয়েছে।

রুকি বুকি আর অজয় কাল ওকে ঠিক কথাই বলেছিল। সত্যি উর্মিলাকে বাদ দিয়ে এদের চলবে না। সবচেয়ে বড় পার্ট তার। একেবারে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে তাকে। তার জন্যে সে এতটুকু ভাবে না। এমন অনেক অভিনয় করেছে সে। সব জায়গায় সকলের প্রশংসা পেয়ে এসেছে।

কিন্তু অন্য জায়গার চেয়ে এ জায়গার তফাৎটা একটু বেশিমাত্রায় চোখে পড়ে উর্মিলার। সে আবার তাকায় চারপাশে। এরা তার একেবারে অচেনা। এরা যেন একেবারে নতুন। অজয় ঘুরছে এখানে ওখানে। কথা বলছে প্রত্যেকের সঙ্গে। তারপর এসে বসছে উর্মিলার পাশেই।

উর্মিলার তখন আর কিছুই মনে থাকে না। যেন সে এদেরই একজন। যেন এখানেই কাটবে তার দিনের পর দিন। আর কখনও সে ফিরে যাবে না যতীন দাস রোডের বাড়িতে। দিবানাথের থিতিয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর শুনতে হবে না তাকে। অভিনয়ের এই মহড়া যেন কোনদিনও শেষ না হয়।

রুকি বুকির মুখে উর্মিলার প্রশংসা আর ধরে না, আপনি আমাদের আবিষ্কার। আপনাকে না পেলে কি হত বলুন তো?

যেমন গান তেমন অভিনয়—আপনাকে সহজে ছাড়ছি না আমরা—

উর্মিলা মৃদুস্বরে বলে, আপনারাও তো চমৎকার করেন।

কথা শুনে জোরে হেসে ওঠে রুকি আর বুকি। উর্মিলার সঙ্গে তাদের তুলনা করায় হাসি আসে বোধহয়। আর এত সহজে ওদের ছাড়িয়ে যাওয়ার আনন্দে গর্বের সূক্ষ্ম অনুভূতি জাগে উর্মিলার মনে। সে লক্ষ্য করে—এখানে যারা আছে তাদের প্রত্যেককে।

একটু দূরে গদিওলা একটা চেয়ারে বসে যিনি মিষ্টি হেসে সকলের সঙ্গে কথা বলছেন তিনিই বোধহয় মিসেস বসুমল্লিক। এ বাড়িটা তাঁদের। মাঝে মাঝে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ফিরে আসছেন বেয়ারার হাতে চা কফি আর খাবারের ট্রে চাপিয়ে। একজন নয়, দু তিনজন বেয়ারা যাওয়া আসা করছে সেই ঘরে।

এমনি আনন্দ আর আড়ম্বরে, ঐশ্বর্য আর উচ্ছ্বাসে কাটল প্রথম দিন। বাড়ি ফিরেই উর্মিলা প্রহর গুনতে লাগল আবার কখন আসবে তেমনি আর একটি সন্ধ্যা। হঠাৎ আবার তার মনে হল, সেখানকার একটি মানুষও দিবানাথ কিম্বা তার দাদার মতো নয়।

অজয় একাই তাকে নিতে আসে, আবার সে-ই তাকে পৌঁছে দিয়ে যায়। কোন কোনদিন রুকি বুকি কিম্বা অন্য কেউ থাকে বটে গাড়িতে কিন্তু অজয়ের স্বভাব সম্পর্কে এতদিনে নিঃসন্দেহ হয়েছে উর্মিলা। সে যেন একটু উগ্র রকমের সরল প্রকৃতির মানুষ। কিছু না ভেবে সকলের সামনে উর্মিলার রূপের প্রশংসা করে বসে। আর পাঁচজনকে বুঝিয়ে দেয় উর্মিলার ওপর যে কোন পুরুষের প্রথম দৃষ্টিতেই দুর্নিবার আকর্ষণ জেগে ওঠা স্বাভাবিক।

যদি এমনি করেই দিনগুলি কাটত—যদি এদের মধ্যে থেকেই উর্মিলা কাটিয়ে দিতে পারত সারা জীবন তাহলে বোধহয় আর কারুর কাছে তার চাইবার কিছু থাকত না। প্রথম প্রথম তার সঙ্কোচ ঘুচতে চাইত না কিছুতেই—ভয় হত যদি কেউ হঠাৎ জিতেন্দ্রনাথের কথা জিজ্ঞেস করে বসে—যদি তাকে কারুর স্বাভাবিক কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে তাদের জোড়াতালি দেয়া সংসারের ছবি মেলে ধরতে হয় তাহলে বন্ধ হয়ে আসবে তার গলার স্বর। এই কয়েক দিন এদের মধ্যে থেকে সে নিজের দৈন্য একেবারে বিস্মৃত হয়েছে—খুব সহজেই মনে মনে ও বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষকে অস্বীকার করতে পেরেছে। সে তাদের কিছুতেই এদের মধ্যে টেনে আনতে পারবে না।

কিন্তু বৃথাই ভয় পেয়েছিল উর্মিলা। অর্থহীন আতঙ্কে বৃথাই সঙ্কোচে ভরে রেখেছিল মন। এখানে বোধহয় কোন দৈন্যের স্থান নেই। সঙ্কোচ নেই। অন্ধকার নেই। এই বিপুল আনন্দের বেগে মনের যত কালি আর গ্লানি কোথায় ভেসে যায়। কেউ উর্মিলাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে না—কোন ভাবেই ভারী করে তোলে না মন। আনন্দের হালকা পাখায় ভর করে তাকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যায়।

শরতের সন্ধ্যা গাছের পাতায় আর ঠাণ্ডা হাওয়ায় স্নিগ্ধ আমেজ ছড়িয়ে রেখেছিল। কিছু নেই, কারুর সঙ্গে সম্পর্ক তেমন করে দানা না বাঁধলেও ব্যথার একটা তীব্র মোচড় মাঝে মাঝে অনুভব করছিল উর্মিলা।

এলগিন রোডের পালা চুকে গেল আজ। কাল থেকে আর

ওদিকে যাওয়া নেই। অজয় তাকে নিতেও আসবে না। সন্ধ্যায় অভিনয়। তারপর দিন থেকে আবার সেই একা একা বাড়ি বসে থাকা, সেই ধৈর্য ধরে দিবানাথের ক্লান্তিকর কথা শোনা। হাওয়ার জোর থাকলেও সেকথা ভেবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে উর্মিলার।

ল্যান্সডাউন রোড আর রাসবিহারী এ্যাভিনিউএর সঙ্গমে পুলিশের সঙ্কেতে মোটর থামিয়েছে অজয়। এতক্ষণ কোন কথাই বলেনি সে। উর্মিলা তার বিষণ্ণ মুখ অনেক আগেই দেখে নিয়েছিল। একটা করুণ আভা অজয়ের মুখে ফুটে উঠলেও তা দেখে খুশিই হয়েছিল উর্মিলা। হয়তো দেখা না হওয়ার কথা ভেবেই বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে সে।

হঠাৎ অজয় জিজ্ঞেস করে, এখুনি বাড়ি যাবেন ?

চমকে ওঠে উর্মিলা। একটু পরে হেসে বলে, কেন ? অন্য কি কাজের কথা মনে পড়ল আপনার ?

লেকে একটু ঘুরে যাবেন ?

সহজ স্বরেই উর্মিলা উত্তর দেয়, চলুন।

গাড়ি চালাতে চালাতে অজয় বলে, আজই তো বোধহয় এদিকে আমার শেষ আসা, একটু চুপ করে থাকে সে, আপনিও নিশ্চয় অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন—

আমার কোন কাজ নেই।

তবে তো ভালই। একদিন আমাদের বাড়িতে যাবেন ?

কেন যাব না ? আপনিও আসবেন—

আসব, বেশ জোর দিয়ে অজয় বলে, আমাকে আসতেই হবে। আই মাস্ট সি ইউ—লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি সে বলে ওঠে, আই বেগ ইওর পার্ডেন। কী যে বলে ফেলি যা-তা।

মুখ নামিয়ে চুপচাপ ঊর্মিলা বসে থাকে গাড়ির মধ্যে। উত্তেজনায় বুকটা তোলপাড় করে তার। অজয়ের সিগ্রেটের গন্ধ নাকে বড় মিষ্টি লাগে। সূক্ষ্ম একটা অনুভূতি জাগে মনে। তার স্বাদ আর কখনও পায়নি ঊর্মিলা।

গাড়িটা থামায় অজয়, নামবেন?

আপনি?

তখন বাইরে নেমে দাঁড়িয়েছে অজয়, না থাক। আপনি নামবেন না। সময়টা ভাল নয়। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। কাল তাহলে অভিনয়টাই মাটি হয়ে যাবে, সে আস্তে আস্তে আবার ঊর্মিলার পাশেই বসে পড়ে।

থিয়েটারে আপনি কোন পার্ট নিলেন না কেন?

আপনার মতো করে বলতে পারলে নিশ্চয়ই নিতাম, সিগ্রেটে পর পর দুটো টান দিয়ে অজয় আবার বলে, কিন্তু অভিনয় না করে ভালই হয়েছে, একটু থামে সে, তাহলে হয়তো আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করবার সুযোগই পেতাম না—ঊর্মিলার একটা হাত আস্তে নিজের কোলের ওপর তুলে নেয় সে।

নিক। আরও কাছে সরে আসুক। অজয়ের গায়ের সুবাস গ্রহণ করবার জন্যেই বোধহয় নিশ্বাস ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ঊর্মিলার। কপালে ঘামও দেখা দিয়েছে। কয়েকটি অদ্ভুত মুহূর্ত। ঊর্মিলার শরীর কাঁপছে। সে বুঝতে পারছে না অজয় তার হাতে আরও জোরে চাপ দিচ্ছে কিনা।

সাদা আর নীলে মিশে আকাশের রঙটাও আজ একেবারে অন্য রকম লাগছে ঊর্মিলার চোখে। জলে ভিজে শরতের বাতাস যেন আর একটু বেশি ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে। রাস্তার আলোর ছায়া কাঁপছে

জলে। বেঞ্চিগুলো খালি। কোন মানুষ এদিকে নেই। ঠুং ঠুং করে একটা রিক্স আসছে দূর থেকে। ঝাঁকা মাথায় একটা লোক মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

কিন্তু আজ চারপাশের সব কিছুই যেন মুখর হয়ে উঠেছে। জল। বাতাস। আকাশ। ঘাস। ঊর্মিলা নিজেও। অজয়ের গাড়ির স্বচ্ছ কাঁচটায়ও যেন প্রাণের ছোঁয়া লেগেছে। সবই বুঝতে পারছে ঊর্মিলা কিন্তু এক আশ্চর্য অনুভূতি কথার অরণ্যে এসে যেন স্থির করে দিয়েছে তাদের। তাই কথা বন্ধ হয়ে গেছে ঊর্মিলার।

মাথা তুলে ঊর্মিলার দিকে তাকিয়ে সহজ স্বাভাবিক স্বরে অজয় বলে, রাত হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ এভাবে আপনাকে ঠাণ্ডায় বসিয়ে রাখা উচিত নয় আমি জানি। কিন্তু— চুপ করে যায় অজয়।

তাকে একটি কথাও বলতে পারে না ঊর্মিলা। সব লজ্জা সঙ্কোচ ভুলে সে চিৎকার করে বোধহয় সেই কথাটাই অজয়কে জানিয়ে দিতে চায় যে, সে ঊর্মিলার সম্পর্কে যা করতে চায় তাই করা উচিত। অজয় যেখানে তাকে ঘিরে আছে সেখানে 'উচিত নয়' বলে কিছু নেই।

শুধু এই কথাটাই আপনাকে আমি জানাতে চেয়েছিলাম যে আপনার মতো আর কাউকে আমি কখনও দেখিনি, ঊর্মিলার হাত ছেড়ে দিয়ে আস্তে চাবি ঘুরিয়ে মোটরে স্টার্ট দেয় অজয়।

এঞ্জিনের ভেতর থেকে শব্দ আসে। গতির গুঞ্জনের মতো। ঊর্মিলা শোনে। কতক্ষণেরই বা কথা। কিন্তু বেগের কী বিপুল ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে অজয়ের কথায়। গাড়ি চলছে। হয়তো একটু বেশি জোরেই। গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দেয় না কেন অজয়?

বাড়ি এসে যায় ঊর্মিলার।

এত আগে বলবার দরকার ছিল না। কথাটা বলতে বলতে উর্মিলা বুঝতে পেরেছিল। হয়তো কোনদিন না বললেও কোন ক্ষতি হত না। তাকে কি ভাবল অজয় কে জানে। যা হোক তাকে সব জানিয়ে দিয়ে তো ভালই হয়েছে।

তার বাবার কথাই উর্মিলা জানিয়েছে অজয়কে। একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। রেখে ঢেকে। আস্তে আস্তে। সাবধানে। কথা শেষ করে থামে উর্মিলা। ঠিক বুঝতে পারে না সব কথা অজয় শুনেছে কি-না। কিম্বা এই মুহূর্ত থেকে মনে মনে ছোট করে দেখতে শুরু করেছে তাকে। একটু ভয় লাগে উর্মিলার।

কথা বলতে বলতে উর্মিলার স্বর ভারী হয়ে ওঠে বোধহয়। তার বেদনা বুঝতে দেরি হয় না অজয়ের। সে হাসে। আস্তে উর্মিলার পিঠে একটা হাত রাখে।

একটু অবাক হয়ে বলে, আমি শুধু তোমাকেই জানি। আর কিছু জানতে চাই না—বুঝলে ?

উর্মিলা মাথা নেড়ে জানায় সে বুঝেছে। এখন থেকে আর কোন সঙ্কোচ নেই তার অজয়ের কাছে। আর কোনও ভয়ও নেই। চীনে রেস্তোরাঁ থেকে ওরা যখন বেরিয়ে আসে তখন রাত অনেক হলেও উর্মিলা ব্যাকুল হয় না বাড়ি ফেরবার জন্যে।

অভিনয় হয়ে যাবার পর রুকি বুকির সঙ্গে উর্মিলার মাত্র একদিন দেখা হয়েছিল। মিসেস বসুমল্লিক তাদের প্রত্যেককে একদিন রাত্তিরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেইদিনই ওদের সঙ্গে উর্মিলার শেষ দেখা। যদিও এখন আর কোন প্রয়োজন নেই তাহলেও ওদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে চায়

সে। কিন্তু ওদের কথা আর তোলে না অজয়। ওরাও আসে না।

ঊর্মিলা জিজ্ঞেস করে, রুকি বুকি কেমন আছে ?

ওরা কেউ নেই এখানে। বাবাকে নিয়ে দার্জিলিং গেছে।

আপনি গেলেন না যে ?

অজয় উত্তর দেয় না। ঊর্মিলার দিকে তাকিয়ে হাসে। আস্তে গাড়ি চালাতে চালাতে বলে, আমার কোথাও যেতে ভাল লাগে না। কলকাতাই সবচেয়ে ভাল লাগে এখন—

আপনি বুঝি একাই আছেন বাড়িতে ?

হ্যাঁ, একেবারে একা। আই অ্যাম সিক অফ ইট। একদিন আসবে বাড়িতে ?

ঊর্মিলা মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

কাল ?

হ্যাঁ।

আমি অফিস থেকে সোজা তোমাদের ওখানে চলে যাব, হঠাৎ কি কথা যেন মনে পড়ে যায় অজয়ের, তোমাদের বাড়িতে রোজই একজনকে দেখি, উনি কে ? তোমার দাদা ?

কথা শুনে কপালটা কুঁচকে যায় ঊর্মিলার। তার বুঝতে দেরি হয় না যে দিবানাথের কথা বলছে অজয়। কয়েক মুহূর্তের জন্যে দিশেহারা হয়ে পড়ে ঊর্মিলা। নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় লাগে তার।

ঊর্মিলা থেমে থেমে বলে, উনি ? আমার দাদার খুব বন্ধু। দাদার মতোই আর কি—

খুব বড় স্কলার বোধহয়, না ?

দাদার মতোই প্রফেসারি করেন।

তোমার দাদা কলকাতাতেই থাকেন?

হ্যাঁ।

তাঁকে তো দেখিনি কখনও—

নিস্তেজ স্বরে উর্মিলা বলে, আলাপ করিয়ে দেব একদিন।

এ বাড়ির সকলের সঙ্গেই হয়তো সত্যি একদিন অজয়ের আলাপ হবে। সেকথা জেনেও যতদিন পারে ততদিন উর্মিলা তার বাড়ির লোককে লুকিয়ে রাখতে চায় অজয়ের কাছ থেকে। তার মতে যারা কোনদিক থেকেই দেখাবার যোগ্য নয়, তাদের অজয়কে দেখাবে কেমন করে।

কিন্তু ওই দিবানাথ কেন এসে পড়ে রোজ অজয়ের সামনে? কেন তার দৈন্য এমন করে তুলে ধরে—উর্মিলাকে টেনে রাখতে চায় অন্ধকারে? সে তো বোঝে এ আকর্ষণের কোন মূল্য নেই—কত শিথিল এ বন্ধন। তাহলে কেন সে আসে প্রতিদিন।

অজয়ের পাশে বসে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সে রাতেই উর্মিলা ঠিক করে নেয়, কঠিন স্বরে দিবানাথকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে হবে অকারণে দিনের পর দিন আলো আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকবার কোন মানে হয় না।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে। রাস্তার আলোগুলির গায়ে তখনও জলের দাগ লেগে আছে। একটু ঠাণ্ডা লাগে। হাওয়ার জোর আছে আজ। কিন্তু হঠাৎ যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় উর্মিলার। অজয়ের খুব কাছে বসে থাকলেও অস্বাভাবিক যন্ত্রণা হয় বুকের মধ্যে।

॥ ছয় ॥

অল্প অল্প অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না ওই গাছগুলোর কি নাম। হয়তো ঝাউ কিম্বা ইউক্যালিপ্টাস। পাথরের কুচি ছড়ানো রাস্তা। গেট ছাড়িয়ে অনেকটা চলে এল অজয়ের মোটর গাড়ি। একেবারে বাড়ির ভেতরে ঢোকবার বড় দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। হর্ন বাজাল অজয়। ছোকরা একটা চাকর ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলল।

হাসিমুখে অজয় বলল, এস। চল দোতলার বারান্দায় গিয়ে বসি। ওরে, চেয়ারগুলো ওখানে আছে তো?

চাকর মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

সিঁড়িতে শ্লিপারের চাপা আওয়াজ তুলে অজয়ের সঙ্গে উর্মিলা ওপরে উঠতে লাগল। কড়া একটা গন্ধ আছে এ বাড়ির আনাচে-কানাচে। হলদে রঙের পাতলা পর্দা ঝুলছে ঘরে ঘরে। চলতে চলতে হালকা দৃষ্টিতে উর্মিলা তাকিয়ে দেখল এদিকে-ওদিকে। যদিও এখন বাড়িতে আর কেউ নেই তবুও চার পাশ থেকে মৃদু একটানা গুঞ্জন ভেসে আসছে—উর্মিলার মনগড়া ছন্দের এলোমেলো প্রকাশ।

ঘরের পাশেই বেশ বড় একটা বারান্দা। এখানে-ওখানে ফুলের টব। বেতের কতকগুলো নীল চেয়ার। মাঝখানে একটা গোল টেবিল। আকাশটা একেবারেই সাদা। এক সময় উর্মিলা ওপরে তাকিয়ে নিল। তারপর তাকাল অজয়ের মুখের দিকে। ভীত—একটু বেশিরকম ব্যস্ত—উর্মিলা তাদের বাড়িতে এসেছে বলে চলায় আর বলায় দিশাহারা ভাব ফুটে উঠছে।

বস—বস। কি খাবে? চা না কফি? অজয় জোরে ডাকে, বেয়ারা!

অজয়ের ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করে ঊর্মিলা হেসে বলে, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? একটু বিশ্রাম করুন—এই তো এলেন অফিস থেকে—

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ। জাস্ট এ মিনিট—আমি আসছি এখুনি—

অজয় উঠে দাঁড়াতেই বেয়ারা এসে দাঁড়ায় সেখানে। সে তাকে দুজনের মতো চা পাঠিয়ে দিতে বলে ঊর্মিলাকে একা বসিয়ে রেখে আপিসের পোশাক বদলাবার জন্যেই বোধহয় অন্য ঘরে চলে যায়।

একা চুপচাপ বসে থাকে ঊর্মিলা। দূরে অল্প অল্প কুয়াশা জমেছে। এখানে বেশ গরম। খোলা বারান্দা কিন্তু হাওয়া নেই। মালী এখনও বাগানের ঘাস ঠিক করছে। ঘর্ঘর শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঊর্মিলার ঘুরে ঘুরে চারপাশ দেখতে ইচ্ছে করে। উঠে দাঁড়াতে সঙ্কোচ হয়। আগে অজয় ফিরে আসুক।

নিঝুম বাড়ি। কেউ কোথাও নেই। পাশেই অজয়ের ঘর। সে গুণগুণ করে গান গাইছে। একা বসে থাকতে থাকতে আচমকা খুশির প্রবল ঝাপ্টা মনের মধ্যে অনুভব করে ঊর্মিলা।

ছোট টেবিলটার ওপর চায়ের ট্রে নামিয়ে দিয়ে গেল বেয়ারা। বিলিতি দোকানের কেক আর পেস্ট্রিও রয়েছে সঙ্গে। অজয়ের গানের কলি ভেসে আসছে এখনও—অনেক দূরে কুলুকুলু ঝরে পড়া ঝরণার কলচ্ছ্বাসের মতো।

এখানে বসে থাকতে থাকতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঊর্মিলার মনে হল হঠাৎ এই পরিবেশে সে যেন একেবারে নতুন হয়ে ফুটে উঠেছে। এক টিপে-টিপে-চলা সংসারে ম্লান ভীরু মানুষের মধ্যে

তার জীবনের একটি দিনও কাটেনি। এই হালকা অন্ধকার, ঐশ্বর্যময় নীরবতা, পাওয়া-না-পাওয়ার এক আশ্চর্য অনুভূতি সামনে টাঙানো স্থির অর্কিডগুলোকেও যেন চঞ্চল করে তুলেছে। সে এপাশে-ওপাশে তাকায় আর আপন মনে একা একাই অহঙ্কার রচনা করে।

এ বাড়িতে ঊর্মিলা কখনও আসেনি। কিন্তু অজয় তাকে একদিন নিয়ে আসবে বলেই যেন এ বাড়ি তৈরী হয়েছে। সে চেনে এখানকার দেয়ালের প্রত্যেকটি রেখা। ঠিক এই রঙের পাতলা পর্দা তারও চোখের সামনে নিশানের মতো ছটফট করে উঠেছে অনেকদিন। এখন অজয় তাকে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিক—তার অধিকার সম্বন্ধে আজই তাকে সচেতন করে তুলুক। সংশয় আর রহস্যের আবছা আবরণ দু-হাতে সরিয়ে দিয়ে দৃঢ় বন্ধনের স্বাদ জানিয়ে দিক ঊর্মিলাকে। তার আর ধৈর্য নেই।

অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম, একটা চেয়ার আস্তে টানে অজয়। চায়ের সরঞ্জাম এগিয়ে দেয় ঊর্মিলার পাশে, ভিজেছে? যা তেষ্টা পেয়েছে আমার—পেস্ট্রির প্লেট তার সামনে বাড়িয়ে অজয় বলে, নাও—

টি-পটের মধ্যে চামচ ডুবিয়ে ঠুন ঠুন শব্দ করে ঊর্মিলা, চুপ করে বসুন—আমি নেব ঠিক সময়। চিনি ক চামচ?

যা খুশি দাও। আমার কিছু ঠিক নেই—

ঊর্মিলা হেসে বলে, বেশ লোক।

যাক, চায়ে চুমুক দেয় অজয়, আজ তুমি এসে বাঁচালে। ঠিক মনে পড়ে না এর আগে কবে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিলাম।

ওরা ফিরবে কবে?

কান্না? রুকি বুঝি? কাপটা নামিয়ে অজয় বলে, ফিরবে শীগগির। তবে ওরা থাকলেও আমার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়।

অনেক কাজ থাকে বোধহয় আপনার?

কিছু না। এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াই, ঊর্মিলার মুখের দিকে তাকিয়ে অজয় হেসে বলে, থিয়েটারের পর থেকে কোথাও যেতেও আর ইচ্ছে করে না—

কি করতে ইচ্ছে করে?

এই, একটুও ইতস্তত না করে অজয় বলে, তোমার সঙ্গে অনেক-ক্ষণ গল্প করতে।

করলেই তো পারেন।

রোজ দেখা করতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না?

না, কি ভেবে ঊর্মিলা বলে ফেলে, আমিও তো থিয়েটারের পর থেকে শুধু তাই করতেই চাই।

হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে অজয়, এ কথাটা আরও আগে আমাকে জানালে না কেন? তাহলে আমাকে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে একা-একা ভয়ানক রকম কষ্ট পেতে হত না—

কিসের আশায় ঊর্মিলার সব জড়তা বোধহয় একেবারে ঘুচে যায়। সে মাথা তুলে সোজাসুজি বলে ফেলে, আমি তো ভেবে-ছিলাম একথা বলবার কোন দরকার নেই। আপনি নিজের থেকেই বুঝে নেবেন।

বুঝে নিয়েছিলাম, বেতের নীল হালকা চেয়ারটা ঊর্মিলার কাছে তুলে নিয়ে আসে অজয়। ওর খুব কাছে বসে বলে, কিন্তু কেমন একটা সন্দেহ ছিল মনে—

কি সন্দেহ?

যদি এর মধ্যে অন্য কেউ তোমার জীবনে এসে থাকে—

অজয়ের কথা শেষ হবার আগেই দৃঢ়স্বরে উর্মিলা বলে, না কখনও কেউ আসেনি। আপনি বৃথাই সন্দেহ করেছিলেন।

সেই অন্ধকারেও উর্মিলা বুঝতে পারে খুশির আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অজয়ের মুখ। সে শক্ত করে তার একটা হাত ধরে বলে, তাহলে আর কোন ভাবনা নেই, এবার আমি মনে মনে আমার খুশি মতো যা ইচ্ছে কল্পনা করে নিতে পারি?

উর্মিলা মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

তখন সেখানে অন্ধকার হয়ে গেছে। সিঁড়ির কাছে যে আলো জ্বলছে তারই একটা রেখা এসে পড়েছে বেতের চেয়ারের গায়ে। রাস্তায় মোটর গাড়ি যাচ্ছে মাঝে মাঝে। আর কোন শব্দ নেই।

হয়তো এত সহজে ধরা দিতে হয় না। একটু ভান, একটু রহস্য, এই কাছে আসা, এই দূরে সরে যাওয়া—সব মেয়ের পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক। উর্মিলা যে সে কথা জানে না তা নয়। কিন্তু সে সব এখন সে ভুলেছে। যেমন করে হোক, যত তাড়াতাড়ি হোক, নিবিড় হয়ে উঠুক তাদের বন্ধন। সম্পর্ক পাকাপাকি হোক। আর পাঁচজন জানুক একটা আকস্মিক পরিণতির কথা। অনেক দিন অনেক প্রতীক্ষা করেছে উর্মিলা। মনের বিকট যন্ত্রণায় যন্ত্রের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু আর নয়। এবার অজয় তার দিন আর রাত—সমস্ত জীবন একেবারে অন্য রকম করে দিক।

হাসিমুখে উর্মিলা জিজ্ঞেস করে, আর আপনার জীবনে কি এখনও কেউ আসে নি?

হ্যাঁ এসেছে।

উর্মিলা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করে, কে?

একমাত্র তুমি, হালকা সুরেই কথা বলে অজয়, হঠাৎ এসেছ কিন্তু চিরকাল থাকবে। আর কখনও কোথাও যেতে পাবে না।

কিন্তু আমার মধ্যে কি এমন দেখলেন আপনি?

জানি না। আমি শুধু তোমাকেই দেখেছি। সো সুইট এণ্ড চার্মিং! তুমি আমার ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছ উর্মিলা—একটু থামে অজয়। উর্মিলার পিঠে হাত বুলোয়। গালের কাছে মুখ আনে। হঠাৎ একেবারে চুপ করে যায়।

আলোটা জ্বেলে দেব?

থাক না।

উর্মিলা তুমি এ বাড়িতে আসবে?

এসেছি তো।

একেবারে চিরকালের জন্যে?

যে-কথাটা এতদিন ধরে অজয়ের মুখ থেকে উর্মিলা শুনতে চেয়েছে সে-কথাটা এইমাত্র বলেছে সে। অজয়ের বলা কথাটা এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার মতো তাকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিতে চায়। সে ভুলে যায় যে উত্তরে কিছু একটা বলা দরকার।

কথা বলছনা যে?

আস্তে আস্তে উর্মিলা বলে, আপনি যা চান তাই হবে।

তোমার মাকে বলব?

আমি আগে বলব।

বেশ, কি ভেবে অজয় বলে, কিন্তু তাঁর যদি আমাকে ভাল না লাগে?

অজয়ের একটা আঙুল আস্তে টেনে বেশ জোরেই উর্মিলা বলে ওঠে, লাগবে।

খুব বেশি রাত না হলেও বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হয়ে যায় উর্মিলার সেদিন। অজয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তাদের বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর সে দেখে। ছাদে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করে অনেকক্ষণ। অজয়ের অনেক কথাই মন দিয়ে শোনে। কয়েক বছর আগে মা মারা যান তার। তারপর থেকেই তার বাবা কেমন চুপচাপ হয়ে যান। সংসারে একেবারে মন নেই।

অজয়ের বাবা বিলাত-ফেরৎ এঞ্জিনীয়ার। মস্ত বড় আপিস আছে তাঁর নিজের। কিন্তু এখন সব কাজই তিনি পরের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। অজয় ওসব ব্যাপার কিছু বোঝে না বলেই নিজে ভার নিতে সাহস করে নি। তাই তার বাবার নিজের ব্যবসাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এমনি ধরণের আরও নানা কথা শোনে উর্মিলা। দু-একটা ছোট প্রশ্ন করে মাঝে মাঝে নিজের কৌতূহল মিটিয়ে নেয়।

এক সময় অজয় বলে, আজ এখান থেকে খেয়ে যাও ?

অনেক দেরি হয়ে যাবে না ?

হোক। থিয়েটারের সময় রোজই তো দেরি হত, বেয়ারাকে ডাকতে গিয়ে অজয় থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, বাড়িতে খাবে না বাইরে ?

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উর্মিলা বলে, না না, বাইরে নয়, বাড়িতেই।

আর একটু পরে এ বাড়ি ছেড়ে উর্মিলাকে চলে যেতেই হবে। তাই সে এখানে থাকতে চায় যতক্ষণ পারে ততক্ষণ। খেতে অনেক সময় লাগে। যত খায় তার চেয়ে কথা শোনে অনেক বেশি। কথায় কথায় ঠিক হয় কাল আবার দেখা হবে ওদের দুজনের। অজয়

তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে আসবে আর ঊর্মিলা চারটের আগেই কলেজ থেকে সোজা চলে আসবে এ বাড়িতে।

হঠাৎ কুঁকড়ে যায় ঊর্মিলা। যতীন দাস রোডে তাদের বাড়ির সামনে অজয়ের মোটর দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার ভারে সে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ বাড়ি অজয় কোনদিনও না দেখলে সব চেয়ে ভাল হত। আস্তে আস্তে সে নামে। অজয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, যাই ?

কালকের কথা মনে রেখ।

হ্যাঁ, ঊর্মিলা এগিয়ে যায়। বারবার পিছন ফিরে তাকায়। অজয় দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

মোটরের শব্দ পেয়েই বোধহয় ঊর্মিলা দরজায় ধাক্কা দেবার আগে কমলা নিজে দরজা খুলে দেন। মেয়ের আপাদমস্তক লক্ষ্য করেন। তাঁর দৃষ্টিটা অদ্ভুত লাগে ঊর্মিলার। বাইরের ঘরে এখনও আলো জ্বলছে। শিবেন বাণী—ওরাও বসে আছে সে-ঘরে।

ঊর্মিলা ঘরে ঢুকতেই তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কমলা বলেন, ঊর্মি, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

মার রকম দেখে ঊর্মিলা অবাক হয়ে যায়, কেন বল তো ?

আগে বল কে তোকে মোটরে পৌঁছে দিল ?

কমলার বাঁধন থেকে কোন রকমে নিজেকে মুক্ত করে ঊর্মিলা বলে, কি হয়েছে ? তুমি কাঁপছ কেন ? আমি তো অজয়দের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেই রুকি-বুকির দাদা—যাদের সঙ্গে থিয়েটার করেছিলাম—

দেখলে মা, ভারী গলায় শিবেন বলে, আমি ঠিকই ভেবেছিলাম।

ঘুরে দাঁড়িয়ে উর্মিলা জিজ্ঞেস করে, কি ভেবেছিলে ?

রুক্ষ কঠিন গলার স্বর তোলে শিবেন, রাত দশটা অবধি যার-তার সঙ্গে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াও—একটু লজ্জা করে না তোমার ?

দাদার গলার স্বর শুনে চমকে ওঠে উর্মিলা। এমন করে এ বাড়ির কেউ তার সঙ্গে কোনদিনও কথা বলে নি। প্রথমে সে বুঝতে পারে না কি এমন ব্যাপার ঘটে গেল এইটুকু সময়ের মধ্যে যার জন্যে তার মা ভয়ে কাঁপছেন আর তার দাদার মেজাজ উগ্র হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ দিবানাথের কথা মনে পড়ে যায় উর্মিলার। নিশ্চয়ই এ পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য সে-ই দায়ী। হিংসেয় ছটফট করতে করতে ইতরের মতো শিবেনের কাছে হয়তো তার নামে অনেক কিছুই বলে গেছে।

কমলা একদিকে মেয়েকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেন, উর্মি, এত রাত অবধি ওরকম লোকের সঙ্গে কোন সাহসে তুই বাইরে থাকিস ? এটা কলকাতা শহর—কত রকম লোক আছে এখানে ! যে-কোন সময় যে-কোন সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে—

নিজেকে সামলে নিতে কিছু সময় লাগে উর্মিলার। সে তাকায় প্রত্যেকের দিকে। এতক্ষণের জমা করা আনন্দ এক নিমেষে মুছে যায়। সে ঠিক করে আজ এদের সকলের সঙ্গে খোলাখুলি কথা-বার্তা বলে সব পরিষ্কার করে নেবে। এখন তার দিক থেকে লজ্জা করবার আর কোন কারণ নেই।

উর্মিলা বলে, কি বলছ মা ? এসব কথা তোমাকে কে বলেছে ?

শিবেন চিৎকার করে ওঠে, বলবে আবার কে ? একটা বদমাইসের সঙ্গে তুমি কোন সাহসে এত রাত অবধি ঘুরে বেড়াও ?

যা-তা বল না দাদা—

না বলবে না! যত তোমাকে কিছু বলা হয় না তত তুমি যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছ, গলার স্বর আরও তোলে শিবেন, থিয়েটার-ফিয়েটার সব বাজে অজুহাত—একটা ছল করে ওরা এসে ভদ্র বাড়িতে ঢোকে তারপর সর্বনাশ করে বেরিয়ে যায়। সেসব বোঝবার মতো বুদ্ধি তোমার নেই। কি দরকার তোমার ওদের সঙ্গে এখনও সম্পর্ক রাখবার?

সব ভুলে ঊর্মিলাও চিৎকার করে বলে, কে কি মৎলবে আসে না আসে সেটা বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে, হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে, সকলেই তোমার বন্ধুর মতো নয়—

দেখছ মা, কমলার দিকে তাকিয়ে শিবেন বলে, কথা বলবার ধরন দেখ। এর মধ্যেই কোথায় নেমে গেছে!

তোমরাই বা একজনকে না জেনে তার সম্বন্ধে আজে-বাজে কথা বলবে কেন? আমি কচি খুকি নাকি?

তুমি যে কি তা তুমিই ভাল জান। আদর দিয়ে দিয়ে শুধু তোমার মাথাটা খাওয়া হয়েছে। তাই পাড়ার লোককে গ্রাহ্য না করে এত রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে সাহস কর—

আর তোমার বন্ধুর সঙ্গে যখন তোমরা আমাকে বাইরে ঠেলে দিতে? তখন পাড়ার লোকের কথা ভেবে দেখতে পারনি? রাগে দিশাহারা হয়ে ঊর্মিলা বলে ফেলে, যার সঙ্গে বেড়িয়ে এলাম বলে আজ আমাকে খোঁটা দিচ্ছ, জেনে রেখ তোমার বন্ধুর চেয়ে সে সব দিক থেকে অনেক উঁচুতে—

শিবেন কমলাকে বলে, এসব ব্যাপারে আর কোনদিন তুমি আমাকে কিছু বলতে বল না মা। একবার ওপথে গেলে সকলেই

শাসনের বাইরে চলে যায়। কদিন থেকে লক্ষ্য করছ না ওর কথা-বার্তা সাজ-সজ্জা—

উর্মিলা বাধা দিয়ে বলে, বাঃ আমার রুচি সব বিষয়ে তোমার মত হবে নাকি ? তোমাদের মতে আমি কোনদিন চলতে পারিনি —পারব না।

দেখা যাবে তোমার দৌড় কতদূর—আর কথা না বলে শিবেন সে-ঘর থেকে চলে যায়। বাণী তার আগেই চলে গেছে।

কমলা বিমূঢ় হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। আতঙ্কে বুক টিপ টিপ করে। ছেলেমেয়ের ভালমন্দ নিয়ে ভাবনা করা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই তাঁর। সত্যি যদি উর্মিলার কোন বিপদ হয়, যার-তার কথায় বিশ্বাস করে হঠাৎ মোহের বশে কোন একটা সাংঘাতিক ভুল করে বসে তাহলে কমলার পক্ষে বেঁচে থাকবার কোন অর্থ থাকবে না।

শিবেন তাঁকে ঠিক কথাই বলেছে। উর্মিলার চাল-চলন আস্তে আস্তে একেবারেই বদলে যাচ্চে। আর আজ তার গলার স্বর একটুও ভাল লাগে নি কমলার। এতদিন অভাব যতই থাক সংসারে, শান্তি ছিল, ভাই বোনে মিল ছিল। ঝগড়া কথা কাটাকাটি যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু তার জাতটা একেবারেই ভিন্ন। কেউ কাউকে এমন অসম্মানকর কথা বলে কখনও আঘাত দেয় নি। তাই কমলার বুক থমথম করে। পরস্পরের ওপর বিতৃষ্ণা তাঁর অবর্তমানে যেন সংসারটাকে বিষিয়ে না দেয়।

উর্মি খাবি না ?

আমি খেয়ে এসেছি।

যেন কিছুই হয় নি এমন একটা ভাব নিয়ে শান্ত স্বরে

কমলা জিজ্ঞেস করেন, সত্যি খেয়েছিস তো? না রাগ করে খাবি না?

চোখে জল নিয়ে উর্মিলা বলে, অজয়দের বাড়িতে আমি খেয়েছি।

মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে কমলা তাকে জোর করে টেনে একটা সোফায় নিজের পাশে বসান। ঝি-চাকর দু-একবার উঁকি দিয়ে দেখেছে এ ঘরে। দশটা না বাজলেও বেশ রাত হয়েছে এখন। এ বাড়তে একটু সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সারা হয়।

কি হয়েছে উর্মি, আমায় সব কথা বল, খুব আস্তে মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন কমলা।

তোমরাই জান কি হয়েছে, আমি কেমন করে বলব? মার কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে উর্মিলা বলে, আমার সৌভাগ্য যে অজয় রুকি বুকিরা আমার সঙ্গে সমানে মিশতে আসে। দাদার কি অধিকার ওদের সম্বন্ধে অভদ্রের মতো ওসব কথা বলবার?

তোর ভালর জন্যেই বলেছে—

কমলাকে বাধা দিয়ে উর্মিলা বলে ওঠে, দিবানাথের বেলায় দাদার তাহলে কেন সেকথা খেয়াল থাকে না?

ছি, ও কথা বলতে হয় না উর্মি। দিবানাথ তো আমাদের ঘরের ছেলে।

সে আমার সঙ্গে কেমন অভদ্র ব্যবহার করেছে শুনলে দাদার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। আমি কখনও কাউকে কিছু বলিনা তাই—

যাক গে যা হবার হয়ে গেছে, কমলা মেয়েকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করেন, একটু বুঝেশুনে চললেই হল।

অবুঝের মতো তোমরা কবে আমাকে চলতে দেখেছ?

কমলা আর কথা বাড়ান না। উর্মিলাকে বুঝিয়ে শুতে পাঠিয়ে দেন। এখন থেকে মেয়েকে একটু চোখে-চোখে রাখলেই হবে। আর দিবানাথের সঙ্গেও তার সম্পর্কে কথা বলা দরকার। তাহলেই কমলার কাছে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিতে পারলে সব দায় থেকে তিনি মুক্ত হবেন।

সে-রাতে মার সঙ্গে উর্মিলার আর কোন কথা হল না। কিন্তু পরদিন শরীর খারাপের ভান করে সে কলেজে গেল না। এক ফাঁকে কমলাকে আস্তে আস্তে অজয়ের সব কথা খুলে বলল। আর ছু-একদিন পরে বললেও হয়তো চলত কিন্তু অজয় এ বাড়িতে যখন-তখন আসবে আর যদি কমলা সন্দেহের দৃষ্টিতে হঠাৎ কখনও তাকান তার দিকে তাহলে উর্মিলার লজ্জার শেষ থাকবে না। কোন কারণেই সে আর অজয়কে হারাতে রাজি নয়।

একেবারে স্পষ্ট ভাষায় না বললেও নানা ভাবে উর্মিলা মাকে বুঝিয়ে দিল যে হাজার চেষ্টা করলেও তার জন্যে কমলা এর চেয়ে ভাল পাত্র কিছুতেই আনতে পারতেন না। সব কথা খুলে জানাবার পরও অজয়ের মনের এক তিল পরিবর্তন হয়নি। আর দাদা যা-ই বলুক, যত মিথ্যা কথা ছড়িয়ে বেড়াক অজয়ের নামে, উর্মিলার মনেরও কোন পরিবর্তন হবে না। সে সত্যিই আর ছোট নেই—ভালমন্দ লোক চেনবার ক্ষমতা তার যথেষ্ট হয়েছে।

কথা শেষ করবার আগে দিবানাথের সম্বন্ধে আর একবার বিদ্রূপ উক্তি করে উর্মিলা বলে, তোমরা সকলে আগে অজয়ের সঙ্গে আলাপ করে দেখ তারপর যেন দাদা তার নামে বলে।

মেয়ের কাছ থেকে এত কথা শুনে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারেন না কমলা। মসৃণ সরীসৃপের মতো রক্ত হিম করা ভয়ের

শিহরণ বয়ে যায় তার শরীরে। তাঁর মেয়ে অজয়কে দেখে যত বেশি মুগ্ধ হোক, যত কল্পনা করুক তার সৌভাগ্যের, কমলা ভয় করেন ঐশ্বর্যের দম্ভকে। তিনি জানেন দিবানাথের চেয়ে কিছুতেই তার অজয়কে ভাল লাগবে না। উর্মিলাকে উপলক্ষ্য করে ঝড় উঠবে অজয়েরও সংসারে। ওরা দুজন ছিটকে পড়বে রাস্তায়। তারপর কমলা যেমন তিল তিল করে হারানোর দুঃখ অনুভব করে এসেছেন এতদিন—তাঁর মেয়েকেও ঠিক তাই করতে হবে।

শঙ্কিত হয়ে কমলা জিজ্ঞেস করেন, অজয়ের বাবা এসব কথা জানেন ?

না বোধহয়।

তবে ? তিনি যদি এ বিয়েতে মত না দেন ?

কেন দেবেন না ?

ধর যদি না দেন ?

তখন অজয় যা-হয় করবে। আমি তার কি জানি ?

আর দিবানাথ ? উর্মি, মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় কমলা বলেন, অজয়ের সঙ্গে তোর কত দিনের পরিচয় ? তার সম্বন্ধে তুই কতটুকু জানিস ?

আমি সব জানি মা। সব বুঝি—

না রে, শান্ত স্বরে কমলা বলেন, এত অল্প সময়ে কিছুই বোঝা যায় না, হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন তিনি, তুই আরও ভাল করে ভেবে দেখ। সমস্ত জীবনের কথা এত তাড়াতাড়ি ভাবা ঠিক নয়—

বেশ তুমি যতদিন বলবে আমি ততদিন ভাবব। কিন্তু তুমি দেখে নিও মা আমার মত কিছুতেই বদলাবে না, এক মিনিট থেমে উর্মিলা

বলে ফেলে, তোমাদের ভাল লাগতে পারে, কিন্তু দিবানাথের মতো একজন লোককে আমি কোনদিনও বিয়ে করতে পারব না—

তুই তাহলে সুখী হতিস। দিবানাথের মত ভাল ছেলে আমার চোখে আর কখনও পড়েনি—

অবাক হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে উর্মিলা। মার কথার মানে বুঝতে তার যেন কষ্ট হয়। এটা কেমন করে সম্ভব? সে ভেবেছিল মা দাদা বৌদি তার নির্বাচনের কথা শুনে চমকে যাবে —খুশি হবে। কিন্তু একজন মানুষকে না জেনেই তার সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা করে রেখেছে তারা। কিছুতেই তারা তার নির্বাচনের প্রশংসা করবে না। অজয়ের কোন গুণ তাদের চোখে পড়বে না। যেন দিবানাথ একজন অদ্বিতীয় পুরুষ। এক ফ্যাকাশে সংসার ছেড়ে তার হাত ধরে উর্মিলা প্রবেশ করুক আর এক মিটমিটে সংসারে। এ বাড়ির প্রত্যেকে তাই চায়। তাকিয়ে দেখতে চায় না তার মনের দিকে।

না দেখুক। উর্মিলা নিজেই নিজেকে দেখবে। যখন অজয় পুরোপুরি ভাবে তার জীবনে এসে গেছে তখন কাউকেই তার আর প্রয়োজন নেই। এ বাড়ির পাট তুলে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের সেই বাড়িতে চিরকালের জন্যে থাকবার ব্যাকুল আগ্রহে উর্মিলা অধীর হয়ে ওঠে।

দিন কয়েক পর হেমন্তের মাঝামাঝি রুকি বুকি সুধাংশু মোহনের সঙ্গে দার্জিলিং থেকে ফিরে এল। উর্মিলা ভাবে ওদের বাড়িতে অজয়ের সঙ্গে তাকে দেখলে ওরা দুজনেই খুব অবাক হয়ে যাবে। আর মনে মনে ওদের অবাক করে দেবার জন্যেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু রুকি বুকি ফিরে আসবার পর অজয় একটু চুপচাপ হয়ে গেছে। মাত্র একদিন ওরা কবে ফিরবে সেকথাটা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই উর্মিলাকে জানিয়েছিল। তারপর ওদের সম্পর্কে আর কোন কথা তোলে না, তাদের বাড়িতেও যেতে বলে না।

একটু ভয় পেয়ে যায় উর্মিলা। সে বুঝতে পারে না ওদের সম্পর্কে অজয়ের নীরব হয়ে থাকবার কারণ কি। স্পষ্ট করে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারে না। বিলম্ব করতে মন চায় না উর্মিলার। অজয় সোজাসুজি তার কাছে এবার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ধরা দিক।

বছরের এ সময়টা চিরকালই উর্মিলার খারাপ লাগে। হিস হিস ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়। শীত-শীত ভাব। বিকেল হতে না হতেই সন্ধ্যে হয়ে যায়। আর রাস্তায় বেরুলেই ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় চোখে জল এসে যায় তার। মনটা ঠাণ্ডা হয়ে যেন ঝিমিয়ে যায়।

ওদিকে শিবেন তার সঙ্গে কথা বলে না। বাণীও শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়। আর কমলার বিষণ্ণ মূর্তি দেখে উর্মিলার মনে হয়, মেয়ে যেন কোথায় ভেসে যেতে চলেছে এই ভাবনায় তাঁর ঘুম হয় না। সবদিক মিলিয়ে একটা অসহ্য শৈথিল্য নামে উর্মিলার শরীরে। মনে হয় হঠাৎ যদি একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখে সব বাধা পার হয়ে নতুন এক অধিকার নিয়ে বসে আছে অজয়ের বাড়িতে তাহলে এই অস্বাভাবিক দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়।

আজকাল বাড়ির কাছে আসে না অজয়। মোটর নিয়ে অপেক্ষা করে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে। সময় মতো উর্মিলা যায়। বাড়ির লোকের কাছে স্বাভাবিক লজ্জার জন্যেই যে এই ব্যবস্থা সেকথা সে বুঝিয়েছে অজয়কে। আসল ব্যাপারটা খুলে বলতে পারলেই

হয়তো সবচেয়ে ভাল হত—মনও হালকা হয়ে যেত অনেক। কিন্তু তা কিছুতেই এখন সম্ভব নয় তার পক্ষে।

প্রথম দিন অজয়ের মন জানবার পর ঊর্মিলা ঠিক করে রেখেছিল সেইদিনই কমলাকে সব কথা প্রাণ খুলে বলবে। আর পরদিনই মার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেবে। সে তো কল্পনাও করতে পারে নি যে অজয়ের সম্বন্ধে তাদের বাড়িতে একটা অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। সেই ধারণার পরিবর্তন হোক বা না হোক, ঠিক এই সময় অজয়ের এ বাড়িতে না আসাই ভাল। যদি কেউ তাকে এতটুকু অবহেলা করে কিম্বা জানিয়ে দেয় তার সম্বন্ধে তাদের অভিমত তাহলে ঊর্মিলা যেন শেষ হয়ে যাবে।

এ সবের ওপরে আরও একটা ভয় ছিল ঊর্মিলার। যদি দিবানাথের কথা অজয়ের কানে যায়—যদি সে তাকে ভুল বোঝে! তাই এখন তাকে তার বাড়ি থেকে একটু দূরে রাখাই ভাল। সুযোগ হলে ঊর্মিলা নিজেই অজয়কে একদিন সব কথা বলবে। কিন্তু এখন নয়।

সামনে একটা মস্ত বড় পার্ক। শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে তারা। রাস্তায় মোটর রেখে আস্তে আস্তে হেঁটে ঊর্মিলার সঙ্গে অজয় সেই পার্কে ঘুরে বেড়ায়। সময়টা ভাল নয়। আজ বেশ ঠাণ্ডা। কুয়াশায় ঝিম ঝিম করছে সমস্ত পার্ক। অজয়দের বাড়িতে গিয়ে গল্প করলেই ভাল হত। কথায় কথায় আজে-বাজে ছবি দেখতেও ভাল লাগে না ঊর্মিলার। আর কোথাও চা খেতে গেল হুস করে যেন সময় কেটে যায়।

রুকি বুকি কেমন আছে?

ভালই।

আপনার বাবা ?

ওই এক রকম, শেষ টান দিয়ে সিগ্রেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অজয়। ঘাসের ওপর জ্বল জ্বল করে তার ছুঁড়ে দেওয়া সিগ্রেট, তোমার মাকে আমার কথা কিছু বলেছিলে ?

বলব এক সময়, ইতস্তত করে আস্তে বলে উর্মিলা।

আমার মনে হয়, আবার একটা সিগ্রেট ধরায় অজয়, এখন বলবারই বা দরকার কি—

চমকে উঠে উর্মিলা জিজ্ঞেস করে, কেন ?

আমি আর দেরি করতে চাই না উর্মি, মুখ থেকে সিগ্রেট নামিয়ে অজয় বলে, বলাবলি করতে গেলে যদি দেরি হয়ে যায়—

নিশ্চিন্ত হয়ে উর্মিলা বলে, রুকি বুকি জানে ?

স্পষ্ট করে কিছু বলিনি—ওই আর কি—

আপনার বাবা ?

ওঁর নিজের শরীর তো খুব ভাল নেই, একটু চুপ করে থেকে অজয় বলে, তা ছাড়া এসব কথা নিয়ে উনি খুব মাথা ঘামান না। আমি বলছিলাম কি—আবার থেমে যায় অজয়।

উর্মিলা জিজ্ঞেস করে, কি ?

কাউকে কিছু না বলে আমরা নিজেরাই তো একটা কিছু করে নিতে পারি। মানে ব্যাপারটা যখন আমাদেরই, আরও আস্তে চলে অজয়, তুমি যদি বল তাহলে ম্যারেজ অফিসারের সঙ্গে দেখা করে আমি কালই একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারি ?

হঠাৎ কোন কথা বলতে পারে না উর্মিলা। জোরে হাওয়া দেয়। ওর বেশ শীত লাগে। অজয় যা বলছে তা ওর একেবারেই মন্দ লাগে না। কিন্তু কমলার কথা ভেবে খুব উৎসাহের সঙ্গে তার কথা

এই মুহূর্তে মেনে নিতে পারে না। যদি পরে সব শুনে অজয়ের বাবা রেগে যান—যদি সে-বাড়িতে তাদের জায়গা না দেন। তাহলে কোথায় যাবে তারা। ঊর্মিলা কিছুতেই তার মার মতো অভিশপ্ত জীবন কাটাতে পারবে না।

অজয় তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে, তোমার যদি আপত্তি থাকে তাহলে চুপেচাপে কিছু করবার দরকার নেই—

না না, সেকথা নয়, ঊর্মিলা বাধা দিয়ে বলে, আমি ভাবছিলাম যদি আমার জন্যে আপনার বাবা—

আমার ওপর রেগে যাবেন—এই তো? অজয় হেসে বলে, ওসব কিছু হবে না। বাবার স্বভাব ঠিক সেরকম নয়। তবে যদি তোমার মা পরে গোলমাল করেন তাহলে খুব মুস্কিল হবে।

না, অন্য কি কথা ভাবতে ভাবতে ঊর্মিলা বলে, মা কিছু করবেন না। আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম—

বিয়ের পর সটান সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কেউ আর কিছু বলে না, গোটা পার্কটা বার দু-এক ঘুরে ওরা বেরিয়ে আসে, কিন্তু তুমি একেবারে প্রস্তুত কি-না তাই আগে বল? আমি তো স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের দিকটাই দেখছি—

ঊর্মিলা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না অজয়কে। সে যা বলে তাই মেনে নেয়। ও বাড়িতে অভাবে আর অন্ধকারে এক কোণায় ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতে সেও আর চায় না। অজয় যখন এত তাড়াতাড়ি নিজের থেকেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তখন তা ধরে সামনে এগিয়ে যেতে তার সঙ্কোচ হবে কেন।

এক অস্বাভাবিক ঘোরের মধ্যে দিয়ে আজ ঊর্মিলার সারাদিন

কেটেছে। বাইরে রোদ নেই। ভিজে সকাল। ঘরের মধ্যে অন্ধকার আর চড়ুই পাখির কিচির-মিচির। ঘরে বাইরে কোন উত্তাপ নেই। চারপাশে ঘুমপাড়ানি ঝিমঝিমানি ভাব। কোথাও একা দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কাঁদতে পারলে হয়তো উর্মিলার পক্ষে ভাল হত। তার সব উৎসাহ কাল রাত থেকে যেন থিতিয়ে গেছে। একটুও ঘুম হয় নি। আজ সকালে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে সে নিজেই চমকে উঠেছে।

কিন্তু উপায় নেই। নিজেকে নানাভাবে বোঝায় উর্মিলা। প্রাণপণে মনে মনে শক্ত হতে চেষ্টা করে। আজকের দিন কিছুতেই ব্যর্থ হতে পারে না। মুহূর্তের দুর্বলতায় যদি আজ তার কথার এদিক-ওদিক হয় তাহলে সে আর অজয়কে পাবে না। তার কাছে সে একেবারে ছোট হয়ে যাবে।

বিকেল চারটয়ে অজয় তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসে দাঁড়াবে। তারপর উর্মিলাকে নিয়ে সোজা চলে যাবে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। তারই কাছাকাছি ম্যারেজ অফিসারের বাড়ি। অজয় সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। আজই মাত্র তিনজন সাক্ষীর সামনে ওদের বিয়ে হয়ে যাবে। সন্ধ্যেবেলা উর্মিলা গিয়ে উঠবে অজয়ের বাড়িতে। তাকে সঙ্গে নিয়ে সে সব কথা বলবে রুকি বুকি আর তার বাবাকে।

উর্মিলার জীবনের এত বড় একটা ঘটনা সে কমলার কাছে গোপন করতে চায় নি। আজও যদি তিনি শোনেন তাহলে হয় তো সঙ্গে যাবেন কিম্বা বলবেন, উর্মি আমি কি মরে গেছি? এমন করে চুপেচাপে কেন? কত ঘটা করে আমার তোর বিয়ে দেবার সাধ, সেকথা তো জানিস। তাহলে?

হয়তো তখন দাদা গোলমাল করবে। দিবানাথ এসে দাঁড়াবে কোথা থেকে। অজয়ের নামে যত মিথ্যা কথা তুলবে কমলার কানে। আর তখন তাঁর মন ভেঙে যাবে। হয়তো তিনি চোখের জল ফেলবেন, না হলে উর্মিলার হাত ধরে তাকে বোঝাবেন এ ভুল না করতে।

অজয়ের কথাই মেনে নিয়েছে উর্মিলা। এখন কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। বিয়েটা হয়ে গেলে ওরা ঠিক করবে কাকে কি ভাবে বলবে। সেকথা সে স্পষ্ট বুঝেছে। আর তাই বোধহয় তার চোখে আজকের পৃথিবী একেবারে অন্যরকম হয়ে দেখা দিয়েছে। কমলার আশে-পাশে সে ঘুরে ফিরছে। বারবার তাকিয়ে দেখছে তাঁর মুখের দিকে। বিষাদ আর আনন্দ তার মনের মধ্যে আশ্চর্য-ভাবে মিশে গিয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগাচ্ছে। এ বাড়ি আজ তাকে চিরকালের জন্যে ছেড়ে যেতে হবে। এবার থেকে এখানে সে আসবে বাইরের লোকের মতো। কয়েক মিনিট বসবে। কথা বলবে সকলের সঙ্গে। তারপর আবার ফিরে যাবে তার নিজের বাড়িতে। সব শুনে কমলা কি ভাবে গ্রহণ করবেন তাকে—তাঁর কি মনে হবে শুধু সেই কথাটাই উর্মিলা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না।

আর থেকে থেকে একটা বিশ্রী ভয়ও উঁকি মারছে তার মনে। যদি অজয়ের বাবা চিৎকার করে ওঠেন। যদি সে বাড়িতে তাদের জায়গা না দেন। তখন অজয় কোথায় যাবে তাকে নিয়ে। উর্মিলা ভাবে আর কাঁপে। ভয়ে আর ভাবনায়।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেল। মা ঘুমোচ্ছেন। দাদার ঘরের দরজা বন্ধ। পূজোর ছুটি এখনও শেষ হয় নি। সকলেই নিশ্চিন্ত। শুধু উর্মিলার চোখে ঘুম নেই। এক একবার ঘড়ির

দিকে তাকাচ্ছে আর চমকে উঠছে। ইচ্ছে করছে মাকে সব কথা বলে দিতে। তাঁকে কিছু না বলে এত বড় একটা কাজ করবার কথা সে কি কিছুদিন আগে কল্পনাও করতে পারে নি।

যন্ত্রের মতো চারটের আগে-আগে উর্মিলা তৈরি হয়ে নিল। কথা যখন দিয়েছে তখন রাখতেই হবে। মন তোলপাড় হয়ে গেলেও ঠিক সময় ঠিক জায়গায় উপস্থিত থাকতেই হবে। মাকে এখন আর কিছু বলবার দরকার নেই। উর্মিলা সকালেই তাঁকে বলে রেখেছিল আজ বিকেলে এক বন্ধুর বাড়িতে চা খেতে যাবে। ফিরতে হয়তো একটু রাত হতে পারে। কমলা কিছু বলেন নি। ঠাণ্ডা চোখে শুধু মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। তাঁর এই সন্দেহের দৃষ্টিটাই উর্মিলার একেবারে ভাল লাগে না।

ঠিক সময় রাস্তায় বেরিয়ে আসে উর্মিলা। আজ দরজা খোলবার আগে দু মিনিট চোখ বন্ধ করে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। মাকে মনে মনে প্রণাম জানায়। চোখ দুটো বোধহয় একটু ছলছল করে তার। সে সারা ঘরখানাকে জল ভরা চোখে খুব ভাল করে দেখে নেয়।

এখনও রোদ নেই। সব কোলাহল হঠাৎ যেন থেমে গেছে। মূক গরুর দল আস্তে আস্তে চলেছে। গয়লাদের বালতির শব্দও শোনা যায় না। হয়তো শব্দ হচ্ছে রোজকার মতন। ওই তো একের পর এক কত মোটর গাড়ি যাচ্ছে সামনের বড় রাস্তা দিয়ে। উর্মিলা এই মুহূর্তে বধির হয়ে গেল কি-না কে জানে।

শুধু কমলাকেই দেখছে সে চোখের সামনে। তিনি ঠোঁট নাড়ছেন। হাত বাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছেন উর্মিলাকে, কিন্তু নাগাল পাচ্ছেন না। সে যে চলে এসেছে অনেক দূরে। বারবার পিছন ফিরে দেখছে

উর্মিলা। চলছে খুব আস্তে আস্তে। এত আস্তে যে তার চলা দেখলে মনে হয় যতীন দাস রোড থেকে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে পৌঁছতে অন্তত আরও এক ঘণ্টা লাগবে।

একটা ট্র্যাম প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়েছিল। জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাচ্ছে ড্রাইভার। তবু উর্মিলা শুনতে পায় না। আশ্চর্য! রাস্তার ওপার থেকে চিৎকার করে উঠল অজয়। তাড়াতাড়ি ছুটে এল তার কাছে।

এ কী, এত অন্যমনস্ক! ট্র্যামটা আর একটু হলেই—

ঠোঁট কাঁপছে উর্মিলার। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে যন্ত্রের মতো থেমে থেমে সে বলল, তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হতে চাইছিলাম—

অজয় জিজ্ঞেস করে, তোমার কি হয়েছে উর্মি? চেহারা যে একেবারেই অন্যরকম দেখাচ্ছে—

না না, কিছু হয় নি, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে উর্মিলা বলে।

মোটর গাড়ির কাছে এসে অজয় তার তিনজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। ওরা হাসে তাকে দেখে। অজয়ের পছন্দের প্রশংসা করে।

উর্মিলা হাসতে পারে না আজ। পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে মোটরে বসে থাকে। কতবার তো সে এখানে-ওখানে গেছে অজয়ের সঙ্গে। আজ কিন্তু তার গা ছমছম করে। বুকের কাঁপন দ্রুত হয়। দুর্দান্ত বেগে এদের সকলকে ফেলে ছুটে বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। গাড়ি বেশ জোরে চালাচ্ছে অজয়। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক উর্মিলার গায়ে লাগে।

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছাকাছি একটা পুরনো বাড়ির

সামনে অজয় মোটর থামায়। ওদের সকলের সঙ্গে ঊর্মিলাও নেমে আসে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে শব্দ করে ওপরে ওঠে। অজয় তার পাশেই থাকে।

ঊর্মিলার পিঠের ওপর একটা হাত রেখে সে বলে, এত গম্ভীর কেন ঊর্মি? আমি তো আছি। এবার থেকে সব সময় আমি তো থাকব—

জানি, ম্লান হাসি হেসে ঊর্মিলা বলে।

মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। গম্ভীর প্রৌঢ় মানুষটির বাড়িয়ে দেয়া খাতায় শুধু একটা সই। আর কিছু নয়। ঘরে একটা বড় টেবিল আর কয়েকটা কাঠের চেয়ার। টেবিলের ওপরে টেলিফোন। বড় বড় দরজা-জানলা। কঠিন। নীরস। সামনের প্রৌঢ় মানুষটির মতো। তবু তিনি হাসতে হাসতে ঊর্মিলার সামনে খাতাখানা বাড়িয়ে দেন।

সারা ঘরখানা যেন কাঁপতে থাকে। মাথা ঘোরে ঊর্মিলার। সে কারুর দিকে তাকায় না। আঙুল দিয়ে কলমও ধরতে পারে না ঠিক করে। নামের অক্ষরগুলো বেঁকে যায়। যেখানে সই করল সেখানে কি লেখা আছে তা পড়ে দেখবার মতো মনের অবস্থা থাকে না তার। আঁকাবাঁকা অক্ষরে বেসামাল আঙুলে ঊর্মিলা কোন রকমে শুধু নিজের নামটা সই করে।

অজয়ের বন্ধুরা হাসিমুখে উঠে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে অভিনন্দন জানায় ওদের দুজনকে। জোরে জোরে কথা বলে উল্লাস প্রকাশ করে। তারপর কোলাহল করতে করতে অজয় আর ঊর্মিলাকে নিয়ে বেরিয়ে আসে রাস্তায়।

মাত্র একটি সই। কোন কোলাহল ছিল না সে-ঘরে। কোন

সুগন্ধ ছিল না। অতিথির ভিড়ও ছিল না। কোন শব্দ—কোন মন্ত্র পাঠ ছিল না। তবু এখন উর্মিলা অজয়ের স্ত্রী—সেই তার এক-মাত্র পরিচয়। কথাটা ভাবতে অনেক সময় লাগে তার। মিষ্টি লজ্জার হাসি ফুটে ওঠে মুখে। অজয় কিম্বা তার বন্ধুবান্ধব—উর্মিলা এখন ওদের কারুর দিকেই আর চোখ তুলে তাকাতে পারে না।

বন্ধুরা রসিকতা করে। উর্মিলা চুপ করে বসে থাকে অজয়ের পাশে। রাস্তা আর আশে-পাশের সব কিছুই হঠাৎ ওর বড় মিষ্টি লাগে। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের মধ্যে বড় বড় গাছ, রাস্তা, বাস-ট্র্যাম, ট্যাক্সি আর ফেরিওলা যেন নতুন রূপ নিয়ে এসে দাঁড়ায় তার চোখের সামনে।

চৌরঙ্গীর এক রেস্তোরাঁয় এসে ওরা অনেকক্ষণ ধরে চা খায়। উর্মিলা কথা বলে না। নতুন বউএর মতো মুখ নামিয়ে চুপ করে বসে থাকে। অজয়ের বন্ধুদের মজার-মজার কথা শুনে মাঝে মাঝে হাসি চাপতে পারে না।

বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। রেস্তোরাঁয় অনেক লোক। চা কফি আর সিগ্রেটের ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে। ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছে অনেকে। উর্মিলার অস্বস্তি হয়। যদি ওর চেনাশোনা কেউ তাকে দেখে ফেলে।

কিন্তু এখান থেকে কোথায় যাবে ওরা? মার সামনে কেমন করে দাঁড়াবে সে? সব কথা শুনে মা কি ভাববেন? সব ব্যাপারটা গোপন করে রাখতেও সে আর চায় না। অজয়ের বন্ধুরা আগেই চলে যাবে তার বাড়িতে। রুকি বুকিকে বলবে প্রস্তুত হয়ে থাকতে। ইচ্ছে করলে উর্মিলাও এদের দিয়ে কমলাকে খবর পাঠাতে পারে।

কিন্তু সেটা ভাল হবে না। অন্য কারুর মুখ থেকে কিছু শোনবার চেয়ে উর্মিলার মুখ থেকে সব কথা শোনাই ভাল।

চায়ের ভরা কাপ হাতের কাছে নিয়ে উর্মিলা ভাবে কমলাকে অল্পে অল্পে জানিয়ে দিলেই হত। আজকের কথা বলবার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু তার সঙ্গে যে অজয়ের যোগাযোগ এমন করে নিবিড় হবে সেকথাটা তাকে কৌশলে জানিয়ে দিলেই বোধহয় ভাল হত। তাঁর ইচ্ছে থাক বা না থাক, মনে মনে তিনি তাহলে হয়তো প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারতেন।

আজ উর্মিলার মুখ থেকে সব কথা শুনে তিনি চমকে যাবেন। সাংঘাতিক রকম একটা আঘাত লাগবে তাঁর। উর্মিলা তার মাকে চেনে খুব ভাল করে। অজয়কে যে ভাবেই গ্রহণ করুন না কেন, কমলা এই ভেবে অবাক হবেন যে উর্মিলা কেমন করে তাঁকে এত দূরে সরিয়ে দিতে পারল। তাঁকে কিছু না জানিয়ে কেমন করে পারল শুধু একটা সই করে আর একজনের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে।

কিন্তু যা-ই হোক, আর লুকিয়ে কোন কাজ করবে না উর্মিলা। এখান থেকে বেরিয়ে অজয়কে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে যাবে যতীন দাস রোডে। কমলাকে প্রণাম করে সব কথা বলবে। সে কোন অন্যায় করেনি তাই আত্মগোপন করে থাকবে না। ব্যাপারটার আঁচ এতদিন মাকে না দিয়েই সে অন্যায় করেছিল।

অজয় কাপটা সরিয়ে রেখে বলে, এবার কোথায় যাবে?

আমাদের বাড়িতেই আগে যাই—

অজয়ের বন্ধুরা উঠে দাঁড়ায়, আমাদের এখন অনেক কাজ। আমরা এবার যাই—কতক্ষণের মধ্যে বাড়ি আসবে অজয়?

অজয় বলে, এই ধর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে?

না না, ওরা একটু ভেবে বলে, অন্তত ঘণ্টা দু-এক বাইরে কাটাও —আমাদের সাজাতে কিছু সময় লাগবে তো।

অজয় হেসে বলে, আচ্ছা।

ওদের বিদায় দিয়ে অজয় আর উর্মিলা মোটরে ওঠে। প্রথমেই যতীন দাস রোডের দিকে যায় না ওরা। আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে অজয় ময়দানের চারপাশে ঘোরে। তখন শেষ হেমন্তের অন্ধকার নেমেছে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। ফাঁকা মাঠ আর গাছ অতীত যুগের ছবির মতো মনে হচ্ছে।

কি ভাবছ উর্মিলা ?

তোমার বাবা কি মনে করবেন !

কিছু না। আমি সব ঠিক করে নেব, গাড়ি চালাতে চালাতে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিয়ে অজয় বলে, তোমার মা আর দাদা আমাদের কি ভাবে নেবেন তাও তো বুঝতে পারছি না—

উর্মিলা আস্তে বলে, ভাবছি মাকে আগে বললেই হত।

সেটা না বলে ভালই হয়েছে, শুধু শুধু একটা অশান্তির সৃষ্টি হত আর তোমার মন আরও বেশি খারাপ হয়ে যেত।

উর্মিলা বলে, যাক যা হবার হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, এখন ওসব ভেবে মন খারাপ করে কোন লাভ নেই, একটু চুপ করে থেকে অজয় হেসে বলে, এ দিন জীবনে দুবার আসে না। এখানে গাড়িটা একটু রাখব ? দেখ গঙ্গার জল দেখা যাচ্ছে—

এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে উর্মিলা বলে, রাখ।

একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গার ওপর। দূরে নৌকো ভাসছে। জলে আলো কাঁপছে। জাহাজের বাঁশি বাজছে মাঝে মাঝে। এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল। ফেরিওলা চিৎকার করছে।

উর্মিলা তাকিয়ে দেখে অজয়ের দিকে। যাকে চেয়েছিল তাকে সে সত্যি পেয়ে গেছে। তবু মনের মধ্যে যেন একটা পাষাণভার চাপান রয়েছে। ঠিক এ অবস্থার কথা তার জানা ছিল না। কখন আনমনে একটা হাত সে রাখে অজয়ের কোলের ওপর। আর অজয় তাকে সব শক্তি দিয়ে কাছে টেনে নেয়। আদর করে। উগ্র আগ্রহে উর্মিলাও মেতে ওঠে।

কেউ কোন কথা বলে না। অনেকক্ষণ কেটে যায়। হেমন্তের শেষ যেন বসন্তের প্রথম। ঠাণ্ডা হাওয়া কিন্তু গা সির সির করে না। এলোমেলো ভাব ছড়িয়ে আছে ঘাসে আর গাছের পাতায়। শীতের শেষেও ঠিক এমনি অবস্থা হয় প্রকৃতির। ঠাণ্ডার আমেজ থাকে, শীত লাগে না।

অজয় ধরা গলায় বলে, আমাকে নিয়ে হয়তো তোমার অনেক অসুবিধা হবে—তুমি ঠিক করে নিও—

কিন্তু তুমি কি আমাকে নিয়ে সুখী হবে ?

জীবনের শেষদিন অবধি। সে সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলাম বলেই তো এমন করে তোমাকে নিলাম, একটু চুপ করে থেকে অজয় বলে, এখন ভাবছি শুধু নিজের দিকটাই দেখেছি। তোমার কথা আরও ভাল করে ভাবা উচিত ছিল—

ভেবেছিলে বইকি, শান্ত স্বরে উর্মিলা বলে, আমিও তো আর দেরি করতে পারছিলাম না। এই সব চেয়ে ভাল হল, সে অনেকক্ষণ গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকে, তোমার বাবার সামনে কেমন করে দাঁড়াব শুধু সেকথাটাই ভেবে পাচ্ছিনা, যেন লজ্জায় উর্মিলা ভেঙে পড়ে অজয়ের বুকের ওপর।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অজয় হেসে বলে, বারবার

ওকথা ভেবে মন খারাপ করছ কেন? তোমাকে দেখে কেউ অপছন্দ করতে পারে নাকি—কিন্তু চল ও কাজগুলো এবার সেরে ফেলি—এতই যখন ভাবনা তোমার!

উর্মিলা মাথা তুলে বলে, হ্যাঁ তাই চল।

গাড়ী চলে আবার। কখনও আলো কখনও অন্ধকার। রাস্তার এপাশে-ওপাশে বড় বড় গাছ। অভিভাবকের গম্ভীর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে যেন ওদের দিকে তাকিয়ে আছে মূর্ত বিস্ময়ের মতো। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে। উর্মিলা চোখ নামিয়ে নেয়।

যতীন দাস রোডে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগল না ওদের। কোন অন্যায় করেনি কিন্তু অস্বাভাবিক কাঁপুনি শুরু হয়েছে উর্মিলার বুকের ভেতর। মাথা ঝিমঝিম করছে। পা টলছে। গলা শুকিয়ে গেছে। প্রথমে কেমন করে সে কমলার সামনে কথা তুলবে। এ বাড়িতে অজয় প্রায় অপরিচিত। যদি সকলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে কিম্বা শোকে ব্যাকুল হয় তখন সেই অবস্থার মাঝখানে অজয়কে নিয়ে সে কি করবে। তাকে সঙ্গে করে না নিয়ে এলেই হত।

চাকর দরজা খুলে দিল। আলো জ্বেলে উর্মিলা বসতে বলল অজয়কে। নিজে কোন রকমে গেল কমলার সন্ধানে। এই সময় তিনি ছাত্রী পড়িয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। আজ এখনও ফিরেছেন কি-না কে জানে। দাদা বৌদির ঘর অন্ধকার। ওরা কোথাও বেরিয়েছে বোধহয়। খুব ভাল হল। শুধু মার সঙ্গেই উর্মিলার দরকার এখন।

কি রে উর্মি? স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে উর্মিলাকে তাঁর ঘরের কাছাকাছি দেখতে পেয়ে কমলা জিজ্ঞেস করেন।

কখন ফিরলে মা ?

এই তো একটু আগে। শিবুরা গেছে বায়স্কোপে, উর্মিলার দিকে হঠাৎ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কমলা জিজ্ঞেস করেন, তোর চেহারাটা এমন দেখাচ্ছে কেন রে ? চুল উস্কোখুস্কো—

মাকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি উর্মিলা বলে, বাইরে খুব হাওয়া কি-না—মা একটু এদিকে এস না—

তুই অমন করছিস কেন ? কি হয়েছে ? শীগগির বল বাপু। বড় ভাবনা হয় আমার, কমলা মেয়ের একেবারে কাছে এগিয়ে এসে তার কথা শোনবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।

না না, কিছু হয়নি। তুমি ঘাবড়িও না, কমলার হাত ধরে উর্মিলা তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে এসে বসায়, অজয় এসেছে মা। আমি ওকে বাইরের ঘরে বসতে বলেছি।

ও, নির্বিকার স্বরে কমলা বলেন, দিবানাথ আজকাল একেবারেই আসে না কেন রে ? তুই ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি ?

মার কথা যেন শুনতে পায়নি এমন ভান করে উর্মিলা বলে, তুমি অজয়ের সঙ্গে একটু কথা বলবে মা ? তোমার কথা প্রায়ই ও বলে—

আজ নয় রে, কমলা বলেন, শিবু বাড়িতে নেই—ও আবার কি ভাববে আর তাছাড়া শরীরটাও খুব ভাল নেই আমার—

তবে থাক, হঠাৎ রাগ হয় উর্মিলার। দাদার মত না নিয়ে মা আলাপ করবেন না অজয়ের সঙ্গে। হয়তো সে তাকে বিয়ে করেছে শুনে দেখা করতে আসবেন না বাইরের ঘরে। কিন্তু উর্মিলা কল্পনা করবার চেষ্টা করে মার অবস্থাটা আর একটু পরে কেমন হবে।

চোখে সন্দেহ নিয়ে কমলা তাকিয়ে থাকেন মেয়ের দিকে,

কোথায় থাকিস তুই আজকাল উর্মি? যা, আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখ—

মা—উর্মিলা থেমে যায়। কথা বলতে পারেনা।

কি বল না? কি হয়েছে তোর?

মা আমি এখুনি এখান থেকে চলে যাব—পাছে বাইরের কেউ এসে পড়ে বলে উর্মিলা তাড়াতাড়ি কথাটা বলে ফেলতে চায়। কিন্তু কে জানত এই ছোট কথাটা বলা এত কঠিন।

চমকে উঠে বিবর্ণ মুখে কমলা জিজ্ঞেস করেন, কি বলছিস উর্মি? কোথায় যাবি তুই এখুনি?

তোমাকে আগে বলিনি, কমলাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে উর্মিলা, আমি অজয়কে বিয়ে করেছি—

উর্মিলা স্পষ্ট দেখে তার মার চেহারাটা একেবারে বদলে যায়। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে। চোখ দুটোও যেন স্থির হয়ে যায়। মুখ থেকে শুকনো ভারী আওয়াজ বার হয়, কবে? কোথায়?

মার কোলের ওপর মুখ গুঁজে উর্মিলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে উত্তর দেয়, আজ—

উর্মি! ভয় ফুটে ওঠে কমলার গলার স্বরে, এ কী করলি তুই! নিজের মাথা দুই হাতে শক্ত করে ধরে তিনি মুখ নামান, আমাকে আগে বললি না কেন?

ভয় ছিল যদি তুমি মত না দাও—

অজয়ের বাবা জানেন?

উনি এখুনি সব শুনবেন। আমরা ওখানেই যাচ্ছি।

কেন তুই এমন করে বিয়ে করলি উর্মি? উর্মিলার দেহটা জোরে ঝাঁকিয়ে দেন কমলা, আমাকে দেখিসনি এতদিন? কী সাংঘাতিক

অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়ে আসছি ? কেন—কেন তুই আমাকে আগে বললি না ?

মার চেহারা দেখে উর্মিলা ভয় পেয়ে যায়। তাঁকে যেন চিনতে পারে না সে। ঠক ঠক করে কাঁপছেন তিনি। চোখ বেয়ে হু হু করে জল পড়ে যাচ্ছে। উর্মিলাকে এখনও শক্ত করে ধরে আছেন।

অজয় বলেছে সব ঠিক করে দেবে মা। তুমি শুধু শুধু এমন করনা। চল অজয়কে দেখবে।

স্বার্থপর মেয়ে! আমাকে এতদিন দেখে কেমন করে তুই একাজ করতে পারলি ? ইস্কুলে কি বলব আমি? ছাত্রীদের কেমন করে মুখ দেখাব—আরও জোরে কমলা কেঁদে ওঠেন। হঠাৎ তাঁর নিজের প্রথম জীবনের কথাই হয়তো মনে পড়ে যায়। তাঁর শ্বশুর এমনি আঘাত একদিন পেয়েছিলেন।

তুই যা উর্মি। আমার কথা আমি ভাবব। যা যা, আমার সামনে থেকে চলে যা। আমি কাউকে দেখতে চাইনা—

উর্মিলা আস্তে মাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, তুমি কেন এমন করছ মা ? আমি সুখী হব বলেই তো—

কমলা চিৎকার করে ওঠেন, তুই থাম। ওসব কথা আমাকে বলিস না। এমন করে কেউ সুখী হয় না—সুখী হতে পারেনা—

তুমি আমাকে অভিশাপ দিচ্ছ মা ?

তুই নিজে অভিশাপ ডেকে এনেছিস। যেখানে যাবি যা। শিবু এলে আমি যা হয় করব—উর্মিলার হাত ঠেলে দেন কমলা।

মাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে উর্মিলার চলে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু অজয় অনেকক্ষণ একা বসে আছে। তাছাড়া শিবেনেরও ফিরে আসবার সময় হল। আজ উর্মিলা তার সঙ্গে দেখা করতে

চায় না। অজয়ের কথা ভেবে এখুনি এখান থেকে চলে যাওয়া ভাল। দু-একদিন পর আবার খবর নিলেই চলবে।

আমি যাচ্ছি মা—

মাথা তুলে কমলা একদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর চেহারা দেখে ময়দানের সেই গাছগুলোর কথা উর্মিলার মনে পড়ে। কিন্তু তার বুক অনেক হালকা হয়ে গেছে। মাকে সব কথা খুলে বলতে পেরেছে। সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখে। বুক ঠেলে আবার কান্না আসতে চায়।

আমি যাচ্ছি মা—

কমলা অনেকক্ষণ কথা বলেন না। তেমনি করেই তাকিয়ে থাকেন মেয়ের দিকে। উর্মিলা তাঁর চোখের সামনে থেকে হঠাৎ কখন সরে যায়। তখন বালিসে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিনি কাঁদেন।

ঘরের বাইরে গিয়ে উর্মিলা চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। যেন চোরের মত শূন্য হাতে সে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। অজয়ের সামনে গিয়ে এখন কি কথা বলবে সে? যদি মা কথা বলতেন অজয়ের সঙ্গে—তাকে উর্মিলার স্বামী বলে মেনে নিতে পারতেন তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যেত। এ অপমান অজয় কিভাবে গ্রহণ করবে সেকথা উর্মিলা বুঝতে পারে না।

অজয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে, চল।

যেন সব কথা শুনতে পেয়েছে এমনভাবে অজয় বলে, দুঃখ করনা উর্মি। এ তো সহ্য করতেই হবে—

তোমাকে নিয়ে কেন আমি এখানে এলাম?

অজয় হাসে, আমাকে নিয়েই তো সব জায়গায় এবার থেকে তোমাকে যেতে হবে—এখন চল তোমার নিজের বাড়িতে যাবে—

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে অজয়ের বাড়ির কাছাকাছি এসে রুমাল বের করে মুখটা ভাল করে মুছে নিল উর্মিলা। ঠোঁটে একটু রঙ বুলিয়ে নিল। হাতটা যেন অবশ হয়ে গেছে। কিছু করতেই আর উৎসাহ নেই। এতক্ষণ যেন তুষারের প্রবল ঝড়ের মধ্যে দিয়ে তাকে আসতে হয়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া ধারালো তীরের মতো বিঁধেছে সারা গায়ে। চারপাশের সব উত্তাপ বোধহয় জুড়িয়ে গেছে।

অজয়ের বাড়ির কাছাকাছি এসে হঠাৎ এক সময় নিজেকে ফিরে পায় উর্মিলা। সোজা হয়ে বসে পিছনে ঝরে পড়া গায়ের জমা তুষার এক মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলতে চায়। ভেঙে পড়লে চলবেনা। ও বাড়িতে সে থাকবে না বলেই তো বেরিয়ে এসেছে। তাহলে সেখানকার ঝড়-ঝাপ্টার কথা মনে করে নতুন বাড়িতে প্রবেশ করবার সময় পা কাঁপবে কেন। কেন সমস্ত দেহ বরফে ঢাকা গাছের মতো ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে। তাই যতটুকু পারে নিজের চেহারার সংস্কার করবার জন্যে সে তৎপর হয়ে ওঠে।

কিন্তু গাড়ি থেকে নামবার সময় উর্মিলার দেহ আবার লজ্জায় হিম হয়ে যায়। একবার চোখ তুলে তাকিয়ে সে দেখে রুকি বুকি আর অজয়ের বন্ধুদের। শুধু অজয়ের বাবাকে কোথাও দেখতে পায় না। বন্ধুরা চিৎকার করে কাছে এগিয়ে আসে। অজয়কে জোর করে কাঁধে তুলে নিতে চায়। রুকি বুকি কেউ উর্মিলার কাছে আসে না। দূর থেকেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

কী কাণ্ড দাদা? হুপ করে বিয়ে!

বাবা কোথায়? কিছু বলেছিস?

হ্যাঁ। বাবা তো বিশ্বাস করতেই চাননা—

এবার করবেন। এস উর্মি—অজয় উর্মিলার সঙ্গে আস্তে আস্তে হেঁটে সুধাংশুমোহনের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

উর্মিলা আর কোনদিকে তাকায় না। রুকি বুকিকে আজ তার অন্যরকম লাগে। থিয়েটারের সময় তারা যেমন প্রশংসা করত উর্মিলার—আজ তাদের সে-ভাষা কোথায় গেল। যেন এর আগে তারা আর কখনও দেখেনি উর্মিলাকে—তাকে একেবারেই চেনেনা।

চলতে চলতে উর্মিলা এই ভেবে সান্ত্বনা পায় যে খুব বেশি অবাক হয়ে গেছে বলেই অন্য কোনদিকে খেয়াল নেই ওদের। একটু পরেই তার ভুল ভেঙে যাবে। এখন সুধাংশুমোহনের দৃষ্টির ওপর তার জীবনের সবাকছু নির্ভর করছে। মার কথা মনে করে বুক কাঁপে উর্মিলার। ভয়ে গলা শুকিয়ে যায়।

আর একটা আশাও জাগে মনে। যদি তাঁর স্নেহ সে পায়। যদি তাকে দেখে তিনি খুশি হন আর অজয়কে ক্ষমা করে ফেলেন। নিজের বাবাকে উর্মিলা কখন দেখেনি—দেখতে চায়নি। তাই সুধাংশুমোহনকে গভীর শ্রদ্ধা করবার আগ্রহে তার সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

বাবা?

কে? ইজিচেয়ারে সুধাংশুমোহন নড়ে ওঠেন, ও। এই বুঝি? থাক থাক—হ্যাঁ, তুমি এত বড় ইডিয়ট কেন অজয়? আরে, রুকি বুকিকে আগে থেকে বলে রাখলে—বিয়ে একটা ছেলে খেলা নয় তো। যাক গে, কাল-পরশু একটা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর।

পাঁচজন আসুক। দেখুক—সুধাংশুমোহন আবার ইজিচেয়ারটায় শুয়ে পড়েন।

উর্মিলা কিছু বুঝতে পারে না। মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ভয় পায়। বাবার সম্বন্ধে মনে মনে সে যা কল্পনা করেছিল সুধাংশুমোহনকে দেখে তা মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। একেবারে অপরিচিত এক মানুষ ঠাণ্ডা পাথরের মতো পড়ে আছেন একধারে।

ওরা বেরিয়ে আসে সুধাংশুমোহনের ঘর থেকে। রুকি আর বুকি নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে উর্মিলার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওদের হাসি ভাল লাগে না উর্মিলার। চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যেতে ইচ্ছে করে। অজয়ের বন্ধুরা আগে চলে এসে এদের বোধহয় শুধু খবরই দিয়েছে। আর কোন ব্যবস্থা করেনি। কোলাহল নেই। আনন্দের সাড়া নেই কোথাও। সমস্ত বাড়িটা যেন শোকে থমথম করছে। যে-বারান্দায় একদিন অজয়ের সঙ্গে বসে উর্মিলা অনেক গল্প করেছিল আজ সে সেই অন্ধকারে ঢাকা জায়গাটাকেই চিনতেই পারেনা।

এইদিকে—এইদিকে—বন্ধুরা অজয়ের হাত ধরে তার শোবার ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

সেই ঘরে অনেক ফুল। চারপাশে মিষ্টি গন্ধ। বন্ধুরা ফুল দিয়ে সুন্দর করে খাট সাজিয়েছে। উর্মিলা মাথা তুলে তাকায়। এতক্ষণ পর রুকি এসে তাকে সেই খাটে বসতে বলে। আর ওরা দুই বোন তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। আস্তে আস্তে উর্মিলার বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করে।

খাওয়ার প্রচুর আয়োজন করা হয়েছিল এই অল্প সময়ের মধ্যে।

কিন্তু ক্ষিদে একটুও নেই উর্মিলার। অজয়ও কিছু খেতে পারলনা। সেইদিন খাবার টেবিলে বসেই আগামী শনিবারে বৌভাত করবার কথা ঠিক হল। আর কাদের নেমন্তন্ন করা হবে তাদের নামও মুখে মুখে বলা হল।

আজ সারারাত ঘুমতে হয়না। গত কয়েকদিন থেকে ঘুম নেই উর্মিলার চোখে। এত ফুলের মাঝে অজয়কে পুরোপুরিভাবে পেয়েও কান্না ঠেলে উঠছে তার বুক থেকে। ফুল আছে। অজয় আছে। গন্ধ আর আলোও আছে। কিন্তু কি যেন একটা নেই।

এতদিন ধরে নিজে সব দিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যে মা উর্মিলাকে অগাধ স্নেহ দিয়ে এতবড় করে তুলেছেন আজ সেই মাকে সে কাঁদিয়ে এসেছে। উর্মিলা কোনদিন তার মাকে এমন ছেলে-মানুষের মতো কাঁদতে দেখেনি। এখন কমলার কথা মনে করে তার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে।

কথা বলছ না যে ?

তুমি বল।

শুধু শুধু ভাবনা করেছিলে উর্মি। দেখলে তো বাবা কত সহজ-ভাবে আমাদের নিলেন ?

উর্মিলা হাসবার চেষ্টা করে বলে, হ্যাঁ।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারেনা উর্মিলা। এ বাড়ির সকলে তাকে সত্যি হয়তো সহজভাবে নিয়েছে কিন্তু সে-ই বোধহয় কাউকে সহজভাবে নিতে পারছে না। রুকি বুকি আর সুধাংশুমোহন—তার যেন একেবারেই অপরিচিত। এ সময় একবার বাণী শিবেন আর কমলাকে দেখতে পেলে উর্মিলার সব দুঃখ দূর হয়ে যেত। যদি কাল মা একবার তার খবর নেন—যদি বৌদিকে নিয়ে দাদা

আসে। মা এসে নিজের চোখে দেখুন যে অজয়ের বাবা অভিশাপ দিয়ে ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেননি। উর্মিলাকে নিয়ে সে এ বাড়িতেই থেকে গেছে।

পরদিন কমলা আসেন না কিন্তু শিবেন আর বাণী আসে। একটু ভয়-ভয় ভাব। চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। বেয়ারা নিচের ঘরে বসিয়েছে ওদের। খবর পেয়ে অজয় আর উর্মিলা তাড়াতাড়ি নেমে আসে। বাগানে তখন কচি রোদ ঝিলমিল করছে। একদিকে নীল বেতের চেয়ারে বসে সুধাংশুমোহন খবরের কাগজ পড়ছেন।

দাদা, মা কেমন আছেন? উর্মিলার স্বর কাঁপে।

অজয়ের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয় শিবেন, আরে সব ঠিক হয়ে গেছে। কিছুই করতে পারলেন না বলে দুঃখ করছিলেন, শিবেন হেসে অজয়কে বলে, আমাদের পর করে দিলে কেন?

আরে না না, তা কি হয়—মানে—চা খাবেন?

তোমরা আগে খাবে আমাদের ওখানে। এবার চল একদিন। কবে যেতে পারবে আমি জানতে এলাম। কোন জিনিসপত্র না নিয়ে উর্মি চলে এসেছে। আমরা সকলেই খুব লজ্জার মধ্যে আছি—

অজয় বলে, শনিবারে বৌভাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা তো আপনাদের নেমন্তন্ন করতে যাবই—

সে তো পরের কথা। কাল সন্ধ্যেবেলা আমাদের ওখানে চল।

অজয় তাকায় উর্মিলার দিকে। দাদার সামনে অজয়ের সঙ্গে কথা বলতে উর্মিলার লজ্জা হয়। কিন্তু ও বাড়িতে যেতেও ইচ্ছে করে। কমলা দেখুন অজয়কে। উর্মিলা যে ভুল করেনি সে-কথাটা তিনি যতক্ষণ না বিশ্বাস করছেন ততক্ষণ তার শান্তি নেই।

অজয় জিজ্ঞেস করে, যাবে ?

উর্মিলা মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ।

বাণী আর শিবেন বেশিক্ষণ বসেনা। উর্মিলা এখানে নতুন। এ পরিবারের নিয়ম-কানুন এখনও কিছুই জানেনা। হয়তো লজ্জা পাবে—অস্বস্তি বোধ করবে। তাই ওরা অল্প পরেই উঠে যেতে চায়।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি অজয় ওদের চলে যেতে দেয়না। রুকি বুকিকে ডাকে। সুধাংশুমোহনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। তারপর ওপরে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে বসিয়ে খাবারের থালা সামনে ধরে।

ওরা চলে যাবার আগে এক ফাঁকে উর্মিলা ওদের কমলাকে জানাতে বলে যে তিনি যেন এতটুকু ভাবনা না করেন। সুধাংশু-মোহন রাগ করেন নি। ওরা এখানেই আছে—এখানেই থাকবে। এত জোর দিয়ে কথাটা দাদা আর বৌদিকে বুঝিয়ে না দিলেও হত। ওরা তো নিজের চোখে দেখে গেল সব।

পাথরের কুচি ছড়ানো রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে শিবেন আর বাণী গেটের কাছে এল। তারপর রাস্তার ওপারে গিয়ে দাঁড়াল বাসের অপেক্ষায়। উর্মিলা আর অজয় এসেছে গেট অবধি। রুকি বুকি ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। বাসটা তাড়াতাড়ি এসে গেলেই ভাল হয়। একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিলেই তো পারে শিবেন। ওরা বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে—দৃশ্যটা এ বাড়ি থেকে দেখতে একটুও ভাল লাগছে না উর্মিলার। অজয়কে নিয়ে সে সরে এল গেটের কাছ থেকে।

পরদিন সময় মতো অজয়ের সঙ্গে উর্মিলা এল যতীন দাস রোডের বাড়িতে। আজ এ বাড়ির হাওয়া একেবারেই অন্যরকম। সকলের মুখেই হাসি। কমলা আশীর্বাদ করলেন ওদের। কিছুই তাঁকে করতে দেয়া হয়নি বলে দুঃখ করলেন।

কিন্তু শুধু দুঃখ করেই চুপ করে থাকলেন না। উর্মিলার আঙুল আর হাতের মাপ নিয়ে বললেন, তাঁর সাধ্য মতো মেয়েকে যা দেবার সবই দেবেন। শাড়ি গয়না ফার্নিচার—মেয়েকে বিয়ের সময় লোকে যেমন দেয়, কমলাও দেবেন তেমনি। আর অজয়ের জন্যে আংটি ঘড়ি বোতাম ধুতি পাঞ্জাবি এসব তো আছেই।

না না, মাথা নিচু করে অজয় বলে, আপনার মত যখন প্রথমে নেয়া হয়নি তখন কেন আপনি এত হ্যাঙ্গাম করবেন!

মেয়ে-জামাইকে নিয়ে আমার বুঝি সাধ-আহ্লাদ করবার ইচ্ছে হয়না? কী যে বল বাবা—

খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। এখন উর্মিলা নিশ্চিন্ত। ওর বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেছে। অস্বাভাবিক ঘোরও কেটে গেছে। আবার নিজের কাছেই নিজে সহজ হয়ে উঠতে পারল সে।

একথা উর্মিলা জানত যে মিটমাট হয়ে গেলে হাজার অসুবিধার মধ্যেও কমলা কোন কার্পণ্য করবেন না। হয়তো নিজের জন্যে কোন সঞ্চয় না রেখে উজাড় করে দেবেন তাকে।

কিন্তু কি দরকার উর্মিলার জন্যে তাঁর এখন এত খরচ করবার। যদিও শূন্য হাতে সে এসে উঠেছে অজয়ের বাড়িতে আর হয়তো সেই কারণেই রুকি আর বুকি রীতিমতো অবাক হয়ে তাকিয়েছে

তার দিকে। তাহলেও কমলা যদি নিজের কথা না ভেবে প্রচুর খরচ করেন—উর্মিলা তা কিছুতেই চায় না।

প্রথমে খুব বেশি মন খারাপ হলেও এখন উর্মিলা ভাবে যে এত তাড়াতাড়ি মিটমাট না হলেই যেন ভাল হত। এ বাড়িতে বাস করে ও-বাড়ির কথা ভাবতেই লজ্জায় তার দেহ যেন কুঁকড়ে যায়। জন্ম থেকে যাদের সঙ্গে সে এত বড় হয়ে উঠেছে আজ তাদের স্নেহের চেয়ে তার দম্ভই প্রধান হয়ে ওঠে। অজয় যদি তাকে নিয়ে এদেশ ছেড়ে অনেক দূরে কোথাও চাকরি নিয়ে চলে যায় তাহলেই যেন সব চেয়ে ভাল হয়।

অজয় বলে, চল উর্মিলা কলকাতার বাইরে কিছুদিন ঘুরে আসি।

চল। কোথায় যাবে?

মুসুরি দিল্লী ওয়ালটেয়ার—যেখানে হয়।

উর্মিলা বলে, তাই চল। এত দেশ দেখবার ইচ্ছে আমার কিন্তু কোথাও ঘোরা হয়নি, একটু চুপ করে থেকে সে বলে, মার কাছে এত তাড়াতাড়ি না এলেই হত—

কেন?

আর কথা বলতে পারে না উর্মিলা। অজয়ের পাশে বসে একটা বিরাট দূরত্ব অনুভব করে। কমলার ওপর করুণা জাগে কিন্তু সব ব্যবধান ঘুচিয়ে অজয়কে তাঁর একেবারে কাছে টেনে নিয়ে যেতে পারে না। সে-বাড়ি ছেড়ে চলে এলেও দৈন্যের গন্ধ যেন লেগে আছে তার সারা শরীরে। পাছে সে-গন্ধ অজয় পায় সেই ভয়ে মুখে কথা আসে না।

॥ তিন ॥

প্রায় মাসখানেক পর আবার কলকাতায় ফিরে এল অজয় আর ঊর্মিলা। এখন ভরা শীত। সকালবেলায় কুয়াশা, রাত্তিরে হিম আর সারাদিন কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া।

শীতকালে গোটা পৃথিবীটাই নাকি ঝিমিয়ে থাকে। ফুলের গন্ধ নেই। পাখির ডাক তত বেশি শোনা যায় না। এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ যেন কোথা থেকে এসে প্রকৃতিকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলে।

এ বছর কিন্তু শীতের কলকাতা ঊর্মিলাকে মাতিয়ে দিল। সারা রাত ঝরে পড়া হিম অশ্রুজলের মতো নয়, ওর কাছে দেখা দিল মূল্যবান মুক্তোবিন্দুর মতো হয়ে। শহরের অলিতে-গলিতে ধোঁয়ার কুণ্ডলী তাকে যেন এক নিকটতম কল্পলোকের সন্ধান দিয়ে গেল। শীতের অদ্ভুত উত্তাপ ঊর্মিলা বোধহয় জীবনে প্রথমবার অনুভব করল। কঠিন অভিযোগের নয়, এ এক আশ্চর্য আনন্দের ঋতু। গরম কাপড় গায়ে রাখতে ঊর্মিলার অস্বস্তি লাগে।

বেশ লম্বা ছুটি নিয়েছিল অজয়। ওরা অনেক ঘুরে বেড়িয়েছে। দিল্লী আগ্রা লক্ষ্ণৌ আর বেনারসে ঘুরে ঘুরে যেন নতুন করে নিজে-দেরই চিনেছে। বিয়ের আগে মার সঙ্গে কখনও কলকাতার বাইরে যায়নি ঊর্মিলা। তাই চমকে গেছে। অবাক হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর হোটেলে বসে দ্বিগুণ ভাল লেগেছে অজয়কে। অবাক হয়ে নতুন করে ভেবেছে তার জীবনে অজয়ের আবির্ভাব যেন ভোরের সূর্যের মতো। শান্ত অথচ দিগন্ত-ছড়ানো আলোয় সব ব্যবধান ঘুচিয়ে সে তাকে নিল নিবিড় করে। পরিচিত মানুষের নাগাল পেরিয়ে

অপরিচিত পরিবেশে সে এল তার আরও কাছে। এর চেয়ে কাছে আসা যায় না। এর চেয়ে বেশি জানা যায় না।

ঊর্মিলা কলকাতায় ফিরে এল হঠাৎ পাওয়া এক উষ্ণ নতুন দীপ্তি নিয়ে। নিজের ঘরে—নিজের বাড়িতে—এই দেওয়ালে বাগানে ছাদে আর গাছের পাতায় টেনে আনতে চাইল বিরাট বিশ্বকে। নিজের মনের মধ্যে থেমে থেমে কাঁপা উত্তাপ দিয়ে রূপ ফিরিয়ে দিতে চাইল যত জুড়িয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা জিনিসের।

বাবা ?

কে ? খবরের কাগজ সরিয়ে সুধাংশুমোহন মাথা তোলেন, ও। হ্যাঁ, কি বলত ?

আপনার কফি দেব ?

তুমি কেন ? বেয়ারা নেই ? আর কথা বলেন না সুধাংশু-মোহন। কাগজ পড়ায় মন দেন। তবু সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ঊর্মিলা।

কি চাও ?

আর কিছু লাগবে না আপনার ?

বেয়ারাকে পাঠিয়ে দাও।

ঊর্মিলা বাগান পেরিয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে যায়। রুকি বেরিয়ে যাচ্ছে তখন।

ঊর্মিলার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বোধহয় বোঝবার চেষ্টা করে সুধাংশুমোহনের সঙ্গে এখন কি দরকার থাকতে পারে তার। ঊর্মিলা অল্প হেসে ভেতরে ঢোকে। একটু ভয়ও লাগে তার। সুধাংশুমোহন বিরক্ত হলেন কেন ?

শ্বশুরের স্নেহ পাবার আরও অনেক চেষ্টা ঊর্মিলা

করেছে। ঠাণ্ডা ঝিমোনো দুপুর যখন আস্তে আস্তে গড়িয়ে যায়— রুকি একটা ইংরেজি নভেল খুলে বসে থাকে একদিকে আর বুকি প্রসাধন শুরু করে তখন উর্মিলা নিজেই হাতের কাছে ছোট স্টোভটা টেনে নিয়ে চায়ের জল ফোটায়। তারপর ট্রে হাতে নিয়ে ওদের সকলের সামনে দাঁড়িয়ে অল্প অল্প হাসে।

রুকি বলে, এ কি, তুমি আনলে কেন?

আমিই করলাম।

বুকি বলে, তুমি বুঝি খুব বেশি চা খাও?

না। তোমরা তো খাও।

সুধাংশুমোহন বলেন, রেখে যাও।

নিজে একটা কাপ নিয়ে উর্মিলা রুকির পাশে বসে অল্প অল্প করে চা খায়। ওর সঙ্গে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে কিন্তু কোথায় একটা সঙ্কোচ থেকে যায়। কি কথা বলবে হঠাৎ ঠিক করতে পারে না। রুকি মাথা তুলে মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকায়। চায়ে চুমুক দেয়। কথা বলে না।

আজ কোথাও বেরুবে নাকি?

রুকি বলে, হ্যাঁ।

কোথায়?

রুকি বই বন্ধ করে কয়েক মিনিট উর্মিলাকে দেখে। প্রশ্নটা বোধহয় ভাল লাগে নি তার। সে ঘন ঘন চায়ে চুমুক দেয়। তারপর যেন দেয়ালের সঙ্গে কথা বলছে এমনভাবে বলে, বাবলু ঘোষ আসবে সন্ধ্যে বেলা। বাইরে খেতে-টেতে যাব বোধহয়—উর্মিলাকে সেখানে বসিয়ে রেখে রুকি উঠে যায়। এখন বোধহয় তার প্রসাধন করবার সময় হল।

বুকির সাজতে খুব বেশি সময় লাগে। সারাদিন ধরেই সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। শাড়ির রঙ নিয়ে দিদির সঙ্গে আলোচনা করে। চুল ঠিক করবার জন্যে প্রায়ই পার্ক স্ট্রীটের দোকানে যায়। আর মার্কেট থেকে নিজের জন্যে নানারকম জিনিস কিনে আনে। ওদের সঙ্গে ঊর্মিলার খুব কম দেখা হয়। বুকির সঙ্গে সব চেয়ে বেশি ভাব হল টুলু রায়ের।

বাবলু আর টুলু—ঊর্মিলা দুজনকেই চেনে। অজয়ের দুই বন্ধু—যারা ওদের বিয়েতে সাক্ষী ছিল। আর একজন সাক্ষীর নাম নীতু বোস। সে এ বাড়িতে আসে কম। সে এলে রুকি আর বুকি দুজনেই তার সঙ্গে বেড়াতে যায়। ফিরে আসে অনেক রাত্তিরে। অজয় আর ঊর্মিলা ঘুমিয়ে পড়বার পর। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে মোটরের শব্দ শুনে সে বুঝে নেয় ওরা ফিরেছে।

বাড়িতে রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার 'পাট থাকেই না। সকলেই বাইরে-বাইরে খায়। ঊর্মিলা একা-একা সারাদিন বাড়ি বসে থাকে বলে অজয় অফিস থেকে ফিরে ওকে নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। বিয়ের আগে যেমন বেড়াত তেমন।

একদিন ঊর্মিলা বলে, রোজ রোজ এমন করে ঘুরে বেড়াবার কি দরকার ?

বাঃ, এর মধ্যেই বুড়ো-বুড়ির মতো ঘরে বসে থাকতে চাও নাকি ?

না, ঠিক তা নয়। তবে সংসারের অনেক কাজ আছে তো।

থাক না। ওসব কাজ করবার জন্যে লোকও তো আছে।

ঊর্মিলা রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আচ্ছা, বাবা বোধহয় আমাকে খুব বেশি পছন্দ করেন না ?

কেন বল তো? কি হয়েছে?

লজ্জা পেয়ে উর্মিলা তাড়াতাড়ি বলে, না না, কিছু হয় নি। আমার মনে হয় ওঁকে না জানিয়ে বিয়ে হয়েছে বলে—

অজয় বাধা দিয়ে হেসে বলে, তুমি এখনও সেই পুরনো কথা ভুলতে পারলে না দেখছি। বাবা চিরকালই ওই রকম। মা মারা যাবার পর উনি কাকে কি বলেন আর কখন কি করেন ঠিক নেই।

হয়তো অজয়ের কথা মিথ্যে নয়। কিন্তু শুধু সুধাংশুমোহনের কাছ থেকে নয়, রুকি বুকির কাছ থেকেও উর্মিলা যতটা আশা করেছিল ততটা পায় নি। কি সে আশা করেছিল আর কি পায়নি সেকথা যদিও কাউকে বোঝাবার ক্ষমতা তার নেই। উর্মিলার সঙ্গে তাদের কথা বলবার ধরনটাই যেন বদলে গেছে। থিয়েটার করবার সময় তাকে নিয়ে তারা যত মাতামাতি করত এখন সে চোখের সামনে ঘুরে বেড়ালেও ওরা যেন দেখেও দেখে না।

না দেখুক। তা বলে অভিমান করে উর্মিলা দূরে সরে থাকবে না। শুধু অজয়কে নয়, এ বাড়ির বাকি মানুষগুলোকেও আস্তে আস্তে বুঝতে হবে। তাদের মেজাজ বুঝে কাছে এগিয়ে যেতে হবে। এখানে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে একেবারে অন্যরকম হয়ে উঠতে হবে। সকলের প্রিয় হয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে হবে। শুধুমাত্র নিজের সাধনায় সে যেমন করে এ বাড়িতে আসতে পেরেছে, ঠিক তেমন করেই এখানকার একজন হয়ে উঠতে হবে তাকে। রাতারাতি একটা কিছু আশা করলেই তো আর পাওয়া যায় না।

অজয়ের মা বেঁচে নেই বলেই একটা অগোছাল ভাব ছড়িয়ে আছে সংসারে। চাকরদের খুশি মতো কাজ হয়। রুকি বুকির লেখাপড়া নেই বটে, কিন্তু রান্নাঘরে গিয়ে নষ্ট করবার মতো সময়ও

তাদের নেই। তাদের চেহারা দেখে উর্মিলা ভাবে রান্নাঘরে এদের মানায়ও না।

কিন্তু অগোছাল ভাব থাকলেও উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে সারা বাড়িটা যেন প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে। অজয়ের ডাকাডাকি, রুকি বুকির চিৎকার আর অজস্র মানুষের আনাগোনা কাউকে কোন অভাবের কথা মনে রাখতে দেয় না। সব ছাড়িয়ে উর্মিলা দেখে যে একটা নিদারুণ অপচয়ের মধ্যে দিয়ে এখানকার সময় কাটে। কেউ কারুর কাছে কোন হিসেব চায় না। সারা রাত বারান্দার আলো জ্বলে। বাইরে খাওয়ার কথাটা হঠাৎ খেয়াল হয় এদের কারুর আর সেদিন বাড়ির রান্না নষ্ট হয়। তখন উর্মিলার খারাপ লাগে। প্রায়ই নানা ধরনের এমন প্রবল অপচয় সে সহ্য করতে পারে না।

আর থেকে থেকে হঠাৎ কমলার কথা তার মনে পড়ে যায়। তাঁর রক্ত-জল-করা পয়সায় সে মানুষ হয়ে উঠেছে। অনেক সময় তার ছোটখাট আব্দারে অর্থের অপচয় সে যে না করেছে তা নয় কিন্তু সেটা তার কচি বয়সের খেয়াল। এখন সে বাড়িতে তাঁর উপার্জনে দিন কাটালে সামান্য অপচয়ের কথা সে হয়তো ভাবতে পারত না।

তাই এ বাড়িতে বাস করে রুকি বুকি আর অজয়ের জীবনযাত্রার ধরনের সঙ্গে সমানে তাল মেলাবার চেষ্টা করলেও তার কাজে আজকাল যেন প্রাণের সায় থাকে না। শুধু একটা ভয় হয় —ফুরিয়ে যাচ্ছে—ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু কি যে ফুরিয়ে যাবে এই প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে সেই কথাটা সে হঠাৎ বুঝতে পারে না।

আলোর ঝলকে খুব ভোরবেলা উর্মিলার ঘুম ভেঙে যায়। আর একটু পরেই দরজায় টুকটুক শব্দ করবে বেয়ারা। খাটের পাশে

টেবিলটায় শুধু দু কাপ চা রেখে যাবে। তখন উর্মিলা আস্তে আস্তে অজয়ের ঘুম ভাঙাবে। অজয় উঠতে চাইবে না। ঘুম চোখে তার দিকে তাকিয়ে আবার পাশ ফিরে শোবে।

আজ বেয়ারা দরজায় ধাক্কা দেবার আগেই উর্মিলা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। বাথরুমে এসে মুখে-চোখে জল দেয়। কালো শালটা সাদা আলনা থেকে টেনে নিয়ে আস্তে দরজা খুলে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়। এত ভোরে ওদিকে যাওয়া তার এই প্রথম। অজয় জানতে পারলে হয়তো আজও যেতে দিত না।

আর একটি লোকও এখনও জাগে নি। ঘুমতে সকলের রাত হয় বলে সকালে উঠতেও দেরি হয়। খাবার টেবিলে এসে বসতে বসতে সেই আটটা সাড়ে-আটটা। গল্প করে খেতে খেতে সেই নটা সওয়া-নটা হয়ে যায়। আর অল্প পরেই অজয় বেরিয়ে যায় অফিসে। দুপুর বেলার খাওয়া সেরে নেয় বাইরে।

তারপর সারাদিন উর্মিলার কাটে এড়িয়ে-গড়িয়ে। রুকি বুকি যেদিন বাড়িতে থাকে সেদিন সকলে একসঙ্গে খেতে বসে। সুধাংশু-মোহনও থাকেন। রুকি বুকি কাটা কাটা কথা বলে উর্মিলার সঙ্গে। সুধাংশুমোহন অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে শুধু তার দিকে মাঝে মাঝে তাকান। কথা বলেন খুব কম। লৌকিকতার চাপে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে উর্মিলার। কোনরকমে খাওয়া সেরে পালাতে পারলে সে যেন বাঁচে।

সুধাংশুমোহন গম্ভীর স্বরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, তোমার বাবা কলকাতাতেই থাকেন?

না, দিল্লীতে, উর্মিলা এত আস্তে কথা বলে যে তার গলা সুধাংশুমোহন শুনতে পেয়েছেন কি-না বোঝা যায় না।

তোমার দিদিদের কোথায় বিয়ে হয়েছে ?

আমার আর বোন নেই। শুধু এক দাদা আছে।

সুধাংশুমোহন আর কিছু জিজ্ঞেস করেন না। শুকনো স্বরে শুধু বলেন, ও।

ভোরবেলা রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে এমন অনেক কথা উর্মিলার মনে পড়ে যায়। এত সকালে এদিকে আর কেউ আসেনা বলেই বেয়ারা বাবুর্চি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। উর্মিলার সামনে ছুটে এসে বলে, আজ একটু দেরি হয়ে গেছে। এখুনি চা নিয়ে যাচ্ছি—

না, দেরি হয় নি, রান্নাঘরে ঢুকে উর্মিলা বলে, দাও, আজ চা-টা আমিই নিয়ে যাই।

বেয়ারা আপত্তি জানায়, সে হয় না বৌদি। সাহেব রাগ করবে—

উর্মিলা হেসে বলে, তুমি দাওনা—শুধু দু কাপ চা একটা ছোট ট্রেতে নিয়ে সে আবার ফিরে যায় নিজের ঘরে। আর একটা বড় ট্রে হাতে নিয়ে বেয়ারাও যায় তার পেছনে পেছনে।

উর্মিলা তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কি ?

আজ্ঞে মতি।

ওর নামটা ইচ্ছে করেই উর্মিলা জেনে নেয়। 'বেয়ারা' বলে সব সময় ডাকতে তার ভাল লাগে না। যখন কোন দরকার হয় তাই সে চিৎকার করে কাউকে ডাকে না। তাদের কাছে এসে আস্তে আস্তে জানায় তার দরকার। আর তখনও রুকি বুকি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

ওদের এই বিস্ময়ের ভাবটা উর্মিলার একেবারেই ভাল লাগে না। কি ওরা খুঁজে পেতে চায় তার চেহারায় অতবার ? প্রথম

যেদিন অজয়ের সঙ্গে তাদের বাড়িতে গিয়েছিল সেদিন ওরা তো ওকে দেখে অবাক হয় নি। ঊর্মিলা ঠিক বুঝতে পারে না যে এ বাড়িতে আসবার পর কি এমন সাংঘাতিক পরিবর্তন হল তার চেহারায়।

অজয়ের ঘুম ভেঙেছে এখন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে বোধহয় ঊর্মিলাকেই খুঁজছে। তাকে চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে খাটের ওপর চমকে উঠে বসে অজয়। সব চাকর-বাকরের একসঙ্গে অসুখ করল কি-না বুঝতে পারে না। অসুখ করলেও এমন বোধহয় এখানে কখনও হয় না।

অজয় অবাক হয়ে বলে, এত সকালে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

রান্নাঘরে, ঊর্মিলা হেসে বলে, অমন অবাক হবার কিছু নেই। আজ হঠাৎ ইচ্ছে করল তোমার চা নিজে নিয়ে আসতে—

বেয়ারা কোথায় গেল ?

আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে—

একটু গম্ভীর হয়ে অজয় বলে, কি দরকার এত সকালে চাকর-বাকরদের মধ্যে রান্নাঘরে যাবার ? আর কখনও যেও না।

মুখে ছায়া নামে ঊর্মিলার। সে যেন একটা মস্ত বড় অন্যায় করে ফেলেছে। চায়ে আস্তে আস্তে চুমুক দেয়। কিন্তু চা বিস্বাদ লাগে। অর্থের ব্যাপারে হিসেব করে চলতে বাধ্য হলেও এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে তার মার বাড়িতে কোনদিন তাকে একটুও ভাবতে হয় নি। তাই অজয়ের গম্ভীর গলা শুনে তার চোখ ছল ছল করে ওঠে।

নিজের গলার রূঢ় স্বর শুনে একটু পরে বোধহয় অজয় নিজেই লজ্জা পায়, রুকি বুকি কখনও এত ভোরে রান্নাঘরে যায় না,

হালকা স্বরে সে বলে, তাই বারণ করলাম। বেয়ারা বাবুর্চি কি আবার ভেবে বসে—

তুমি খুশি হবে বলে আমি গিয়েছিলাম, ঊর্মিলা থেমে থেমে বলে, আর যাব না, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বলে, বাড়ির মেয়ে আর বৌএ একটু তফাৎ আছে বোধহয়। আমি মাঝে মাঝে না গেলে ওরাই তো বলতে পারে যে আমি শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি—সংসারের আর কোন খোঁজ রাখি না—

অজয় হাসে, তোমার কোন দোষ কখনও কেউ ধরবে না।

না ধরুক। কিন্তু আমাকে একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে তো, ঊর্মিলার যেন জেদ চেপে যায়, তুমি বেরিয়ে যাবার পর সারাদিন বাড়িতে বসে আমি কি নিয়ে থাকব বলতে পার ?

অজয় তখনও হাসে, কত জায়গায় বেড়াতে যেতে পার—

সারাক্ষণ বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াতে আমার ভাল লাগে না।

তাহলে লেখাপড়া করে সময় কাটাও।

কাপ নামিয়ে রেখে ঊর্মিলা বলে, পড়াশুনো করতে ইচ্ছে করে না।

অজয় ঊর্মিলার পিঠে হাত রেখে বলে, বেশ, তাহলে তোমার যা খুশি তাই করবে। আমি শুধু আমাদের বাড়ির নিয়মের কথাটাই তোমাকে জানালাম।

জানাবার দরকার ছিল না। ঊর্মিলা এখানে আসবার দু-এক-দিনের মধ্যেই সব কিছু বুঝে ফেলেছে। এত তাড়াতাড়ি সংসারের কথা নিয়ে অজয়ের সঙ্গে তর্ক করত না যদি রুকি বুকি তাকেও তাদের একজন বলে মনে করত। কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় কিছু না বললেও ঊর্মিলা বুঝতে পারে যে তারা তাকে শুধু বাইরের লোক

বলে মনে করে না—অজয়ের একেবারে অযোগ্য বলে মনে করে। তাকে নিয়ে অনেক সময় যে আড়ালে হাসাহাসি করা হয় সেকথাও তার বুঝতে দেরি হয় না।

লেখাপড়া করে না রুকি বুকি। কোনও কাজও করে না। ওদের কথা-বার্তা শুনে আর বিদেশী ভাষার ওপর দখল দেখে ঊর্মিলার ধারণা হয়েছিল ওরা বুঝি অনেক দূর অবধি লেখাপড়া করেছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। কলেজে মাত্র বছরখানেক পড়েছে ওরা।

ওরা বিয়ে করবে না।

নির্বিকার স্বরে অজয় বলে, কে জানে!

তুমি চেষ্টা করবে না?

অজয় বলে, ওরাই দেখেশুনে নেবে এখন। অন্য কেউ পছন্দ করে দিলে ওরা মানবে না।

এখনও কাউকে পছন্দ করেনি?

তেমন স্বরেই অজয় বলে, কে জানে।

এখন থাক। ঊর্মিলা নিজেই আস্তে আস্তে সব জানবে কাউকে কিছু না জিজ্ঞেস করে। অকারণ কৌতূহলের পরিচয় দেবার দরকার নেই। তার মনে যা-ই হোক না কেন সেকথা অন্যকে জানাবার কোন অর্থ হয় না। বিস্ময় প্রকাশ করা নয়, বিস্ময় গোপন করাই তো বুদ্ধিমতীর কাজ।

কিন্তু রুকি বুকি তাকে যতই দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করুক আর সুধাংশুমোহন নীরস লৌকিকতা করে অবহেলা প্রকাশ করুন এ বাড়িতে বাস করবার অহঙ্কার আরও প্রবল হয়ে ওঠে ঊর্মিলার মনে। আর নানা কৌশলে সেকথাটা জানাবার জন্যে সে মাঝে

মাঝে মার কাছে চলে যায়। তাকে দেখে শিবেন আর বাণী হাসি-মুখে কাছে এসে বসে।

কমলা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ঊর্মিলার মুখের দিকে। তারপর তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলেন, তুই কী সুন্দর দেখতে হয়েছিস ঊর্মি!

বাণী রসিকতা করে, হবে না? কত বড় লোকের বউ! তোমার বাড়িতে যখন-তখন যেতে তো আমাদের ভয় লাগে!

শিবেন জিজ্ঞেস করে, অজয় এল না যে?

অফিসে কি মিটিং আছে আজ। ফিরতে দেরি হবে।

ঊর্মিলাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখেও যেন কমলার সাধ মেটেনা। তাঁর মেয়ের চেহারা সত্যি ফিরে গেছে। এখানে এই রূপ যেন অভাব অনটনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বাইরে-বাইরে ঘুরতে হয় বলে তিনি নিজে তাকে ভাল করে যত্ন করতে পারেননি। এখন তাঁর আর কোন দায় নেই।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কমলা মেয়ের কাছ থেকে তার শ্বশুরবাড়ির খবর নেন। ঊর্মিলা সারাদিন কি করে। ঠিক মতো শ্বশুরের যত্ন করে কি-না। রুকি বুকি তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে। অজয়ের কথা তিনি কিছুই জিজ্ঞেস করেন না কারণ মেয়ের চেহারা দেখেই বুঝতে পারেন স্বামীকে নিয়ে তার এতটুকু অভিযোগ নেই।

ঊর্মিলা কমলাকে উত্তরে অনেক কথা বলে যায়। হঠাৎ থামতে চায় না। তার শাশুড়ি নেই বলে সংসারের সব ভার তার ওপর পড়েছে। সে একদিন বাড়িতে না থাকলে সংসার অচল হয়ে যাবে। তাকে না জিজ্ঞেস করে কেউ কোন কাজ করে না। শ্বশুর কথায়

কথায় ডাকাডাকি করেন। ঊর্মিলা সামনে বসে না থাকলে তাঁর খাওয়া হয় না।

আর শুধু কি তাই? ননদদের আব্দারের জন্যে মাঝে মাঝে ঊর্মিলার মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হয়। তাদের সঙ্গে সব জায়গায় তাকে যেতে হয়। সময়ে-অসময়ে ওরা গান গাইবার জন্যে জোর করে কিম্বা বলে বসে, থিয়েটারের সেই নাচটা আমাদের ভাল করে দেখাও।

কমলা বিচলিত হয়ে বলেন, ভাবনার কথা রে ঊর্মি। এইটুকু মেয়ে তুই। অত বড় সংসারের ভার নিলে তোর খুব কষ্ট হবে—

মাকে বাধা দিয়ে ঊর্মিলা হেসে বলে, কষ্ট আবার কি মা? অনেক চাকর-বাকর। আমাকে নিজের হাতে কিছুই তো করতে হয়না। শুধু একটু দেখাশোনা করা যেন সব কাজ ঠিক মতো হয়—

কিন্তু এখানে ওসব কাজ তুই তো কখনও করিসনি। তাই আমার ভাবনা হয় যদি ও বাড়ির কেউ তোর ওপর অসন্তুষ্ট হন—

বেশ জোরে হাসে ঊর্মিলা, বেশ, যদি তোমার তাই মনে হয় তাহলে ও বাড়ির কাউকে না-হয় জিজ্ঞেস করে দেখ। তুমি ভাব আমি বুঝি কিছুই করতে পারিনা—

পারবি না কেন ঊর্মি, মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে কমলা বলেন, একেবারে অভ্যেস নেই কি-না তাই বলছিলাম—

বাণীর দিকে তাকিয়ে ঊর্মিলা মিটিমিটি হাসে। বোধহয় মনে মনে তাকে নিজের সঙ্গে তুলনা করে একটু কৃপাই করে। কিন্তু এখানে বসে থাকতে থাকতে একটা অন্তরঙ্গতার স্বাদ পায় ঊর্মিলা। আর সকলের চেয়ে নিজে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে।

যদিও কিছুক্ষণ পর এই ঘরে বসে তার শীত লাগে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। যেন একটা থেমে থাকা পরিবেশ। আনন্দ নেই। কোলাহল নেই। যৌবন নেই। সকলে যেন তপস্বীর মতো কিসের প্রতীক্ষা করে আছে সারাদিন। এই প্রতীক্ষা ঊর্মিলার ভাল লাগে না। বাড়ি ফেরবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

একসময় কমলা বলেন, দিবানাথ তোর কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে ঊর্মি।

সহজ স্বরে ঊর্মিলা বলে, তাই নাকি? উনি কেমন আছেন?

খুব ভাল। আহা, সোনার চাঁদ ছেলে দিবানাথ। একটা থিসিস লিখে খুব নাম করেছে। শীগগিরই ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হয়ে যাবে—

কমলার কথার মাঝে ঊর্মিলা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আজ যাই মা। আমার বেশ শীত লাগছে। এদিকটায় একটু বেশি ঠাণ্ডা না?

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দিবানাথ এসে দাঁড়ায় সেখানে। গায়ে সাদা একটা সাধারণ শাল। হাসি-হাসি মুখ। শরীরটা একটু ভাল হয়েছে। আজ তাকে দেখে ঊর্মিলার রাগ হয় না। চেনা লোককে দেখতে পেয়ে মুখে হাসি ফুটে ওঠে। দিবানাথও হাসে তাকে দেখে।

ছি ছি ঊর্মি, এমন করে আমাকে অপমান করবে ভাবতেই পারিনি।

ঊর্মিলা আজ ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করে, কি আবার করলাম?

এত বড় একটা ব্যাপার, দিবানাথ এগিয়ে এসে বলে, নেমন্তন্নের বেলায় আমাকেই বাদ দিলে। আরে আমি তো এ বাড়িরই একজন?

ও, ঊর্মিলা হেসে ওঠে, নেমন্তন্ন খাবেন? হবে এখন।

আর কবে হবে ?

আপনিও তো খুব নাম করেছেন। আমাদের খাওয়াবেন না ?

ও নামের কি দাম ? যাকগে, কেমন আছ বল ?

এই আর কি, ঊর্মিলা কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসে। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে।

বাড়ি ফেরবার সময় ঊর্মিলার মনটা ভারী হয়ে যায়। শুধু শুধু মার কাছে ভান করতে হল। উপায় কি। নিজের মান বাঁচাবার জন্যে অতগুলো মিথ্যে কথা না বললে চলত না। কমলা দুঃখ পেতেন। আরও নানা প্রশ্ন করে তাকে বিব্রত করে তুলতেন। ঊর্মিলা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিছুতেই সে যেন সহজ হয়ে উঠতে পারে না। নিজের পাওনা নিয়ে এত চুলচেরা বিচার করে চলতে সে চায় না। যতদূর সম্ভব সহজ হয়ে ছোট মেয়ের মতো ছুটোছুটি করতে চায়। কিন্তু ছেলে বয়স থেকে এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে সে নিজেও যেন অদ্ভুত হয়ে উঠেছে।

এবার থেকে আর কোনদিকে না তাকিয়ে রুকি বুকিকে সে আগাগোড়া অনুকরণ করবার চেষ্টা করবে। ওদের মতো করে প্রসাধন করবে। অজয়ের সঙ্গে বেবিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরবে। শ্বশুর কিম্বা ননদ—তার সাহায্য যখন কেউ চায় না তখন ঊর্মিলারই বা দরকার কি তাদের নিয়ে মাথা ঘামাবার। তাদের সুখ-সুবিধার কথা না ভেবে সে শুধু নিজের কথাই ভাববে। কারুর কোন ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করবে না। আর ছুটিতে অত বড় বাড়িতে একা এক কোণে বসে না থেকে অজয়কে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে কলকাতার বাইরে। তাহলেই

সব ঠিক হয়ে যাবে। স্বার্থপর না হলে আজকাল কারুর কাছ থেকে কোন মূল্য পাওয়া যায় না। কিন্তু নিজের স্বার্থ নিয়ে সচেতন হয়ে উঠতে পারলে ওই রুকি বুকিই হয়তো তার মন পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

বসবার ঘরে অনেক লোক। অজয়ও ফিরে এসেছে। ওপরে ওঠবার সময় উর্মিলা বসবার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল। রুকি বুকি এখনও বাড়িতে আছে। রোজকার মতো বাবলু ঘোষ আর টুলু রায় এসেছে। অজয় উর্মিলাকে দেখে ওর নাম ধরে জোরে ডাকল।

ঘরে ঢুকতেই বাবলু চিৎকার করে উঠল, এই যে আসুন। কী আশ্চর্য, এখনও আপনাদের হানিমুন শেষ হলনা—

এক মুখ সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে টুলু বলল, অনেক সময় দিয়েছি। অজয়কে আজ ধরেছি। আপনাকেও ছাড়া হবে না।

কিছু বুঝতে না পেরে একটা চেয়ারে বসে উর্মিলা বলল, কি হল?

না না, হয়নি কিছুই। এই একটা বিরাট কিছু করবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

কি?

প্রায় এক সঙ্গেই রুকি আর বুকি কথা বলে উঠল, রান্নার ভারটা তুমি নিলে আজই নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা দিন ঠিক করে ফেলতে পারি?

মানে একটা পিকনিক করতে হবে। প্রত্যেক বছরেই করা হয়, সিগ্রেটের ছাই ঝেড়ে অজয় বলল, ইচ্ছে করলে তুমিও যাকে

খুশি বলতে পার। তোমার দাদা বৌদি কিম্বা আর কোন বন্ধু-বান্ধব—

এই রবিবারেই, রুকি একটা শ্লিপ দাও তো?

আঃ, মেনু নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। ওসব আমরাই সেরে নেব। বৌদি, বেয়ারা-বাবুর্চি নিয়ে কোন মজা হয় না। মোটা-মুটি রান্নার একটা ব্যবস্থা তুমি করে দিতে পার সেদিন?

উৎসাহী হয়ে ঊর্মিলা বলল, নিশ্চয়ই।

আমরাও তোমাকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করব—

আহা, পিকনিকে খাওয়াটা বড কথা নয়, মজাটাই আসল।

সেই সন্ধ্যায় একটা কাগজে অনেকের নাম লেখা হল। প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করে চাঁদা দিতে হবে। আর এখানে আসতে হবে রবিবার সকাল সাতটায়। এখান থেকেই সকলে একসঙ্গে বার হব।

এতদিন পর রুকি বুকির কাছ থেকে একটা কাজের ভার পেয়ে ঊর্মিলার অতৃপ্তি ঘুচে গেল। কিন্তু সে তার বন্ধু-বান্ধব কাউকেই সেদিন আসতে বলবে না—দাদা বৌদিকে তো নয়ই। কবে বাজারে যাওয়া হবে, কি কি রান্না হবে সেকথা ঠিক হয়ে গেল সেদিন সন্ধ্যে-বেলায়। কাল থেকেই ঊর্মিলাকে মোটামুটি ব্যবস্থা আরম্ভ করতে হবে।

একজন কেউ না এলে হয় না তাই এদের সঙ্গে এসেছে মতি বেয়ারা। আর এসেছে গোটা পাঁচেক মোটরগাড়ি। বাবলু, টুলু, নীতু ছাড়া অজয়ের অফিসের অবাঙালী বন্ধু এসেছে কয়েকজন। রুকি বুকির জানা আরও দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবও আছে।

টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে আরও অনেকটা দূরে একটা খুব বড় বাগান-বাড়ি। ফাঁকা জায়গা অনেক। নানা রঙের বিলিতি ফুল ফুটেছে।

অর্কিডের একটা আলাদা ঘর রয়েছে। মতি বেয়ারাকে সঙ্গে না আনলেও ক্ষতি ছিল না। বেয়ারা-বাবুর্চি এখানেও রয়েছে। বাগানটা খুব বড় আর খুব সুন্দর। অজয়ের অফিসেব এক মাড়োয়ারী কর্তার বাগানবাড়ি এটা। অজয় নিজেই তার সঙ্গে কথা বলে আজ এখানে সারাদিন কাটাবার ব্যবস্থা করেছে। তাকেও নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। কথা দিতে পারেনি। বলেছে আসবার চেষ্টা করবে। হয়তো বিকেলের দিকে এসে পড়তে পারে।

এদিকে ঠাণ্ডা বেশি। কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। কিন্তু রোদও উপচে পড়ছে। আর একটু পরে বাগানে বেড়ালে বোধহয় গরম লাগবে। ঘুরে বেড়াবার যদিও খুব বেশি সময় নেই ঊর্মিলার। দু-একজনের ব্যাপার নয়, সকলকে নিয়ে প্রায় ষোল-সতেরো জন। বেলাও এখন কম হয় নি। প্রায় দশটা বাজে।

বাড়ি থেকে ওদের বেরুবার কথা ছিল সকাল সাতটায়। কিন্তু বেরুতে বেরুতে নটা বেজে গেল। বাজার করে রাখা হয়েছিল কাল বিকেলে। দায়িত্ববোধ হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে ঊর্মিলার। অজয়কে সরিয়ে দিয়ে মতি বেয়ারার সঙ্গে সে নিজেই দরকার মতো সব জিনিস নিয়ে এসেছে। এখন মনের মতো করে দায় চুকিয়ে দিতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত।

পারবেন ? নীতু বোস এক মুঠো ছাড়ানো কড়াইশুঁটি মুখে পুরে দিয়ে বলে, নাকি আমরাও বসে যাব হাত গুটিয়ে ?

নীতু এটা তোমার জায়গা নয়, রুকি ছুটতে ছুটতে এসে গায়ের জোরে তার একটা হাত ধরে টানে, ওঠ এখান থেকে।

নীতু রুকির গালে আস্তে হাত বুলিয়ে হেসে বলে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? বাবলু কই ?

অর্কিড-পাগল লোক। ওই নিয়েই মেতে আছে—

তুমি চলে এলে যে?

এক ফোঁটাও রোদ নেই ও ঘরে—

বেশ করেছ। তাহলে চল তুমি আর আমি রোদ্দুরে একটু ঘুরে আসি। যাবে?

সিওর, রান্নাঘর থেকে নীতুর হাত ধরে রুকি বেরিয়ে যায়।

কাউকে না হলেও উর্মিলার চলবে। কিন্তু রান্নাঘরে এখন অনেক লোক। এ বাড়ির বেয়ারা-বাবুর্চি মালী আর মতি। ওরাই উনুন ধরিয়ে দিয়েছে। মশলা বেটেছে। দুটো উনুনে পোলাউ মাংস চাপানো হয়ে গেছে। মাছ ভাজা, মাছের তরকারী পরে হবে। আর যারা মাছ মাংস খায় না, তাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা আছে।

উর্মিলা আস্তে আস্তে এসে বাইরে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে অজয়কে খোঁজে। অনেক দূরে বেড়াতে বেড়াতে অফিসের অবাঙালী বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে অজয়। উর্মিলাকে দেখতে পেয়ে এদিকে এগিয়ে আসে।

কতদূর হল উর্মি? অজয় কাছে এসে বলে, দাঁড়াও বাড়িটা আগে ভাল করে দেখে নি তারপর আমরাও এসে কাজে লাগছি।

কোন দরকার নেই, দরজায় ভর দিয়ে দাঁড়ায় উর্মিলা, আমি একাই পারব। তোমরা যা করছ তাই কর—

তোমার কি দরকার রান্নাঘরে মুখ গুঁজে বসে থাকবার? ওই তো ওরাই সব পারবে। বেরিয়ে এস। চল, আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে?

না না, উর্মিলা ঘরের ভেতরে চলে এসে বলে, যাও এখান থেকে। আমাকে কাজের সময় বিরক্ত কর না।

উর্মিলার কাজের বহর দেখে হাসে অজয়। অবাঙালী বন্ধুকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয় ইংরেজীতে। কথা শুনে সে হাসে না। গম্ভীর হয়ে বলে, এটা খুবই অন্যায়। সকলে ফূর্তি করবে আর উনি খেটে মরবেন—তা কিছুতেই হতে পারে না।

অজয়ের এই বন্ধুর নাম রামস্বামী। তাকে আরও তু-একবার বাড়িতে দেখেছে উর্মিলা। অজয় তার সঙ্গে বৌ-ভাতের দিনই আলাপ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে বাঙলা জানে না বলে তাকে কৌশলে এড়িয়ে গেছে উর্মিলা। পাছে অন্য ভাষায় কি বলতে কি বলে ফেলে—তাই সঙ্কোচে মুখে কথা আসে না তার।

অজয় বলে, শুনছ রামস্বামী কি বলছে ?

হ্যাঁ।

বাঃ, ওকে কিছু বলবে না ?

উর্মিলা ভেবে ভেবে ইংরেজীতে বলে, আমি একাই পারব।

রামস্বামী আরও কি বলতে যায় কিন্তু অজয় হঠাৎ তাকে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয় না, দূরে একটা দোলনা খাটানো হয়েছে দেখে ওকে তাড়াতাড়ি সেদিকে টেনে নিয়ে যায়।

ওরা চলে যাবার পর উর্মিলার নিজেকে একেবারে অসহায় মনে হয় প্রথম কয়েক মিনিট। সে কোন কাজে মন দিতে পারে না। লজ্জায় এদের সকলকে ফেলে এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে চায়।

ব্যাপারটা একেবারেই তুচ্ছ। কিন্তু অজয়ের এই হঠাৎ চলে যাওয়ার অন্য আর একটা অর্থ উর্মিলার কাছে প্রকট হয়ে ওঠে। রামস্বামীর মতো আরও অনেক অবাঙালী বন্ধু আছে তার। তারা যখন আসে তখন সে যেন ইচ্ছে করেই উর্মিলাকে এড়িয়ে যায়। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা তলিয়ে সে বুঝতে পারে নি।

আজকাল বোধহয় বুঝতে পারে। রুকি বুকিকে যতই দেখে ততই অজয়ের তাকে এড়িয়ে যাওয়ার কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অন্য ভাষায় অনর্গল কথা বলবার অভ্যাস নেই উর্মিলার। রুকি বুকি যেমন পারে সে তেমন পারে না। কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়। পড়াশুনোয় উর্মিলা তো রীতিমতো ভাল ছিল। বিয়ের আগে যখন নিজেকে পূর্ণ বিকশিত করবার উদ্যমে সে জীবন পণ করেছিল তখন যদি কথাটা খেয়ালে আসত তাহলে আজ তার নিজেকে কিছুতেই এমন দীন অসহায়ের মতো মনে হত না। সন্ধ্যার কোন ক্লাসে ভর্তি হয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারত।

কিন্তু উর্মিলা বুঝতে পারে তার মান বাঁচাবার জন্যেই অজয় অবাঙালী বন্ধু-বান্ধবদের কৌশলে সরিয়ে নিয়ে যায়। অথচ তাকে কিছু বলে না। কেন? অজয় নিজেই তো তাকে সব শিখিয়ে দিলে পারে। এমন করে তাকে দূরে সরিয়ে রাখবার মানে কি? একটা প্রবল অভিমান তার বুক ঠেলে ওঠে। আর আজকের আনন্দের সবটুকু রঙ একেবারেই যেন মুছে যায়।

টুলু রায়কে নিয়ে বুকি এসে দাঁড়াল সেখানে। একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। দুজনেই হাসছে। যেন উর্মিলা একটা দেখবার জিনিস। তাকে দেখেই ওরা হাসছে কি-না কে জানে। দোলনাটা এখন উর্মিলাও দেখতে পাচ্ছে। জোরে দোল খাচ্ছে নীতু আর রুকি। ওদের হাসির আওয়াজ এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে। বুকির সঙ্গে উর্মিলা কোন কথা বলে না। পিছন ফিরে নিজের কাজে মন দেয়।

উর্মিলার গায়ে একটা হাত রেখে টুলু জিজ্ঞেস করে, খুব দেরি হবে বোধহয়? বলুন, আমরা কি করতে পারি?

টুলুর হাতটা আস্তে সরিয়ে দিয়ে মুখ নামিয়ে উর্মিলা বলে, না, বেশি দেরি হবে না। একটু অপেক্ষা করুন, গরম মাছ ভাজা দিচ্ছি এখুনি।

রুকি বুকি বলেছিল উর্মিলাকে সাহায্য করবে। কিন্তু কারুর কিছু করবার দরকার নেই। বেয়ারা-বাবুর্চিরাই সব করছে। উর্মিলাও বিশেষ কিছুই করেনি।

মতিকে দিয়ে পোলাউএর ডেকচি নামিয়ে উনুনে কড়া বসিয়ে দিল সে। গরম গরম মাছ ভাজা পাঠাতে হবে এখন সকলকে। যারা মাছ মাংস খায় না তাদের জন্যে আলু ভাজা কপি ভাজা আছে।

বুকির আরও কাছে সরে এসে টুলু বলে, ক্যালকাটা সিমস্ টু বি ভেরি ডাল। চল বুকি এবার কিছুদিনের জন্যে বাইরে কোথাও ঘুরে আসি?

ও নো, হেসে যেন গড়িয়ে পড়ে বুকি, আই অ্যাম আফ্রেড অব ইউ। কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে!

এখানে যারা আছে উর্মিলা আর চাকর-বাকর তাদের কাউকে গ্রাহ্য না করে টুলু শক্ত করে বুকিকে বুকে চেপে ধরে বলে, রিয়েলি?

আঃ, কি হচ্ছে? নিজেকে মুক্ত করে বুকি বলে, কলকাতার বাইরে যাবার কথা পরে না-হয় ঠিক হবে। এখন চল তো একটু মোটরে ঘুরে আসি। খাওয়া-দাওয়ার তো অনেক দেরি আছে।

তাই চল।

উর্মিলাকে কিছু না বলেই ওরা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। এদিকে তখন মাছ ভাজা হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু বলা দূরের কথা, বেয়ারা-বাবুর্চির সামনে উর্মিলা মাথা তুলে আর তাদের দিকে

তাকাতে পারে না। তাই মাছ-ভাজা পড়ে থাকে যেমনকার তেমন।

উর্মিলার অবস্থার কথা বোধহয় মতি বেয়ারা বুঝতে পারে। হঠাৎ কিছু বলতে সাহস করে না কিন্তু মুখ টিপে হাসে। কি ভেবে উর্মিলা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না ওদের মাঝখানে। মাছ-ভাজার ট্রে হাতে নিয়ে নিজে বেরিয়ে পড়ে আর মতিকে বলে আলু কপি ভাজার প্লেট নিয়ে তার সঙ্গে আসতে।

রোদের তেজ প্রখর হয়েছে। হাওয়ার জোর নেই। চলতে চলতে একটু গরম লাগে উর্মিলার। একটা বড় সতরঞ্চি পেতে অজয় তার বাঙালী অবাঙালী বন্ধুদের সঙ্গে গোল হয়ে বসেছে। কার মজার গল্প শুনে সকলে হো হো করে হাসছে।

একটু ইতস্তত করে উর্মিলা এসে দাঁড়াল ওদের কাছে। মাছের ট্রে নামিয়ে রাখল সতরঞ্চির ওপর। মতির হাত থেকে ট্রে নিয়ে রাখল রামস্বামীর সামনে। নীতু আর রুকিকে হাতের ইসারায় ডাকল। আর মতিকে পাঠিয়ে দিল বাবলুকে খবর দিতে। এবার চায়ের ব্যবস্থা করতে উর্মিলা ফিরে যাচ্ছিল রান্নাঘরে কিন্তু সকলের সামনে তার হাত টেনে বাধা দিল নীতু বোস।

আপনি আর ওদিকে নয়। রুকি, এবার তুমি যাও, আই অ্যাম ডাইং ফর এ ড্রপ অব টি—

হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যাচ্ছি।

উর্মিলার হাত টেনেই নীতু তাকে বসিয়ে দিল সতরঞ্চির ওপর, থিয়েটারের পর আপনার গান আমরা একদিনও শুনিনি, তাকে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই সে চিৎকার বলল, এবার উনি গান গাইবেন —সব চুপ।

নীতু বোস হঠাৎ অসঙ্কোচে হাত ধরায় উর্মিলা বিরক্ত হয়েছিল কিন্তু গানের কথা বলায় আর এক আনন্দের স্বাদ পেল সে। বিরক্তির রেখা মুখ থেকে মিলিয়ে গেল। বস্তুত, সে যে গান গায় আর তার গলার প্রশংসা বহুবার বহু লোক করেছে—এ বাড়িতে আসবার পর সে-কথাটা সে যেন ভুলেই গিয়েছিল। রুকি বুকি তাকে কখনও গান গাইতে বলেনি। আর উর্মিলা যে গান গায় তা অজয়ের মনে আছে কি-না, বিয়ের পর সেকথাও উর্মিলা ঠিক বুঝতে পারেনি। অনেক সময় গান গাইবার তীব্র ইচ্ছে হলেও উর্মিলা অভিমানের প্রবল চাপে তা দমন করেছে। ভুল করেও কোনদিন সে যেন এ বাড়িতে গান না গায়।

আবার চিৎকার করে উঠল নীতু বোস, কই কি হল?

বাবলু বলল, ধরুন।

অজয়ও কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই উর্মিলা বলল, এখন অনেক কাজ। আর একসময় গাইব—

কি অনেক কাজ? আমরা সব করে দেব। এবার শুধু আপনার গান গাইবার পালা। আর কোন কাজ করতে হবে না।

বাবলু বলল, যদিও এখানে কোনরকম বাজনা-টাজনা নেই, কিন্তু তাতে কিছু যাবে আসবে না—বাতাস আপনার সুরের সঙ্গে তাল রাখবে।

উর্মিলা আপত্তি জানিয়ে বলল, আজ থাক।

আঃ, এরা বলছে অত করে। গাও না একটা—অজয়ের চোখ যেন বিরক্তিতে সামান্য কুঁচকে যায়। উর্মিলা একবার তাকিয়ে দেখে তার দিকে।

মোটর গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। বুকি ফিরে এসেছে টুলু

রায়ের সঙ্গে। শিথিল শাড়ী। চুল উস্কোখুস্কো। খুব বেশি দূরে যায়নি বোধহয়। রুকিও এদিকে আসছে চায়ের ট্রে নিয়ে। উর্মিলা মাথা তুলে প্রত্যেকের দিকে একবার তাকিয়ে নিল। সকলে অপেক্ষা করছে তার গান শোনবার জন্যে। এখন না গাইলেই চলবে না। টুলু আর বুকি এসে বসল ওদের মধ্যে। বাবলুর পাশে বসল রুকি। আর একবার ওদের কাছ থেকে মধুর অনুরোধ আশা করেছিল উর্মিলা। কিন্তু কথা বলে না কেউ। বেশিক্ষণ নীরব থাকলে অজয় হয়তো আরও বিরক্ত হবে। তাই অনেকদিন পর তার প্রিয় একটা গান সে গাইতে আরম্ভ করল।

বাবলুর দিকে তাকিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছে রুকি। হাতে মাথা রেখে গড়িয়ে পড়েছে বুকি। আর অন্য সকলে তাকিয়ে আছে উর্মিলার মুখের দিকে। একমনে গানই শুনছে বোধহয়। উর্মিলার দৃষ্টি স্থির। সতরঞ্চির ওপর থেকে চোখ তোলে না সে।

আস্তে আস্তে রোদ চলে যাচ্ছে এখান থেকে। দূর থেকে ছায়া সরে-সরে আসছে। অনেকক্ষণ ধরে একটা পাখি ডাকছে গাছের ডালে। মাথার ওপর আকাশ একেবারে সাদা। অনেক ওপর দিয়ে একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে। হাওয়া হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। হালকা রোদে বসে থাকলেও শরীর কেঁপে ওঠে মাঝে মাঝে। গান শেষ করে মাথা তোলে উর্মিলা।

বাঃ, নীতু বোস নড়ে-চড়ে বসে।

রামস্বামী বলে, ওয়াণ্ডারফুল!

টুলু উর্মিলার কাছে সরে এসে বলে, এবার একটা নাচ হোক।

না না, মাথা নেড়ে দৃঢ়স্বরে প্রবল আপত্তি জানায় উর্মিলা।

অদ্ভুত ধরনে হেসে রুকি বলে, অত জোরে গাও কেন? আজকাল এসব গান কেউ এত চেঁচিয়ে গায় না।

বুকি বলে, অনেকদিন বুঝি গান গাওনি?

না, সেখানে বসে থাকতে উর্মিলার আর ইচ্ছে করে না। খুব হয়েছে। এদের সামনে সে জীবনে আর কোনদিন গান গাইবে না। এখন আবার রান্না ঘরে পালিয়ে যেতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়।

অজয় অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ দেখে মনে হয় সে যেন উর্মিলার গান শুনতে পায়নি। এর মধ্যে রোদ সরে গেছে এখান থেকে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপুনি লাগে। কি ছুতো করে উঠে যাবে উর্মিলা চুপ করে সেকথা ভাবে। কিন্তু ওরা সকলেই হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়।

অজয় বলে, চল, সতরঞ্চিটা ওদিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যাক।

হ্যাঁ, এখানে শীত লাগছে।

সকলে জিনিসপত্র সরিয়ে রোদ্দুরে সতরঞ্চি টেনে নিয়ে যায়। বেয়ারা আসে খালি কাপ প্লেট নিয়ে যেতে। আর তারই সঙ্গে উর্মিলাও আস্তে আস্তে ফিরে আসে রান্না ঘরে। তখন আর কিছু যদিও বাকি নেই। রান্না শেষ করে ফেলেছে এরা।

এ ঘরে ঠাণ্ডা একেবারেই নেই। আগুন জ্বলছে গমগম করে। রোদ আসছে বারান্দার কোল ঘেঁষে। মোড়ায় কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে উর্মিলা। এদের সকলের কাছ থেকে নিজেকে হঠাৎ লুকিয়ে ফেলতে চায় এমন কোন অন্ধকার ঘরে যেখান থেকে সহজে কেউ তাকে খুঁজে বের করে আনতে পারবে না। এই গভীর শীতে তাজা এলোমেলো রোদ তাকে যেন এক আশ্চর্য যন্ত্রণা দিতে থাকে।

কোন কারণ নেই। হয়তো কিছুই ঘটেনি। তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে মনে মনে এত দুঃখ পাওয়ারও কোন মানে হয়না। কিন্তু কাছে এসেও এখনও ওদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারলনা— এটাই উর্মিলার সব চেয়ে বড় দুঃখ।

এমনি করেই যদি ওরা দূরে দূরে রাখবে তাহলে এত কাণ্ড করে এদের মধ্যে এসে পড়ে কি লাভ হল তার। প্রথমে ওদের তার সম্পর্কে যে আগ্রহ ছিল সেটা কি শুধু একটা ছল ?

নিজের বুকে প্রবল অভিমান নিয়ে এই আনন্দের মাঝে উর্মিলা বসে আছে একধারে। ওদের সকলকেই এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। রুকি হাসাহাসি করছে নীতুর সঙ্গে। বুকির কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে টুলু রায়। আর অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে অজয় ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে। উর্মিলার দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছে কিন্তু হাসছে না। ওদের মধ্যে আছে, ওদের সঙ্গেই এসেছে এখানে—সে-ও তো এখন ওদেরই একজন কিন্তু এক আশ্চর্য নির্জনতা কেন গলা টিপে রাখছে তার।

এ যন্ত্রণা আরও সাংঘাতিক। আরও ভয়ঙ্কর। বিয়ের আগে জিতেন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করে উর্মিলার যে যন্ত্রণা ছিল তাতে তার কোন হাত ছিল না। আর সে ক্ষেত্রে তার আক্রোশের একটা বিশেষ পাত্রও ছিল। কিন্তু এখন? নিজেকে দংশন করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই উর্মিলার। আর সে যখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওরা তাকে দূরে রাখতে চায় তখন কাঙালের মতো কাছে যাবারও খুব উৎসাহ নেই তার।

তবে সে যাবে কোথায়? পৃথিবীতে বোধহয় একটি লোকও নেই যার কাছে মন খুলে উর্মিলা নিজের এই শোচনীয় পরাজয়ের

কথা বলতে পারে। ভাবতে ভাবতে নিজেকে হঠাৎ ধিকার দেয় সে। ওদের অনুকরণ করবার ইচ্ছেও মিলিয়ে যায়। স্পষ্ট কোন কিছুর কল্পনা এই মুহূর্তে করতে পারে না বটে, কিন্তু এক অলৌকিক প্রভাবে একান্ত করে নিজের এক আলাদা জগৎ কামনা করে। সেখানে আর কেউ থাকবে না। আর কেউ কখনও আসবে না। কোন প্রশ্নের উত্তর তাকে দিতে হবে না। এমন এক জগৎ যেখানে নিজেকে সে আবার নতুন করে আবিষ্কার করবে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের দীপ্ত ছটায়। সব লোভ অহঙ্কার আর নির্মম ভানের পরিধি পার হয়ে শান্ত প্রকৃতির সহজ পরিবেশে সে নিশ্বাস নেবে গভীর শান্তিতে। কিন্তু তা যে একেবারেই অসম্ভব, সেকথা ভেবেই সে দিশা হারায়।

কি এত ভাবছ ?

কখন অজয় এসে পাশে দাঁড়িয়েছে ঊর্মিলা বুঝতে পারে নি। চমকে উঠে সে বলে, কিছু না।

শরীর খারাপ লাগছে নাকি ?

না না।

তাহলে এখানে চুপচাপ বসে আছ যে ?

নির্বিকার ভাবে ঊর্মিলা উত্তর দেয়, এমনি।

দু-এক মিনিট কোন কথা না বলে অজয় তাকিয়ে থাকে ঊর্মিলার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে বল না ?

হবে আবার কি ? ঊর্মিলা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বললাম তো কিছু হয় নি।

রান্না হয়ে গেছে ?

হ্যাঁ।

তবে চল ওদিকে।

না। এখানেই আমি ভাল আছি।

জোরে জোরে সিগ্রেটে টান দেয় অজয়, ওরা কি ভাববে? তুমি কি এক কোণায় গম্ভীর হয়ে বসে থাকবার জন্যে এসেছ?

কি জানি।

ঊর্মিলার উত্তর শুনে একটা কঠিন কথা হয়তো বলতে যাচ্ছিল অজয়, কিন্তু তার আগেই নীতু বোস এসে হাজির সেখানে। অবাক হয়ে সে তাকায় ওদের দুজনের মুখের দিকে। অজয় তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ায়। ঊর্মিলা হাসবার চেষ্টা করে। নীতু বোস অজয়ের দেহটা জোরে ঝাঁকিয়ে দেয়।

ক্ষিদে পেয়ে গেছে তাই জানতে এসেছিলাম রান্নার কত দেরি।

কি জানলে?

সব হয়ে গেছে।

ঊর্মিলা বলে, বলেন তো এখুনি সকলকে খাইয়ে দিতে পারি।

বেশ বেশ। দাঁড়ান ওদের একবার জিজ্ঞেস করে আসি।

নীতু চলে যেতেই অজয় বলে, একটু হাসবার চেষ্টা কর। সব সময় আবোল-তাবোল চিন্তা নিয়ে মুখ ভার করে থাকলে আর সকলের সামনে আমাকে লজ্জায় পড়তে হয় সেকথা বোঝনা কেন?

আস্তে ঊর্মিলা বলে, বুঝি। দেখলে না নীতু বোসের সামনে কেমন সুন্দর অভিনয় করলাম?

হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অভিনয়?

সেকথা আর এক সময় তোমাকে বুঝিয়ে দেব। ওই দেখ ওরা আসছে। তুমি যাও এখন এখান থেকে। আমি খাবারের ব্যবস্থা করি।

কথা বলতে পারে। ভাবতে ভাবতে নিজেকে হঠাৎ ধিক্কার দেয় সে। ওদের অনুকরণ করবার ইচ্ছেও মিলিয়ে যায়। স্পষ্ট কোন কিছুর কল্পনা এই মুহূর্তে করতে পারে না বটে, কিন্তু এক অলৌকিক প্রভাবে একান্ত করে নিজের এক আলাদা জগৎ কামনা করে। সেখানে আর কেউ থাকবে না। আর কেউ কখনও আসবে না। কোন প্রশ্নের উত্তর তাকে দিতে হবে না। এমন এক জগৎ যেখানে নিজেকে সে আবার নতুন করে আবিষ্কার করবে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের দীপ্ত ছটায়। সব লোভ অহঙ্কার আর নির্মম ভানের পরিধি পার হয়ে শান্ত প্রকৃতির সহজ পরিবেশে সে নিশ্বাস নেবে গভীর শান্তিতে। কিন্তু তা যে একেবারেই অসম্ভব, সেকথা ভেবেই সে দিশা হারায়।

কি এত ভাবছ ?

কখন অজয় এসে পাশে দাঁড়িয়েছে উর্মিলা বুঝতে পারে নি। চমকে উঠে সে বলে, কিছু না।

শরীর খারাপ লাগছে নাকি ?

না না।

তাহলে এখানে চুপচাপ বসে আছ যে ?

নির্বিকার ভাবে উর্মিলা উত্তর দেয়, এমনি।

তু-এক মিনিট কোন কথা না বলে অজয় তাকিয়ে থাকে উর্মিলার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে বল না ?

হবে আবার কি ? উর্মিলা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বললাম তো কিছু হয় নি।

রান্না হয়ে গেছে ?

হ্যাঁ।

তবে চল ওদিকে।

না। এখানেই আমি ভাল আছি।

জোরে জোরে সিগ্রেটে টান দেয় অজয়, ওরা কি ভাববে? তুমি কি এক কোণায় গম্ভীর হয়ে বসে থাকবার জন্যে এসেছ?

কি জানি।

উর্মিলার উত্তর শুনে একটা কঠিন কথা হয়তো বলতে যাচ্ছিল অজয়, কিন্তু তার আগেই নীতু বোস এসে হাজির সেখানে। অবাক হয়ে সে তাকায় ওদের দুজনের মুখের দিকে। অজয় তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ায়। উর্মিলা হাসবার চেষ্টা করে। নীতু বোস অজয়ের দেহটা জোরে ঝাঁকিয়ে দেয়।

ক্ষিদে পেয়ে গেছে তাই জানতে এসেছিলাম রান্নার কত দেরি।

কি জানলে?

সব হয়ে গেছে।

উর্মিলা বলে, বলেন তো এখুনি সকলকে খাইয়ে দিতে পারি।

বেশ বেশ। দাঁড়ান ওদের একবার জিজ্ঞেস করে আসি।

নীতু চলে যেতেই অজয় বলে, একটু হাসবার চেষ্টা কর। সব সময় আবোল-তাবোল চিন্তা নিয়ে মুখ ভার করে থাকলে আর সকলের সামনে আমাকে লজ্জায় পড়তে হয় সেকথা বোঝনা কেন?

আস্তে উর্মিলা বলে, বুঝি। দেখলে না নীতু বোসের সামনে কেমন সুন্দর অভিনয় করলাম?

হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অভিনয়?

সেকথা আর এক সময় তোমাকে বুঝিয়ে দেব। ওই দেখ ওরা আসছে। তুমি যাও এখন এখান থেকে। আমি খাবারের ব্যবস্থা করি।

অকারণেই অজয়ের মেজাজটা একটু উষ্ণ হয়ে ওঠে। সে চড়া সুরেই হঠাৎ বলে ফেলে, তাই কর।

ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। এখন ভারী শীত। নানা রকম গরম কাপড় পরা থাকলেও ঠাণ্ডা বাতাস হাড় কাঁপিয়ে যায়। বাড়ি ছেড়ে এতক্ষণ বাইরে থাকলে ক্লান্ত লাগে উর্মিলার। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। আর কারুর শরীরে কিন্তু সামান্য ক্লান্তির চিহ্ন নেই। ওরা ঠিক করছে এখান থেকে সোজা কোন ছবি দেখতে যাবে কি-না। কোন কথা বলতে পারে না উর্মিলা কিন্তু এখন এদের সঙ্গে আর কোথাও তার যেতে ইচ্ছে করে না, সোজা বাড়ি ফিরে যেতে চায়।

জিনিসপত্র ধুয়ে মুছে একটা গাড়িতে তুলেছে মতি বেয়ারা। উর্মিলা তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাকে সাহায্য করেছে। জিনিসপত্র নিয়ে সে একাই বাড়ি ফিরে আসতে চেয়েছিল কিন্তু অজয় আপত্তি করে। তারপর তার গাড়িতেই উর্মিলাকে তুলে নেয়। আরও কয়েকজন থাকে তাদের সঙ্গে।

সুধাংশুমোহনের ঘরে আলো জ্বলছে। কোন গাড়ি নিচে দাঁড়িয়ে নেই। আজ বোধহয় কেউ আসেননি তাঁর কাছে। ভালই হয়েছে। পিকনিকের পোলাউ-মাংস একটা আলাদা টিফিন ক্যারি-য়ারে উর্মিলা নিয়ে এসেছে সুধাংশুমোহনের জন্যে। একটু পরে গরম করে সে নিজেই নিয়ে যাবে তাঁর সামনে।

বাড়ি ফিরে উর্মিলা নিজের ঘরে চলে এল। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে তার। নীতু বাবলু আর টুলুকে নিয়ে অজয় বসবার ঘরে বসেছে। মতি বেয়ারা ঠিক সময় চা করে দেবে তাদের। রুকি

বুকি হয়তো আবার বেরুবে কোথাও। যা খুশি করুক, ঊর্মিলা ওদের নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না এই মুহূর্তে।

একটু পরে সে আসে রান্নাঘরে। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে রোজকার মতন। হয়তো সবই নষ্ট হবে। অবেলায় অত খেয়ে আজ আর কেউ বেশি কিছু খেতে পারবে বলে মনে হয় না। ঊর্মিলার কথা মতো সুধাংশুমোহনের জন্যে বাবুর্চি পোলাউ-মাংস গরম করে দিল।

মতি বেয়ারা হেসে বলল, এখন কিছুই খাবেন না সাহেব।

ছুপুরে খেয়েছেন ?

বাবুর্চি মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

খান না খান, ঊর্মিলা হেসে বলে, সামনে তো নিয়ে যাই, দেখি কি বলেন। আমরা খেয়ে এলাম বাইরে থেকে—তাই ওঁর জন্যেও আলাদা করে নিয়ে এসেছি—

আজ আর মতি বেয়ারাকে ঊর্মিলা সঙ্গে নেয়না। নিজেই একটা প্লেটে পোলাউ আর মাংস নিয়ে এসে দাঁড়ায় সুধাংশুমোহনের ঘরের সামনে। হঠাৎ ভেতরে ঢুকতে ইতস্তত করে। শ্বশুরের মেজাজের হদিস পায় না।

গুনগুন করে গান গাইছেন সুধাংশুমোহন। বোধহয় খবরও রাখেন না যে ছেলেমেয়েরা ফিরে এসেছে। এমন আশ্চর্য নির্বিকার মানুষ ঊর্মিলা আর কখনও দেখে নি। সংসারে আছেন কিন্তু কোন ব্যাপারেই নেই। কাউকে কিছু বলেন না। কারুর কোন কাজে কখনও বাধা দেন না। নিজের ঘরে আপনমনে কি নিয়ে থাকেন সারাদিন—ঊর্মিলা বুঝতে পারে না। কয়েক মিনিট বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে পর্দা সরিয়ে সে ঘরে ঢুকে পড়ে।

এই যে। এসেছ? এস—সুধাংশুমোহন দুই হাত বাড়িয়ে উর্মিলাকে কাছে ডাকেন। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না। টলে পড়েন চেয়ারে।

তাঁর দিকে ভাল করে তাকিয়ে এক মুহূর্তে উর্মিলা সব ব্যাপারটা বুঝে নেয়। সুধাংশুমোহন এখন সুস্থ অবস্থায় নেই। তাঁর হাতের কাছের ছোট টেবিলে একটা গ্লাস আর একটা বোতল। অন্য আর একটা টেবিলে সোডার কয়েকটা বোতলও দেখতে পায় সে।

এ দৃশ্য দেখে বিচলিত হওয়া তার স্বভাব নয়, কিন্তু সুধাংশু-মোহনের চেহারা দেখে সে ভয় পায়। অসংলগ্ন কথা-বার্তা, অস্বাভাবিক দৃষ্টি। তিনি আবার উঠে উর্মিলাকে ধরে পাশের একটা চেয়ারে বসিয়ে দিতে চান।

সে থেমে থেমে কোন রকমে বলে, আমরা পিকনিকে গিয়ে-ছিলাম সেখান থেকে এই পোলাউ-মাংস এনেছি আপনার জন্যে—

বেশ করেছ, সুধাংশুমোহন হাত বাড়িয়ে প্লেটটা টেনে একেবারে নিজের মুখের কাছে নিয়ে আসেন, তুমি খাবে না?

আমরা তো খেয়ে এসেছি।

আবার খাও। কাম, লেট আস্ শেয়ার—

উর্মিলা অস্বস্তি বোধ করে, এটা আপনার জন্যেই এনেছি।

তাতে কি হয়েছে? সুধাংশুমোহনের গলার স্বর বেশ চড়া, আমার জন্যে এনেছ বলে তুমি খাবে না—তা কি হয়—

ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকায় উর্মিলা। এখানে বসে থাকতে সাহস পায় না। হঠাৎ উঠে যেতেও ইতস্তত করে। এ সময় এ ঘরে অন্য কেউ এসে পড়লেই সব চেয়ে ভাল হত। কড়া গন্ধে তার নাক জ্বলে। শ্বশুরের মুখের দিকেও তাকাতে ইচ্ছে করে না।

আমি যাই, আপনার জন্যে জল নিয়ে আসি—

না, গলার স্বর অস্বাভাবিক রকম ভারী সুধাংশুমোহনের, কে চায় জল? আমি জল খাই না। তুমি বস এখানে—এস—আরও সরে এস—

এখান থেকে কোন রকমে পালিয়ে যাবার জন্যে উর্মিলা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভয়ে বুক কাঁপে। মার কথা মনে পড়ে যায়। কাছাকাছি একটা লোকও নেই। চেয়ারে শক্ত হয়ে ঠায় সে বসে থাকে। কি ছল করে এখান থেকে উঠে যাবে প্রাণপণে তাই ভাবে। সুধাংশু-মোহন কোনদিকে না তাকিয়ে একমনে খাওয়া শুরু করেন। তখন উর্মিলা উঠে আস্তে আস্তে দরজার কাছে যায়।

সুধাংশুমোহন চিৎকার করে ওঠেন, কোথায় যাচ্ছ?

উর্মিলা চমকে উঠে ফিরে দাঁড়ায়, আমি এখনি আসছি—

সিলি গার্ল, টলতে টলতে সুধাংশুমোহন উঠে দাঁড়ান, কথা শোননা কেন? তোমাকে না বললাম আমার পাশে বসে থাকতে? এই—তিনি এগিয়ে আসেন উর্মিলার দিকে। হঠাৎ রেগে গেছেন। কি করবেন বলা যায় না।

কিন্তু তিনি তার কাছে আসবার আগেই রুকি ছুটতে ছুটতে আসে সেখানে। সুধাংশুমোহন বেশ জোরেই চিৎকার করেছিলেন। রুকি বোধহয় তাঁর গলা শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসেছে।

বাবা কি হয়েছে? সুধাংশুমোহনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে রুকি জিজ্ঞেস করে, আবার চেঁচামেচি আরম্ভ করলে কেন?

রুকিকে দেখে শান্ত হয়ে যান সুধাংশুমোহন। একটু ভয়ও পান যেন। মাথা নামিয়ে বলেন, ছাট সিলি গার্ল আমার কোন কথা শোনে না—

উঠছে না। পাষাণভার মাথায় নিয়ে জুড়িয়ে যাচ্ছে—ফুরিয়ে যাচ্ছে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। উর্মিলা চমকে ওঠে। অজয় তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে আসে। হয়তো রুকির কাছ থেকে সব কথা শুনে আবার ধমকের সুরে কথা বলতে আসছে তার সঙ্গে। উর্মিলা সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। ঠিক এই মুহূর্তে অজয় তাকে না দেখতে পেলেই যেন সব চেয়ে ভাল হয়। সে আগে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিক।

এই ঠাণ্ডায় ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ? অজয় যেন জেরা করে, ওদিকে আমরা হাঁ করে বসে আছি—

উর্মিলা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, কেন?

ওরা সকলে এখনও বসে আছে। তুমি হঠাৎ উঠে কোথায় উধাও হয়ে গেলে তাই জিজ্ঞেস করছি।

উর্মিলা অজয়ের কথার কোন উত্তর দিতে পারে না। তার দিকে তাকিয়ে থাকতেও পারে না। ওর ঠোঁট দুটো শুধু কাঁপে। আর ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলকে ভীষণ শীত লাগে। রাস্তায় একটার পর একটা মোটর গাড়ি যায়। মাঝে মাঝে হর্ন বাজে। অজয় যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেকথাটাও খেয়াল থাকে না উর্মিলার।

তোমার কি হয়েছে?

কিছু না তো।

তাহলে চেহারা এ রকম দেখাচ্ছে কেন?

শরীরটা ভাল নেই।

তাই বুঝি শরীর ভাল করবার জন্যে ইচ্ছে করে এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছ?

বল কি করব ?

বাইরের লোকের সঙ্গে যে কথা বলতে হয় সে ভদ্রতাজ্ঞানটুকুও কি তোমার নেই ?

চল, আমি যাচ্ছি—

না, তোমাকে এমন চেহারা করে যেতে হবেনা, একটু থামে অজয়, আমরা রাত্তিরের শোতে সিনেমায় যাচ্ছি, তোমার শরীর খারাপ, যেতে অসুবিধা হবে বোধহয় ?

ঊর্মিলা রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ।

আমি জানতাম, অজয় যেমন করে এসেছিল ঠিক তেমন করেই গট গট করে সিঁড়ি দিয়ে আবার নিচে নেমে যায়। কিন্তু চোখ ফিরিয়ে তাকে দেখে না ঊর্মিলা, রাস্তার দিকে তাকিয়েই শুধু তার জুতোর কঠিন শব্দ শোনে। আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক তেমনি করেই।

কারুর কোন অপরাধ নেই। ঊর্মিলা কোন অন্যায় করেনি। অজয়ও অমানুষ বলে নিজেকে প্রমাণ করেনি কারুর কাছে। কিন্তু তবু ঝিম ঝিম করা শীতের অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে ঊর্মিলার মনে হয় একটা সাংঘাতিক রকম অন্যায় ঘটে গেছে কোথাও। তা না হলে এমন করে হঠাৎ তার জীবনে একটা ওলোট-পালট হবে কেন। আনন্দময় ভরা সংসারে কেন এই ভয়াবহ নির্জনতা তাকে তিল তিল করে গ্রাস করে নিতে চাইবে।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ঊর্মিলার ভাল লাগছে না। ঘরে যেতেও ইচ্ছে করছে না। কি করবে সে ? রুকি বুকির গলা শোনা যাচ্ছে। অজয়ও হেসে উঠল একবার। ঊর্মিলা তাকিয়ে দেখল না। কিন্তু মোটরের আওয়াজ শুনতে পেল। ওরা বেরিয়ে

গেল ছবি দেখতে। ক্লান্ত ঊর্মিলা। এই মুহূর্তে কোথাও বেরুবার ক্ষমতা নেই। শুধু একবার ছুটে যেতে চাইছে কমলার কাছে। দাদা-বৌদির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আর দিবানাথ বোধহয় রোজকার মতো আজও এসেছে ও বাড়িতে। তাদের সকলের মাঝে যেতে পারলে যেন ঊর্মিলার এই অস্বাভাবিক ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

সুধাংশুমোহনের ঘরের আলো নিবিয়ে দিল মতি বেয়ারা। বাইরে বেরিয়ে তাকাল ঊর্মিলার দিকে। আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এল তার। সুধাংশুমোহন আপন মনেই হাসছেন মাঝে মাঝে। কার নাম ধরে চিৎকার করে উঠছেন। এখন বাড়িতে আর কেউ নেই। মতিকে দেখেও ভয় লাগে ঊর্মিলার।

খাবেন না?

না।

একটু কিছু খান, মতি মাথা চুলকোয়, সব খাবার ফেলা যাবে যে।

ফিরে এসে ওরা খাবে না?

মতি হেসে বলে, কখনও না। অনেক রাত হবে ফিরতে। ওঁরা বাইরে থেকেই খেয়ে ফিরবেন।

তোমরা খেয়ে নাও, আমি আজ কিছুই খাব না।

ঠাণ্ডা লাগবে দিদি, একটু ইতস্তত করে মতি বলে, ঘরে গিয়ে বসুন আমি এক কাপ কফি করে দিই।

না, কিছু দরকার নেই, সুধাংশুমোহনের ঘরের দিকে তাকিয়ে ঊর্মিলা বলে, তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

মতি সরে যায় না। শূন্য চোখে ঊর্মিলার দিকে তাকিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। ঊর্মিলা কিন্তু তাকাতে পারে না তার দিকে।

সে যেন ধরা পড়ে গেছে। অনাদরে আর অবহেলায় তার এক-পাশে পড়ে থাকার কথাটা মতি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। তাই এসেছে তাকে সমবেদনা জানাতে। ঊর্মিলা মনে মনে জ্বলে ওঠে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে নিজের ঘরে চলে যায়। যদি মতি তার জন্যে কফি নিয়ে আসে তাহলে মাটিতে আছড়ে কাপ চুরমার করে ফেলবে সে।

মতি এল যথাসময়। কফির কাপও রাখল খাটের পাশে ছোট টেবিলটায়। ঊর্মিলাকে বিনীত অনুরোধ জানাল ওটা খেয়ে নিতে। আগে থেকে ভেবে রাখলেও ঊর্মিলা কাপ ভেঙে ফেলতে পারল না। নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারল না মতির সামনে। গায়ে একটা চাদর টেনে আস্তে আস্তে হাতে তুলে নিল কফির কাপ।

আর কি খাবেন ?

সহজ হবার চেষ্টা করে ঊর্মিলা বলল, আমার একেবারে ক্ষিদে নেই মতি। আমি আর কিছু এখন খেতে পারব না। তুমি যাও।

কফি খান। আমার তো এখন কোন কাজ নেই। আপনার খাওয়া হলে কাপ নিয়ে যাব একেবারে।

মতির দিকে তাকিয়ে ঊর্মিলা অবাক হয়ে যায়। চোখ দুটো করুণ। ভারী গলার স্বর। কিছু একটা বোধহয় তাকে বলতে চায় কিন্তু সাহস পায় না। ইতস্তত করে। কান পেতে সুধাংশু-মোহনের চিৎকার শোনে। কয়েক মিনিটের জন্যে বাইরে যায়। আবার ঘুরে আসে।

তোমার কিছু দরকার আছে ?

যদি অপরাধ না নেন—

বল।

কড়া হবেন দিদি, ভয়ে-ভয়ে বাইরে তাকায় মতি বেয়ারা, তাহলে সংসারটা বাঁচবে—

উর্মিলা চমকে উঠে বলে, কি হয়েছে মতি ?

সব যেতে বসেছে—সব শেষ হয়ে যাবে। এমন করে তো আর বেশিদিন চলবে না, একটু চুপ করে থাকে মতি, মায়ের আমল থেকে আছি কি-না তাই এত কথা বলতে সাহস পাই—সংসারের সব ভার নিজের হাতে নিন এবার—

উর্মিলা আর একবার জিজ্ঞেস করে, কিন্তু কি হয়েছে তা তো বললে না ?

নিজের চোখে তো সবই দেখতে পাচ্ছেন। মা একদিন কেঁদে আমাকে বলেছিলেন, মতি আমি না থাকলে খোকাবাবুর বউ এলে তাকে তুই আমার নাম করে বলিস সে যেন শক্ত হয়—তাকে এদের মতো হতে দিস না—

একেবারে স্পষ্ট করে কিছু না বললেও উর্মিলা বুঝতে পারে মতি তাকে কি বলতে চায়। শাশুড়ী নেই কিন্তু সে যেন তাঁর গলার স্বর শুনতে পায়। সব যে ফুরিয়ে যেতে বসেছে তার একটা অস্পষ্ট আভাস উর্মিলা আগেই পেয়েছিল। আজ মতিও প্রথম তাকে সব কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে তাই সে থামতে চায় না। অনর্গল কথা বলে যায়। উর্মিলা বাধা দেয় না। চুপ করে তার কথা শোনে। আর মনে মনে ভাবে যাদের জন্যে এই অশিক্ষিত লোকটার এত দরদ তারা বোধহয় কোনদিনও তার এই সমবেদনার কথা জানতে পারবে না। কারণ মতির সাহস হবে না তাদের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে এমন করে এত কথা বলবার।

রুকি বুকির মুখের ওপর কথা বলবার কেউ নেই তাই তারা

খুশি মতো চলে। আজ যে বন্ধুর সঙ্গে ভাব, কাল তার সঙ্গে ঝগড়া। অজয়ও থাকে নিজের খেয়ালে। যত টাকা পায়, খরচ করে তার চেয়ে অনেক বেশি। বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে প্রায়ই ধার করতে হয় বলে তর্কাতর্কিও হয় তাদের সঙ্গে। সাহেবের একটা অফিস ছিল কিন্তু একবার ভয়ঙ্কর একটা গোলমাল হয়। তারপর অনেকদিন সাহেব বাইরে ছিলেন। তখন রোজই পুলিশ এসে বসে থাকত বাড়িতে। মায়ের অনেক গয়না বিক্রী করে সেবার সাহেব বেঁচে যান। তা না হলে নাকি অনেক বছরের জেল হত সাহেবের। সেই থেকে আর অফিস থেকে তিনি টাকা পান না। এখন জমানো টাকা ভাঙতে হয় মাসে মাসে।

চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ে মতির। থেমে থেমে আরও অনেক কথা বলে। মা মরেননি। তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। আগে সাহেব অনেক রাত করে বাড়ি ফিরতেন। একা নয়, এক বিলিতি মেমসাহেব থাকত সঙ্গে। মার ঘুম হত না রাত্তিরে। তিনি কাঁদতেন। দারুণ শীতেও বাগানে গিয়ে বসে থাকতেন সারারাত। তখন মতি গিয়ে তাঁর হাতে-পায়ে ধরে ঘরে নিয়ে আসত।

কথা বলতে বলতে মতির চেহারা একেবারে অন্যরকম দেখায়। যেন ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে তার শরীরে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মেঝের ওপর বসে পড়ে। কাপ থেকে তখনও ধোঁয়া উড়ছে। কিন্তু কফি খাওয়ার কথা আর খেয়াল থাকে না উর্মিলার। মতির কথা শুনতে শুনতে কাপটা এক সময় যেন নিজের অজ্ঞাতেই নামিয়ে রাখে।

একদিন তেমনি করেই সেই বিলিতি মেমসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে

বাড়ি ফিরলেন সাহেব। শীতকাল। সেদিন আজকের চেয়ে অনেক বেশি শীত ছিল। রাতও গভীর। মতি ছাড়া এ বাড়ির আর কেউ বোধ হয় জেগে ছিলনা তখন। সাহেব এসে চিৎকার করে দারোয়ানকে ডাকলেন। টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। মতি শুধু প্রচণ্ড জোরে দরজা বন্ধ করবার শব্দ শুনতে পেয়েছিল। ব্যস, আর কোন শব্দ নেই।

সকালবেলা খাবার টেবিলে সকলেই এল কিন্তু মায়ের দেখা নেই। তিনি সকলের চেয়ে আগে ওঠেন, টেবিল সাজাতে মতিকে সাহায্য করেন। হয়তো অসুখ করেছে। কিম্বা মেমসাহেব যতক্ষণ না চলে যান ততক্ষণ দরজা খুলবেন না। মতি একবার গিয়ে দেখে এসেছে তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ।

বেলা বাড়ল। মেমসাহেব চলে গেলেন। সাহেবেরও অফিসে যাবার সময় হল। মা তখনও ঘরের দরজা খুললেন না। সাহেব ভয়ে-ভয়ে মতিকে বললেন দরজায় ধাক্কা দিতে। কিন্তু সাড়া নেই। আরও পরে মিস্তিরি ডাকিয়ে দরজা ভেঙে ফেলা হল। মুখ থুবড়ে মেঝের ওপর মা পড়ে আছেন। মরবার আগে বোধহয় ফেনা উঠেছিল মুখ দিয়ে। আশে-পাশে তারই দাগ। মা মরলেন আত্ম-হত্যা করে।

আজও তাঁর শোকে মতি কাঁদে। তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলতে গেলে বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে। তিনি যতদিন ছিলেন তত-দিন এ বাড়ি আজকের মতো এমন বিশৃঙ্খল ছিল না। সাহেব যা-ই করুন না কেন, মাকে ভয় করতেন। তাঁর মুখের ওপর কথা বলতে সাহস করতেন না। এখন কথা বলতে বলতে মতির মনে পড়ছে যে মারা যাবার দিন সকালবেলা তিনি সাহেবকে বলেছিলেন, ওই মেম-

সাহেব যদি আর কোনদিন এখানে আসে তাহলে চিরকালের জন্যে তিনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।

মনের জোর ছিল তাঁর। তাই কথা রাখলেন। মতির দুঃখ এই যে উর্মিলা তাঁকে দেখতে পেল না। তার দৃঢ়বিশ্বাস উর্মিলাকে তিনি সব চেয়ে বেশি ভালবাসতেন। সে এখানে আসবার পর মতিও তাঁর সঙ্গে মায়ের অনেক মিল খুঁজে পেয়েছে। এখন উর্মিলা শক্ত হলেই সব দিক রক্ষা পায়। আর আবার সংসারে শৃঙ্খলা ফিরে এলে মতিও শান্তিতে মরতে পারবে।

উর্মিলা একটাও কথা বলে না মতিকে। সমস্ত বাড়িটা হঠাৎ যেন নির্জীব হয়ে পড়েছে। দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে কাঁপছে শোক। দম্ভের আবরণ নিপুণ ভাঁজের মধ্যে গোপন করে রেখেছে ভয়ঙ্কর শূন্যতা। মতি হয়তো বুঝতে পারে না যে সে আজ উর্মিলার সামনে এই সংসারের আর এক রুক্ষ রূপ তুলে ধরেছে।

বিষণ্ণ বিবর্ণ হয়ে ওঠে উর্মিলার মুখ। তার চোখের সামনে কার কঠিন হাতের ছোঁয়ায় এই বিরাট পাকা বাড়িটা যেন দুলতে থাকে। আড়াল থেকে এক দৃষ্টিতে তার দিকে যেন শাশুড়ী তাকিয়ে আছেন। সে ভয় পায় না। আস্তে মতিকে সরে যেতে বলে। কোনরকমে উঠে আলোটা নিভিয়ে দেয়। এই অন্ধকার তাকে সকলের কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্যে লুকিয়ে রাখুক। এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না। কিন্তু অজয়ের অপেক্ষায় জেগে থাকতেও ইচ্ছে নেই। যখন খুশি সে আসুক।

এত কথা ভিড় করে আসছে যে মনের মধ্যে সব ধরে রাখতে বিকট যন্ত্রণা অনুভব করছে উর্মিলা। ধিক্কারের একটা এলোমেলো

ভয়ঙ্কর ঢেউ কেবলই দুরন্ত নিশ্বাস ছাড়ছে। কাকে মন খুলে সব কথা সে বলতে পারে? কাউকেই নয়।

আর যা-ই সে করুক, কাউকে কখনও বলতে পারবে না যে সে ঠকে গেছে। উগ্র লোভের ঝাঁজে শুধু বাইরের রূপ নিয়েই সে সব কিছু ভুলে গিয়েছিল। জীবনকে তলিয়ে দেখবার মতো বুদ্ধি শিক্ষা সমবেদনা—কোনটাই তার ছিল না।

ঠিক আজ এই মুহূর্ত থেকে নয়, কয়েকদিন থেকে প্রায়ই তার নতুন করে জিতেন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। বাপের ওপর যে ক্রোধ আর ঘৃণা এতদিন ঊর্মিলার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—আজ তার সে মনোভাব তাকে যেন থেকে থেকে ব্যঙ্গ করে। নিজের ছেলে-মানুষীর কথা ভেবে নিজেকেই ক্ষমা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে তার পক্ষে।

সে শীতের অন্ধকারে একা ঠাণ্ডা বিছানায় শুয়ে মনে মনে বিচার করে দেখে যে জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে সুধাংশুমোহনের খুব বেশি প্রভেদ নেই। ওপর-ওপর দুজনের রূপ একেবারে আলাদা মনে হলেও এখন ঊর্মিলার চোখে তাঁদের একরকমই লাগে। বরং তুলনায় জিতেন্দ্রনাথকেই তার সুধাংশুমোহনের চেয়ে বড় বলে মনে হয়। বাইরের সব লোক কমলার ওপর তাঁর নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা জানে। কিন্তু এই সুন্দর সাজানো সংসার দেখে একটি লোকও সুধাংশুমোহন-কে দূর থেকে সন্দেহ করতে পারবে না। কারুর পক্ষে হয়তো কল্পনা করা সম্ভব হবে না, কী নিদারুণ যন্ত্রণায় ঊর্মিলার শাশুড়ী হঠাৎ এক-দিন মৃত্যুবরণ করেছেন।

আর এই কারণে অজয়ের মনে যে কোন জ্বালা কিম্বা ক্ষোভ নেই সে-বিষয়ে ঊর্মিলা নিঃসন্দেহ। শুধু শুধু সে নিজেই তার

বাপের কথা মনে করে দিনের পর দিন দুঃখ পেয়েছে। নিজের স্বার্থে দিশা হারিয়ে কমলাকেও অকারণে মনে মনে ছোট করেছে। দাদা বৌদির দিকে শ্রদ্ধাভরা চোখে তাকাতেও এতদিন সে কেবলই দ্বিধা করে এসেছে।

কিন্তু কী অসামান্য ব্যক্তিত্ব কমলার! তাঁর মুখ থেকে কখনও কেউ কোন অভিযোগের কথা শুনতে পায়নি। অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে হাসিমুখে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করে গেছেন। জিতেন্দ্রনাথ অমানুষিক কষ্ট দিলেও ছেলে-মেয়ের কথা মনে করে কখনও তিনি ধৈর্য হারাননি। কিন্তু তাঁকে কোন মূল্যই দেয়নি উর্মিলা। শুধু স্বার্থপর কাঙালের মতো সকলকে সজোরে ঠেলে নিজে এগিয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি পাবার জন্যে। তাই এখন একা একা বিছানায় ছটফট করে সে। আর একবার তার কুমারী-জীবনে ফিরে যেতে চায়। কিছুতেই ঘুম আসে না।

কাছাকাছি কোন বাড়ি নেই। পাড়াটা বড় বেশি নির্জন। শুয়ে শুয়ে কোন কোলাহল উর্মিলা শুনতে পায় না। এদিকে কোথাও একটা কারখানা আছে বোধহয়। রোজ রাত সাড়ে দশটায় সেখানে তীক্ষ্ণ সাইরেন বাজে। আজ সে কান পেতে সেই শব্দ শোনে। কিসের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত যেন বাতাসে কাঁপতে থাকে। তখন উর্মিলা পাশ ফিরে শোয়।

বেশি কথা বলে বুকি। একসঙ্গে অনেক কিছু করতে চায়। কিন্তু কোন্ কাজ আগে করা উচিত আর কোন্‌টা পরে করবে ঠিক করতে পারেনা বলেই মাঝে মাঝে উর্মিলাকে বলে তাকে একটু

সাহায্য করতে। এ ধরনের কাজে সাহায্য করবার অভ্যেস উর্মিলার নেই বলে প্রথমটায় সে চমকে ওঠে। তারপর বুকি যা বলে তাই করে যায়। হয়তো না করে উপায় নেই বলেই করে।

দেখ, অল্প হেসে বুকি বলে, আজ টুলু এলে ওকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিও। আমার অপেক্ষায় ও যেন কিছুতেই বসে না থাকে।

তোমার ফিরতে বুঝি খুব দেরি হবে?

না। তবে রামস্বামী সঙ্গে থাকবে কি-না। আমি চাইনা টুলু ওকে দেখতে পায়, একটু হেসে বুকি বলে, তুমি ওকে যেন বলনা যে রামস্বামী আমাকে নিতে এসেছিল। ও কিছু জিজ্ঞেস করলে বল যে আমি একাই বেরিয়ে গেছি, ফিরতে অনেক দেরি হবে।

মোটরের হর্ন বাজে। বেয়ারা এসে বুকিকে খবর দেয় রামস্বামী এসেছে। বুকি আয়নার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে দু-একবার পাউডারের পাফ বুলিয়ে নেয়। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে নিচে নামে। কিছু পরে উর্মিলা মোটরের শব্দ শোনে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে রামস্বামীর গাড়িতে বুকি বেরিয়ে যায়।

আর একটু পরে আসে নীতু বোস। বসবার ঘরে বসে রুকির সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে। আজ বাবলুকে দেখতে পায় না উর্মিলা। রুকি নীতু বোসের সঙ্গেই বাইরে বার হয়। এখনও অজয় ফেরেনি। কখন ফিরবে ঠিক নেই। আজকাল অফিসের পরই বাড়ি ফিরে আসে না সে। বলে, অনেক কাজ পড়েছে তাই দেরি হয়।

বসবার ঘরে একা বসে থাকে উর্মিলা। ইচ্ছে করলে সে-ও বেরিয়ে যেতে পারে যেখানে খুশি। যতক্ষণ ইচ্ছে বাইরে কাটিয়ে আসতে পারে। কিন্তু তার পৃথিবীটা হঠাৎ যেন গুটিয়ে গেছে।

লোকের চোখে পড়তে আর ইচ্ছে করেনা। অনেক বই নাড়াচাড়া করে। আবার পড়াশুনো আরম্ভ করে দিতে মন চায়।

গেট খোলার শব্দ শুনে উর্মিলা বাইরে তাকায়। বোধহয় আজ অজয় একটু আগেই ফিরেছে। না, অজয় নয়। টুলু রায়ের মুখ গম্ভীর। তাকে দেখে উর্মিলা হাসে। বসতে বলে। কিন্তু টুলু বসে না। একবার বাইরে তাকায়। আগেই বোধহয় বুঝতে পারে যে বুকি বাড়িতে নেই।

বুকি আছে?

উর্মিলা বলে, না। বলে গেছে ফিরতে দেরি হবে।

আমি জানতাম, ঘনঘন সিগ্রেট টানে টুলু, রামস্বামী এসেছিল?

না, একটা ঢোঁক গেলে উর্মিলা।

যাক গে, নীরস স্বরে টুলু বলে, ওকে বলে দেবেন আমি আর আসতে পারব না—ও যেন কোনদিনও আমার জন্যে অপেক্ষা না করে।

কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে উর্মিলা বলে, বসুন। উনি তো এখুনি এসে পড়বেন।

না, আজ আর বসব না, হাসবার চেষ্টা করে চলে যায় টুলু রায়। হাসতে গিয়ে কঠিন হয়ে ওঠে ওর মুখ। উর্মিলা ভয় পায়। বুকির ব্যবহার ভাল লাগে না। টুলুকে আগে স্পষ্ট করে সব জানিয়ে দিলেই তো পারত। কিন্তু মন খুলে কাউকে কিছু বলবার উপায় নেই—তাই সে চুপ করে থাকে। নিজের ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

কয়েকদিন ধরে উর্মিলার শরীর ভাল নেই। প্রায়ই সন্ধ্যেবেলায় জ্বর হয়। মাথা ধরে থাকে। সে ভেবেছিল কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। অজয় তার চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে। কিন্তু

তার ধারণা ভুল। অজয় হয়তো ভাল করে তাকিয়ে দেখে না তার চেহারার দিকে।

না দেখুক। আর তার শরীর খারাপের কথা বুঝতে পারলে কি করত সে? বড় একটা ডাক্তারকে টেলিফোন করত। দামী দামী ওষুধ কিনত। নিজে মাথার কাছে বসে অল্পক্ষণের জন্যে কপালে ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিত কি-না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে উর্মিলার। তার জন্যে এ বাড়ির কাউকে একটু ব্যস্ত করতে সে চায় না। মা হলে নিজেই বুঝতেন। নিজেই সেবা করতেন।

অজয় ফিরেছে। শিষ দিতে দিতে ওপরে উঠেছে। ভয় লাগে উর্মিলার। এই নির্জনতাই ভাল লাগছিল তার। আর কারুর সামনে এই সময় যন্ত্রের মতো নিয়ম পালন করতে সে চায় না। ঘরের আলো উর্মিলা এখনও জ্বালায়নি। উঠে আলো জ্বালাবার আগেই অজয় ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। টক করে সুইচ টেপে।

উর্মিলাকে দেখে চমকে উঠে অজয় বলে, অন্ধকারে কি করছ?

শরীর ভাল নেই।

উর্মিলার গায়ে হাত দিয়ে অজয় বিরক্ত হয়, আলোটাও জ্বেলে নিতে পারলে না? খাটের ওপর কোটটা ছুঁড়ে ফেলে সে বলে, অন্ধকারে মুখ গুঁজে বসে থাকলে কি শরীর তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে?

অন্ধকারই আমার ভাল লাগে।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি, টাই খুলতে খুলতে অজয় বলে, আশ্চর্য তোমার মেজাজ! কখন কি ভাল লাগে বোঝা শক্ত।

বোঝবার চেষ্টাও তুমি কখনও করনা—

ঘুরে দাঁড়িয়ে অজয় বলে, আমার অত সময় নেই। সারাদিন

অপদার্থ গেঁইয়া মেয়ের মতো যারা মুখ ভার করে ঘরের কোণে বসে থাকে তাদের নিয়ে আমি একটুও মাথা ঘামাতে চাইনা—

কে বলেছে তোমাকে মাথা ঘামাতে? যাও না, যে শহুরে মেয়েদের পদার্থ আছে তাদের নিয়ে মাথা ঘামাও।

কঠিন দৃষ্টিতে অজয় একবার তাকায় উর্মিলার দিকে। হঠাৎ আর কিছু বলতে পারেনা। উত্তেজনায় শার্ট আর জুতো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তোয়ালে খুঁজতে গিয়ে ঘরের সব জিনিস তছনছ করে দেয়। ছোকরা চাকরের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকে। তার রুক্ষ মেজাজ দেখেও উর্মিলা নড়ে না। একটুও বিচলিত হয় না। করুক যা খুশি। নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে এ বাড়ির আর কাউকে ভয় করবে না সে।

ছোকরা চাকরের হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে অজয় বাথরুমে যায় না। দ্রুত পায়ে ঘরের এদিক থেকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করে। উর্মিলার দিকে তাকায় না কিন্তু আপন মনেই গজগজ করে। উর্মিলা উঠে বাইরে চলে যেতে চায়। একটা অদ্ভুত অস্বস্তিতে তার মন ভরে গেছে।

অজয় বলে, কিছু একটা করবার উপায় নেই—কোথাও যাবার উপায় নেই। শুধু ঘরের মধ্যে ঘাড় গুঁজে বসে থাক—

আস্তে উর্মিলা বলে, কে তোমাকে যেতে বারণ করেছে? গেলেই তো পার তোমার যেখানে খুশি।

তা তো যাবই, উর্মিলার সামনে এসে দাঁড়ায় অজয়, কিন্তু লোকে যখন 'কেন একা গেছি' বলে প্রশ্ন করবে তখন কি বলব?

উর্মিলা মাথা তুলে বলে, লোকের সামনে আমাকে তোমার নিয়ে যেতে ভাল লাগে না বলেই আমি যাই না—

কেমন করে ভাল লাগবে? না জান আদব-কায়দা, না পার একটা কথা বলতে। সঙের মতো বসে থাক বলেই কোথাও নিয়ে যাই না—

উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন স্বরে উর্মিলা বলে, আমি কি জানি আর না জানি, বিয়ের আগে তুমি কি তা জানতে না? এখন আমাকে খোঁটা মেরে কোন লাভ নেই—

শুধু দেখছি তর্ক করতেই শিখেছ। তবু যদি এ বাড়ির যোগ্য হবার সামান্য চেষ্টা করতে—

এবার নিজেকে আর সামলাতে পারে না উর্মিলা। সব ভুলে তীক্ষ্ণ স্বরে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, এ বাড়ির যোগ্য হলে কি করতে হয় সেটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার? ছোট করে চুল কাটতে হয়? আজ এর সঙ্গে আর কাল ওর সঙ্গে রঙ মেখে ঘুরে বেড়াতে হয়—

উর্মিলার কথা শুনে অজয় থমকে দাঁড়ায়। দাঁতে দাঁত চেপে শব্দ করে। তার চোখ দুটোও হঠাৎ লাল হয়ে যায়। বাইরে বেয়ারার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম রাখল। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলকে পর্দা কাঁপছে। কিন্তু তার একটুও শীত লাগে না।

থেমে থেমে উর্মিলার কথার উত্তর দেয় অজয়, হ্যাঁ। আর তা ছাড়া যা করতে হয়—মাস্টারনীর মেয়ের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়—কথা শেষ করে সে আর সেখানে দাঁড়ায় না। বাথরুমের দরজা এত জোরে বন্ধ করে যে উর্মিলা চমকে ওঠে।

হাওয়া আসছে হু হু করে। চাপা ভাসা ভাসা কোলাহল। অনেক দূরের কোন মাঠে খেলা শেষ করে ছেলেরা বাড়ি ফিরছে। আর কাছাকাছি কোন বাড়িতে পিয়ানো বাজছে টুং টাং করে। মৃদু অস্পষ্ট

গুঞ্জন। চৈতন্য যেন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে উর্মিলার। বিকট যন্ত্রণায় মাথা ঝিম ঝিম করছে। আর এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। এ বাড়ির দেয়াল তাকে পিষে মারবার জন্যে আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে আসছে। ছাদটা এখুনি হুড়মুড় করে ধসে পড়বে তার মাথার ওপর। হঠাৎ বালিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে উর্মিলা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁ অনেকক্ষণ।

মুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসতে অজয়ের একেবারেই দেরি হয় না। একটু বেশি শব্দ করে সে চলাফেরা করে ঘরের মধ্যে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়। উর্মিলা বুঝতে পারে আবার বাইরে বেরুবার জন্যে সে তৈরি হচ্ছে। ওঠে না উর্মিলা। অজয়ের চায়ের ব্যবস্থা করবার কোন উৎসাহ তার নেই। চা খায় না অজয়। জুতোর শব্দ করতে করতে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যায়। যাবার আগে বোধ হয় ইচ্ছে করেই এ ঘরের আলোটা আবার নিবিয়ে দিয়ে যায়।

ঠাণ্ডা পাথরের একটা ধূলিমলিন মূর্তির মতো অন্ধকারে খাটের ওপর উর্মিলা একা পড়ে থাকে। কান্না থেমে গেছে তার। চৈত্রের পাতার মতো শুকনো চোখ। অজয়ের একটি কথায় এক মুহূর্তে তার মনের সব কোমলতা যেন ঝরে গেছে। আর কিছু সে আশা করবে না। অভিমান জানাবারও প্রবৃত্তি নেই। কিন্তু এ অপমান সহ্য করে এ সংসারে দিন কাটাতে হলে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

আর কোথাও নয়, আর কারুর কাছে নয়, এখুনি কমলার বুকের ওপর তার ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। চিৎকার করে কেঁদে মার সামনে সে বলতে চায়, মা তুমি ঠিক বলেছিলে। আমার হিসেবে মস্ত বড় ভুল হয়েছে। তার জন্যে চূড়ান্ত শাস্তি আমি পেয়ে গেছি। কিন্তু একজন নীচ মানুষের কাছ থেকে তোমার অপমান

সহ্য করতে পারি নি বলেই আবার তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমাকে থাকতে দাও।

খাটের ওপর উঠে বসে উর্মিলা। অজয়ের ঘরে বসে আছে মনে করে শরীর কলুষিত মনে হয়। হয়তো পরে সে অনুতাপ করবে। বারবার উর্মিলাকে বলবে কথাটা ভুলে যেতে। কিন্তু আর নয়। উর্মিলা আজ থেকে আর কোনদিনও অজয়কে তার একান্ত কাছের মানুষ বলে ভাবতে পারবে না। এ বাড়ি তাকে ছাড়তেই হবে। মনে মনে প্রস্তুত হতে থাকে সে।

সেই অবস্থায় সে কতক্ষণ খাটের ওপর শুয়ে থাকে বুঝতে পারে না। একবার ভাবে উঠে আলোটা জ্বেলে দেবে—বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে একটু জলের ছিটে দিয়ে আসবে। কিন্তু কিছু করতে পারে না। এমনি করেই আরও অনেকক্ষণ কাটে। এক হাতে নিজের মাথা টিপতে টিপতে উর্মিলা ভাবে এখুনি কমলার কাছে চলে যাবে কি-না। দিনের বেলা হলে বাড়ি থেকে হেঁটে বার হয়ে সে বাস ধরত। কিন্তু এই শীতের রাত্তিরে নির্জন রাস্তায় একা হাঁটতে তার সাহস হয় না। আর চাকর-বাকরের সামনে নিজের এখনকার চেহারাটাও সে দেখাতে চায় না। যত তাড়াতাড়ি হয় অজয়কে সব কথা জানিয়ে এ বাড়ি থেকে উর্মিলা চলে যাবে।

আস্তে আস্তে উঠে সে আলো জ্বালে। কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই। অন্ধকারে ভয় লাগে উর্মিলার। অনেক রাত হয়ে গেছে। প্রায় দশটা বাজে। শ্বশুরকে নিশ্চয়ই মতি খাইয়ে দিয়েছে। দিক বা না দিক—কিছু যায় আসে না তার। আজ থেকে উর্মিলার কোন দায় নেই—কোন কাজ নেই। এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন ভাবনা নেই।

ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় উর্মিলা। অনেকক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে। দেখতে দেখতে নিজের ওপরই উৎকট ঘৃণায় ছটফট করে। তার কাঙালপনার জন্যেই তো অজয় কমলাকে অপমান করতে সাহস করে। প্রতিশোধ না নেওয়া অবধি উর্মিলার শান্তি নেই। যতীন দাস রোডের বাড়ি ছেড়ে এলেও সে জানত না ও বাড়ির মানুষগুলি—বিশেষ করে কমলা তার বুকের এত কাছে আছেন!

হঠাৎ উর্মিলা চমকে ওঠে। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার—কতকটা আর্তনাদের মতো। তারপরই গম্ভীর গলায় আওয়াজ—তর্কাতর্কি। নিজের ঘরে বসেই বুকির গলা সে চিনতে পারে। এত রাত্তিরে কারা নিচে এমন গোলমাল করছে। সে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসে। কিন্তু বসবার ঘরে ঢোকবার সাহস তার হয় না। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শোনে।

ধারালো স্বর বুকির, তুমি যদি এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে না যাও তাহলে আমি পুলিশে খবর দেব—

ডাক পুলিশ, টুলু রায়ের গলা একেবারেই অন্য রকম আজ। তার স্বর চিনতে বেশ দেরি লাগে উর্মিলার। একটা কাগজ-চাপা দুম করে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে টুলু বলে, একটু লজ্জা করে না তোমার?

তোমার লজ্জা করে না? আরও জোরে কথা বলে বুকি, দূর করে তাড়িয়ে দিলেও আবার আমার : কুকুরের মতো ঘোরো—

শাট আপ। কে কার পেছনে ঘোরে সেকথা আমার খুব ভাল করে জানা আছে। অত সহজে আমি তোমাকে ছেড়ে দেবনা। হেসে উঠে বুকি বলে, কি করবে শুনি?

তোমাকে আর তোমার ওই রামস্বামীকে গুলি করব।

গেঁইয়া ছোট মেয়েদের গিয়ে ওসব কথা শোনাও। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা তুমি কোন সাহসে কর? আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি যে তোমার সঙ্গে আমি আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না—

তা রাখবে কেন? বোধহয় একটা চেয়ার টুলু ঠেলে ফেলে দেয়, একজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে চলে নাকি তোমার মত মেয়ের? আজ এর সঙ্গে দার্জিলিং, কাল ওর সঙ্গে ডিনার, পরশু—

টুলু, চিৎকার করে বুকি তাকে শাসায়, আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে এমন অপমান করলে ফল ভাল হবে না বলে দিলাম—

পুলিশ ডাক।

এতক্ষণ পর উর্মিলা রুকির গলা শুনতে পায়। বেশ রূঢ়স্বরে সে টুলুকে বলে, তুমি কি চাও?

আমি কৈফিয়ৎ চাই। আমার সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে যাবার পর কেন ও অন্য লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়?

কাটা কাটা কথা বলে রুকি, সেটা আমাদের সমাজের নিয়ম। তুমি অন্য রকম জানলে সে কখনও তোমাকে কোন রকম বোঝাপড়া করবার সুযোগ দিত না—

ওসব নিয়মকানুন আমাকে শেখাতে এস না। আমার কাছে ভান করে কেউ পার পায় না, মাটিতে পা ঠোকে টুলু রায়, তোমাদের জন্যে আমি কি না করেছি। যখন যা চেয়েছ তাই দিয়েছি। মাসের পর মাস বাড়ি ভাড়া চুকিয়েছি—তার ওপর অজয় যে কত নিয়েছে তার ঠিক নেই—

বুকি বলে, সেসব তুমি দাদার সঙ্গে বোঝাপড়া কর গিয়ে।

তোমার স্বভাবের কথা আগে জানতে পারলে আমি তোমার সঙ্গে কথাও বলতাম না—

আর তোমার কথা বুঝতে পারলে আমিও তোমাকে বিশ্বাস করতাম না।

রুকি ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেবার জন্যে বলে, বেশ এখন যখন বোঝাপড়া জানাজানি—সব হয়েছে তখন চেঁচামেচি করে তো আর কোন লাভ নেই। বেটার ব্রেক অব—গুণ্ডামি করে কেউ কারুর প্রেম পেতে পারে না—

হা হা করে হেসে ওঠে টুলু রায়। হাসতে হাসতে বলে, প্রেম করতে কেউ তোমাদের মতো মেয়েদের কাছে আসে না। আমি একাই শুধু বোধহয় ভুল করেছিলাম—

বুকি আবার চিৎকার করে, গেট আউট!

ভেতরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ঊর্মিলা ঠক ঠক করে কাঁপে। ঠিক বুঝতে পারে না শীতে না উত্তেজনায়। যদিও গায়ে এখন কোন গরম কাপড় নেই কিন্তু তার অভাব এক মুহূর্তের জন্যেও সে বোধ করে না। উত্তেজনায় শরীরের সব রক্ত যেন মাথায় এসে জমা হয়। ঘোর লাগে। আর আশ্চর্য, ঠিক সেই সময় মতি এসে দাঁড়ায় তার সামনে। মুখে অদ্ভুত ধরনের হাসি।

অনেক রাত হল দিদি। খাবেন না?

ঊর্মিলা কোনরকমে মাথা নেড়ে বলে, না।

বসবার ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে মতি বলে, ওসব গোলমাল শুনে ঘাবড়াবেন না। এমন হামেশাই হয় এখানে। ওরা তো খেয়ে এসেছে। এত রাতে দাদাবাবুও বাড়িতে খাবেন না। আপনি কি না খেয়ে থাকবেন?

আমার একটুও ক্ষিদে নেই মতি। শরীর খুব খারাপ। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও, তাকে আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে উর্মিলা ওপরে উঠে যায়। একবারও পেছন ফিরে দেখে না মতি তখনও সেখানে তেমন করেই দাঁড়িয়ে আছে কি-না।

অজয় কখন আসবে ঠিক নেই। আসবে কি-না উর্মিলা সেকথাও বুঝতে পারে না। চোখে ঘুম নেই। মাথায় আগুন জ্বলছে। বুকের কোথায় যেন কান্না জমে আছে। খোলা চোখে ওপরে তাকিয়ে সে শুয়ে থাকে। নড়ে না।

নিচের গোলমাল থেমে গেছে। এখন কোথাও আর কোন শব্দ নেই। রুকি বুকির পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোন কথা বলছে না তারা। সুধাংশুমোহন নিজের ঘর ছেড়ে বার হন নি। হয়তো রোজকার মতন বিছানার ওপর নেশার ঘোরে টলে পড়েছেন অনেকক্ষণ। এ রাতটা যেন অনেকক্ষণ থাকে। এ অন্ধকার যেন কখনও না শেষ হয়। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে উর্মিলার। কিন্তু আর যেন ওঠবার শক্তি নেই। হাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ক্লান্তি। ঝিমিয়ে গেছে শিরা-উপশিরা। হাত বাড়িয়ে গেলাসে সে জল ঢালবে কেমন করে।

একটা মোটর গাড়ি ঢুকল গেটের ভেতর। আওয়াজ চিনতে উর্মিলার ভুল হয় না। অজয় ফিরেছে। জোরে জোরে শব্দ করে সে ওপরে ওঠে। গুনগুন করে একটা চেনা গানের সুর ভাঁজে। ঘুমের ভান করে উর্মিলা কাঠের মতো পড়ে থাকে। লেপ টেনে মাথাটা ঢেকে দেয়।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বালে অজয়। জামা-কাপড় না বদলেই উর্মিলার পাশে এসে বসে। তাকে নাড়া দেয়। সাড়া দেয় না

উর্মিলা। যেন অঘোরে ঘুমচ্ছে। লেপের মধ্যে থাকলেও মদের উৎকট গন্ধ তার নাকে যায়। অজয় মদ খেয়ে ফিরেছে। ফিরুক। তার যা খুশি সে করুক। শুধু উর্মিলাকে নিয়ে সে যেন আর কোনদিন মাথা না ঘামায়—তাকে যেন থাকতে দেয় তার নিজের মনে।

ঘুমিয়েছ? অজয় উর্মিলার মুখের ওপর থেকে আস্তে লেপটা একটু সরিয়ে দেয়, কথা বল? আমি তোমাকে আর কখনও বকব না—যখন যেখানে যাব তোমাকে সব জায়গায় নিয়ে যাব। ওঠ। একটু কথা বল?

চোখ খুলে কঠিন স্বরে উর্মিলা বলে, কে যেতে চায় তোমার সঙ্গে?

এখনও রাগ পড়েনি দেখছি। কি এমন বলেছি তোমাকে? মাস্টারনীর মেয়ে? আরে, বিশ্বাস কর, আমি কিছু ভেবে বলিনি, স্বর সামান্য জড়িয়ে যায় অজয়ের, হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল কথাটা—

থাম, লেপ দূরে ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ে উর্মিলা, আমার মার কথা তুমি আর কখনও তুলবে না—

ও বাবা, অজয় ভয় পাবার ভান করে, মারবে নাকি?

না। এ বাড়িতে কিছু করবার প্রবৃত্তি আমার আর নেই।

উর্মি, আমি রিয়েলি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি।

আমি জানি। কিন্তু দয়া করে আমাকে একটু চুপ করে থাকতে দাও। মাতালের প্রলাপ শুনতে আমার ভাল লাগছে না।

তাই নাকি? অল রাইট, জুতো খোলে অজয়। প্যাণ্টের মধ্যে থেকে শার্ট টেনে বের করে, আর কথা বলব না। এই চুপ

করলাম—পায়ের ওপর লেপ টেনে অজয় বালিশে মাথা রাখে। নিজের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে উর্মিলার দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসে। কিন্তু তার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে কোন কথা বলে না। পাশ ফিরে শোয়।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিতে হবে এবার। উঠতে গিয়েও ইতস্তত করে উর্মিলা। সারা রাত আলো জ্বালিয়ে রাখবে কি-না সেকথা ভাবে বোধহয়। তার চোখে আজ একেবারেই ঘুম নেই। অজয়ের পাশে গিয়ে শুতে হবে মনে করে অস্বস্তি হচ্ছে। তা করা আজ তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আস্তে আস্তে উঠে উর্মিলা আলো নিভিয়ে দেয়। তারপর সারা রাত সোফায় বসেই কাটিয়ে দেয়। তার কান্না থামতে চায় না কিছুতেই।

শীত হঠাৎ কমে গেল। হয়তো শেষের দিকে আর একবার ঠাণ্ডা পড়বে। এখন বসন্তের হাওয়া দিয়েছে। কড়া রোদ্দুরে শরীর ঘামে। অনেক দূর থেকে কখনও কখনও থেমে থেমে কোকিল ডাকে। আর হাওয়ার ঝলক এতদিন পর উর্মিলাকে সত্যি এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়ে যায়। মনটা হালকা করে তোলবার চেষ্টা করে সে। সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকের ভারী পাথরটা সরিয়ে দিতে চায়।

রাস্তায় নেমে এদিক-ওদিক তাকায় উর্মিলা। ছুটির দিন। সকলে বাড়িতেই আছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে বসে আজ সে ঝিমিয়ে যেতে চায় না। কারুর সঙ্গে কোন কথা বলে না। এক সময় সোজা বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়ায়।

সামনেই বালিগঞ্জের মাঠ। ঘাসের ওপর শিশির ঝলমল করছে।

এর মধ্যেই ছেলেরা ক্রিকেট খেলা শুরু করে দিয়েছে। উর্মিলা তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

তাদের বাড়ির সামনে বাস-স্টপ। অজয় বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই দেখবে উর্মিলা বাসের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাকে দেখতে পেলেই সে ডেকে পাঠাবে। কেন গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে না জানতে চাইবে। তাই তাড়াতাড়ি বাসটা এসে গেলেই সব চেয়ে ভাল হয়। উর্মিলা একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সুধাংশুমোহন একটা কালো ড্রেসিংগাউন গায়ে দিয়ে বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাকিয়ে দেখলেন উর্মিলার দিকে। চিনতে পারলেন না। না, আর কোনদিনও উর্মিলা বাড়ির গাড়ি নিয়ে বার হবে না। এ বাড়ির কোন কিছুই সে চায় না—অজয়কেও নয়। তার দিক থেকে অনেক দৈন্য সে প্রকাশ করেছে। এদের সকলকে দেখিয়েছে তার এক দীন করুণ মূর্তি। তাই সকলে তাকে বিদ্রূপ করে। অবহেলা করতে সাহস পায়। কিন্তু আর নয়। সমস্ত তুচ্ছ করে দুই হাতে ঠেলে দেবার ক্ষমতাও যে তার আছে, এবার সে শুধু সেই কথাটা অসঙ্কোচে এদের সকলকে জানিয়ে দিতে চায়। তারা তার আর এক রূপও দেখুক।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে উর্মিলার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সুন্দর সাজানো বাগান। বড় গেট। জানলা-দরজায় দামী পর্দা। বারান্দায় নীল বেতের চেয়ার। তাজা রোদে সমস্ত বাড়িটা যেন ঝলমল করছে। দূর থেকে তাকিয়ে দেখলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। সুধাংশুমোহনকে এক রূপবান ঐশ্বর্যশালী কৃতী পুরুষের মতো মনে হয়।

কিন্তু এসব দেখে উর্মিলা আর চমকে উঠবে না। ধাঁধাও

লাগবে না তার চোখে। কারণ সে ওই বাড়ির ভেতরে কি আছে তা ভাল করেই বুঝেছে। আগাগোড়া জেনেছে। তার ইচ্ছে করে সকলকে ডেকে ও-বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের আসল চেহারা দেখিয়ে দিতে। যেন তার মতো ভুল আর কেউ না করে।

আশ্চর্য। টুলু রায় চূড়ান্ত অপমান করে যাবার পরও এতটুকু লজ্জা হল না কারুর। গোলমাল শুনে সুধাংশুমোহন একবারও এলেন না সে-ঘরে। অজয় নিশ্চয়ই পরে সব কথা শুনেছে। কিন্তু কোনরকম উত্তেজনা প্রকাশ করেনি সে। আর বুকির প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সামান্য পরিবর্তন হয় নি। শুধু টুলু রায়ের বদলে এখন রামস্বামী আসে। আর তার মতোই সে তাকে রোজ বাইরে নিয়ে যায়। ফিরে এসে বসবার ঘরে বসে রোজ হাসাহাসি করে।

লজ্জা যেন উর্মিলার একার। মতির দিকে সে তাকাতে পারে না। বুকির সঙ্গে কথা বলবার সময় তার নিজের মাথাটাই নিচু হয়ে যায়। রামস্বামী নীতু বোস কিম্বা বাবলু ঘোষ এলে তারই ভয় হয় সব চেয়ে বেশি। আবার কে কোনদিন চিৎকার করে ওঠে। কে কোনদিন কাকে গুলি করতে যায়। ভয় উর্মিলার নিজের জন্যে নয় —চাকর-বাকরদের জন্যেই। উর্মিলার নিজের জীবনে এমন ঘটনা ঘটলে হয়তো সে তাদের কোন কাজ করবার কথাই বলতে পারত না। তাদের সামনে মুখ বার করতে তার সঙ্কোচ হত। যদিও তারা সকলেই জানে যে এমন ব্যাপার এ বাড়িতে প্রায়ই হয়।

অনেকদিন পর আবার উর্মিলা বাসে চড়ে। ঝাঁকানিতে শরীরটা যেন হালকা হয়ে যায়। আশে-পাশে অনেক লোক। অচেনা মুখ। মেয়েদের সিটে চুপ করে বসে ছাত্রী জীবনের কথা মনে পড়ে যায় তার। আবার কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশুনো আরম্ভ করবার

প্রবল ইচ্ছে হয়। সে তো সেই ব্যবস্থা পাকাপাকি করবার জন্যেই চলেছে। এখন দিবানাথের দেখা পেলে হয়।

দিবানাথ এখনও হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে আছে কি-না ঊর্মিলা জানে না। শিবেনকে ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করবার কথা একবার তার মনে হয়েছিল। কিন্তু না, সে যে দিবানাথের বাড়িতে যাবে সেকথা ও-বাড়ির কাউকে জানাতে তার সঙ্কোচ হয়। নিজের মনের এই আশ্চর্য অনুভূতির কথা এতদিন ঊর্মিলা জানতে পারে নি। বিয়ের পর প্রথম যেদিন তাদের বাড়িতে তাকে দেখল সেদিন তার সঙ্গে সহজভাবে কথা বললেও বুকটা হঠাৎ ধক করে উঠেছিল ঊর্মিলার। অপরাধের ভারে তার সোজা দেহটা যেন বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। কেউ তাকে কোন কথা বলেনি, কিন্তু সে বুঝতে পারছিল কারুর গলার স্বরই স্বাভাবিক নয়। তাকে যেন সকলেই অপরাধী মনে করছে।

অন্য কেউ কি ভাবল বা না ভাবল তা নিয়ে ঊর্মিলা বিচলিত হয় নি। কিন্তু কদিন ধরে নিঃসঙ্গ অন্ধকারে, নিদারুণ যন্ত্রণায়, অপমান আর অবহেলায় দিবানাথ এসে দাঁড়াচ্ছে তার খুব কাছে। তাকে দোষ দিচ্ছে না—কাছে ডাকছে।

মা দাদা বৌদি—ঊর্মিলা কারুর কাছে মন খুলতে পারবে না কিন্তু বোধহয় শুধু একমাত্র দিবানাথের কাছে এতদিন পর সবকথাই বলতে পারবে। চোখের জলে তার ব্যর্থতার কথা জানাবে না, দৃঢ়স্বরে নিজের মর্যাদারক্ষার কথাই বলবে। একটা জীবন ব্যর্থ করে দেয়ার অধিকার কারুরই নেই। অপমান সহ্য করলেও, এক আশ্চর্য আত্মবিশ্বাসে ঊর্মিলার মন ভরে উঠেছে। তাই সকলকে এড়িয়ে একা একা বাসে চড়ে, দিবানাথের সঙ্গে দেখা করতে যাবার মতো মনের জোর তার

হয়েছে। সব কথা শুনলে কমলা একেবারে ভেঙে পড়বেন বলেই যতদিন পারে ঊর্মিলা ঘটনাটা তাঁর কাছে গোপন করে রাখবে।

এ রাস্তার বাস বোধহয় একটু বেশি জোরেই চলে। কণ্ডাক্টার জোরে চিৎকার না করে উঠলে ঊর্মিলা আরও অনেকটা দূরে চলে যেত। তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে হিন্দুস্থান রোড ধরে সে সোজা চলতে লাগল। একটা গান-বাজনার ইস্কুল আছে নাকি কাছাকাছি। সেতার হাতে নিয়ে মেয়েরা চলেছে। একটুও শীত নেই। মৃদু উষ্ণ বাতাস বইছে। হঠাৎ থেমে যায় ঊর্মিলা।

মাত্র একদিন এসেছিল কিন্তু বাড়ি চিনতে ভুল হয় নি তার। আকণ্ঠ লজ্জায় ঊর্মিলার মাথা ঝিমঝিম করে। যদি আর কেউ থাকে। এখন অনেক কাজ দিবানাথের। ছুটির দিনে ছাত্রছাত্রীর ভিড় হওয়া তো স্বাভাবিক। তখন কি ছল করে সে ঢুকবে। কি কথা তার সঙ্গে বলবে প্রথম। হয়তো এভাবে তার এখানে আসা ঠিক হয় নি। দাদা বৌদি আর মার সামনে ও-বাড়িতে সহজভাবে কথা বলে পড়াশুনোর একটা ব্যবস্থা করে নিলেই সব চেয়ে ভাল হত। এখন সে দিবানাথকে বলতেও পারবে না যে সে এখানে এসেছিল সেকথাটা যেন আর কাউকে না বলে।

হয়তো ইতস্তত করে আর কিছুক্ষণ পর আবার বাসে চড়ে বাড়ি ফিরে যেত ঊর্মিলা। কিন্তু সে কাউকে না ডাকতেই দিবানাথের বাড়ির দরজা খুলে গেল। হাতে অনেক মোটা মোটা বই। মাথা তুলে ঊর্মিলাকে দেখে সে চমকে উঠল। বিস্ময়ের এমন আশ্চর্য রূপ ঊর্মিলা আর কখনও দেখেনি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে দিবানাথ। নিজেকে সামলে নিতে অনেক সময় লাগছে তার। সে বিশ্বাস করতে

পারছে না কিছুতেই যে উর্মিলা এসে দাঁড়িয়েছে তারই দরজার সামনে।

খুব অবাক হয়ে গেছেন?

আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ।

বাড়ি বদলেছেন কি-না বুঝতে পারছিলাম না। তাই ভেতরে ঢুকতে সাহস হচ্ছিল না—

এস এস, প্রবল আগ্রহে দিবানাথ আবার পেছন ফেরে, একেবারে ঠিক সময় এসে পড়েছ। আর একটু দেরি করলে আজ আর দেখা হত না।

তাহলে আবার আসতাম, ঘরে ঢুকে উর্মিলা বলে, কিন্তু আপনি তো বেরুচ্ছিলেন। আমি না হয় আর এক সময় আসব—

না না, আমার এমন কিছু কাজ নেই। বস, দিবনাথ নিজেও একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলে, কেমন আছ উর্মি?

খুব ভাল, উর্মিলা মুখ নামায়। চোখ তুলে দিবানাথের দিকে তাকাতে সাহস পায় না। একটু পরে সারা ঘরটাকে দেখে। ঠিক তেমনি আছে। এপাশে-ওপাশে বইএর রাশি। অগোছাল। অপরিচ্ছন্ন। দ্রুত বুক ওঠা-নামা করে তার। যা বলতে এসেছিল সব ভুলে যায়। এমন করে কেন সে এল এখানে!

অজয়কে নিয়ে এলে না কেন?

মাথা তুলে উর্মিলা জিজ্ঞেস করে, কেন?

ভাল করে আলাপ করতাম।

হবে এখন একদিন, ইতস্তত ছড়ানো বইগুলোর দিকে চোখ

বুলিয়ে ঊর্মিলা বলে, আমি আবার পড়াশুনো করতে চাই। আপনি আমাকে পড়াবেন ?

নিশ্চয়ই, দিবানাথ হেসে বলে, কিন্তু কত বড় সংসার তোমার এখন। পড়াশুনো করবার সময় পাবে কি ?

ঠিক পাব। আমি আপনার সঙ্গে সে-ব্যবস্থাই করতে এসেছি। বলুন, কবে-কবে আপনার সময় হবে।

তুমি কবে-কবে পড়বে আগে তাই বল না ?

ঊর্মিলা হেসে বলে, আমি যদি বলি, রোজ ?

বেশ তাই হবে।

কিন্তু কেমন করে হবে ? আমি যে শুনেছিলাম আপনার অনেক কাজ। অত সময় আপনি পাবেন কেমন করে ?

সে একটা ব্যবস্থা করা যাবে না-হয়—কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় দিবানাথ। ঊর্মিলার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে, শুকনো মুখ। চোখ বসে গেছে। বাইরে মোটর গাড়িও তার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই।

তুমি কার সঙ্গে এলে ঊর্মি ? অজয় তোমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল নাকি ?

না, আমি একাই বাসে এসেছি, একটু থেমে ঊর্মিলা বলে, কেন, একা বুঝি আপনার এখানে আসতে নেই ? কথাটা বলেই সে লজ্জা পায়। আর একদিন দিবানাথের সঙ্গে সে একাই এসেছিল এখানে। সেদিনের সব কথা আজ তাকে দেখে হয়তো দিবানাথের আবার নতুন করে মনে পড়ছে।

কি ভেবে দিবানাথ বলে, আমি জানতাম তুমি আসবে। পরীক্ষা দেবার কথাটা ভাবতে পারিনি বটে। যাহোক কাল আবার মত বদলে যাবে না তো তোমার ?

মিনিটে মিনিটে আমার মত বদলায় সেকথা কে আপনাকে বলল ?

কেউ বলে নি, উর্মিলাকে ঠিক আগের দিনের মতো করেই দেখে দিবানাথ। অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলে, তোমার শরীর এত খারাপ হল কেমন করে ? অসুখ করেছিল নাকি ?

না।

তাহলে ?

শাস্তি পাচ্ছি।

কিসের শাস্তি ?

প্রতারণার।

প্রতারণা, অবাক হয়ে যায় দিবানাথ, কে তোমাকে প্রতারণা করল ?

উর্মিলা হেসে ওঠে, আর একদিন বলব। আজ নয়। আপনি বেরুবেন না ? সে উঠে দাঁড়ায়, এবার আমি যাই—

আরে না না, তা কি হয় ? কিছু না খেয়ে তুমি এখান থেকে যেতে পার না উর্মি। তোমার শ্বশুরবাড়ির সকলে যে আমার নিন্দে করবে—

আমি তো কাউকে এখানে আসবার কথা বলে আসিনি, একটু চুপ করে থাকে উর্মিলা, আপনি কাউকে এখন কিছু বলবেন না। আমি আসছে সপ্তাহ থেকে কিছুদিনের জন্যে মার কাছে গিয়ে থাকব। তখন রোজ সন্ধ্যেবেলা আপনি আমাকে পড়াতে যাবেন।

অসহায়ের মতো মুখভঙ্গি করে দিবানাথ বলে ওঠে, যাব। কিন্তু এখন তুমি যেতে পাবে না উর্মি। কিছু খেয়ে যেতেই হবে।

উর্মিলা আবার চেয়ারে বসে হেসে বলে, বেশ তবে খাওয়ান।

দিবানাথকে বললেও ঠিক সাতদিন পর কমলার কাছে আসতে পারল না ঊর্মিলা। তার কিছু করবার নেই কিন্তু এ সময় বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া ভাল দেখায় না। বুকি হঠাৎ তার নিজের বিয়ের ব্যবস্থা নিজেই করে ফেলেছে। টুলু নয়, রামস্বামী নয়, এ একেবারে অন্য লোক। রেডিওর কারবার। পৃথিবীর নানা দেশে তার অফিস আছে। নাম নন্দলাল সরকার।

বুকির মুখে সব কথা শুনে ঊর্মিলা অবাক হয়ে যায়। খুব অল্প দিন হল নন্দলালের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। শীগগিরই ব্যবসা তদারক করতে বিলেত যাবে বলে বিয়ে করে যেতে চায়। বুকি হাসে আর বলে, ঠিক তার মতো মেয়ে নাকি নন্দলালের দরকার। সব রকম লোকের সঙ্গে সমানে মিশতে পারবে। আর দরকার হলে তার অফিসের কাজও চালিয়ে নিতে পারবে।

খুব ঘটা করে বিয়ে হবে না। একেবারে সময় নেই। শুধু বিশেষ কয়েকজনকে চা খেতে বলা হবে বিয়ের দিন বিকেলে। ঊর্মিলার মা আর দাদা বৌদির নামও করেছিল অজয়। কিন্তু ঊর্মিলা বেশ জোর দিয়ে তাকে জানিয়ে দিয়েছে যে তাদের নেমন্তন্ন করবার কোন দরকার নেই।

একদিন নন্দলালকে দেখল ঊর্মিলা। লম্বা। ফর্সা রঙ। কোঁকড়া চুল। হাসি-হাসি মুখ। মস্ত একটা মোটর গাড়ি চালিয়ে রোজ সন্ধ্যেবেলা এখন এ বাড়িতে আসে। রামস্বামী আর আসে না। তাকে বুকি কি বলে বিদায় করেছে ঊর্মিলা বুঝতে পারে না। এখন আবার গোলমাল না হলেই হয়।

কিন্তু বাবলু ঘোষকেও অনেকদিন দেখতে পায়নি ঊর্মিলা। রুকি

চুপচাপ ঘরে বসে থাকে। একা একা কি ভাবে। বুকির বিয়ের ব্যাপারে তার যেন কোন উৎসাহ নেই। ইচ্ছে হলেও উর্মিলা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। হঠাৎ তার ঝিমিয়ে যাবার কারণও খুঁজে পায় না।

আসলে উর্মিলা অনেক শান্ত হয়েছে এখন। যদিও দিবানাথকে সেদিন সে একটি কথাও বলতে পারে নি। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সারা দিন রাতের যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। দিবানাথের চোখের তারায়, তার কথা বলবার ধরনে, ঘরের দেয়ালে দেয়ালে আশ্বাসের একটা গাঢ় রঙ ফুটে উঠেছিল। শুধু পড়াশুনোর কথা বলবার জন্যে উর্মিলা সেদিন হিন্দুস্থান রোডে যায়নি। নিজেকে ধিক্কার দিতেই গিয়েছিল। তার লোভ, তার অহঙ্কার, তার ভ্রান্ত দৃষ্টি আজ অবহেলার এক দূষিত নর্দমায় তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে —দিবানাথকে সেই কথাটা শুনিয়ে সে মুক্তির সন্ধান চাইতে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুই বলা হল না।

না হোক। কিছু না বললেও তার একা একা সেখানে যাওয়াতেই তো অনেক কথাই বলা হয়ে গেছে। উর্মিলাও নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এসেছে। অন্তত এই পৃথিবীতে এখনও এমন একজন লোক আছে যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উর্মিলাকে দেখে। তার রূপগুণের মূল্য দেবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকে। এ বাড়ির কোন মানুষের ওপর উর্মিলার এমন কোন বন্ধন গড়ে ওঠেনি যা ভাঙতে তার কয়েক মুহূর্তের বেশি দেরি হবে। মাথা গোলমাল হয় নি তার। সে সব কথা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছে।

বুকির বিয়ের দিন সকালবেলা অজয় এসে দাঁড়ায় উর্মিলার সামনে, তোমার চেনাশোনা একজনকেও নেমন্তন্ন করলে না কেন?

কি দরকার? আর ভিড় বাড়িয়ে লাভ নেই।

ঊর্মিলার কথায় আঘাত পেয়ে অজয় বলে, কিন্তু পরে ওঁরা যদি কিছু মনে করেন?

শ্লেষের হাসি হেসে ঊর্মিলা বলে, মনে আবার করবেন কি? এত বড় বাড়িতে এমন আরামে আছি সেইটুকুই তো যথেষ্ট। আর আমার সাধারণ আত্মীয়দের আমি অসাধারণ মানুষের ভিড়ে টেনে আনতে চাই না।

চমৎকার। বুকির বিয়ের দিন আমার স্ত্রী হয়ে বেশ চমৎকার কথা বলতে শুরু করলে দেখছি?

কথা শুধু তুমি একাই বলতে জান না কি?

থাক থাক, অজয় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, আজ তোমার সঙ্গে তর্ক করবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি না করে রুকি বুকির সঙ্গে বিয়ের তোড়জোড় করতে খুব আপত্তি আছে কি?

ঊর্মিলা স্পষ্ট জবাব দেয়, হ্যাঁ।

কেন?

ওদের ব্যাপারে আমাকে কোন দরকার আছে বলে তো মনে হয় না। না ডাকলে শুধু শুধু গিয়ে নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই।

দাঁতে দাঁত চেপে ধরে অজয়, কি এমন মহাকাজে ব্যস্ত আছ তুমি?

মান বাঁচিয়ে চলার কাজ, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ঊর্মিলা বলে, সেটা তুমি এতদিনেও বুঝতে পারনি—আশ্চর্য।

অজয় শক্ত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। একটা

কঠিন কথা তার মুখে এসে যায়। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। বাগানে অনেক চেয়ার। অনেক টেবিল। বিকেলবেলা অতিথিরা এসে সেখানেই বসবে। সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। নন্দলালের মোটর এল। বাড়িতেই সকালে বুকি আর নন্দলালের বিয়ে হবে সই করে। অজয় তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসে। কিন্তু নন্দলালকে উর্মিলা ততক্ষণে যত্ন করে বসবার ঘরে বসিয়েছে। অজয় নিচে এসে উর্মিলাকে দেখে অবাক হয়ে যায়।

॥ চার ॥

এই কয়েক মাসের মধ্যে সকলে যেন একেবারে নতুন হয়ে উঠেছে। শুধু মানুষগুলি নয়—ঘর আর ঘরের যত জিনিস, সামনের ছোট রাস্তা, পুরনো বকুল গাছ—সব কিছুর একটা বিশেষ ভাষা যেন এতদিন পর ঊর্মিলা বুঝতে পারে। তাই মার কাছে এসে সে তার অতীত প্রায় ভুলে যায়। বাণীর সঙ্গে সংসারের কাজ করে, শিবেনের সঙ্গে হালকা ঝগড়া করে আর কমলার পায়ে-পায়ে ঘুরে আব্দার করে ঠিক ছোট মেয়ের মতোই।

সংসারটাকে শূন্য মনে হয় না ঊর্মিলার। বাড়ির মানুষগুলির মধ্যেও অন্য আর এক রঙ দেখতে পায়। নিষ্প্রভ হিমশীতল নয় এখানকার কোন কিছুই। ঊর্মিলার চোখ ছিল না তাই দেখতে পায় নি। মন ছিল না তাই বুঝতে পারে নি। কিন্তু আজ নিজের উপলব্ধির কথা এদের কারুর কাছে মন খুলে বলতে পারে না বলেই দুঃখ পায়। কে জানে আর কতদিন তাকে সব কথা গোপন করে চলতে হবে।

হয়তো কমলা তাকে একটু একটু সন্দেহ করেন। কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ ট্যাক্সিতে মালপত্র চাপিয়ে এখানে চলে আসা—অজয়ের কথা একেবারেই না তোলা কিম্বা কবে আবার ও বাড়িতে ফিরবে সে-সম্বন্ধে একেবারেই নীরব থাকা কমলাকে বিচলিত করে তোলে। ঊর্মিলা নিজেই বলেছে যে সে এ বাড়িতে পড়াশুনো করতে এসেছে। ওখানে অনেক লোক। সংসারের অনেক কাজ। মন দিয়ে লেখাপড়া করবার অসুবিধা আছে বলেই সে এখানে

এসেছে আর অজয়কেও জানিয়ে দিয়ে এসেছে তাকে যেন অন্তত এক বছর একেবারেই বিরক্ত না করা হয়।

সব মিলিয়ে কিন্তু ব্যাপারটা ভাল মনে হয় না কমলার। তাঁর মেয়ের যা মেজাজ! কার সঙ্গে গোলমাল করে এসেছে ঠিক নেই। প্রায়ই তিনি নানা প্রশ্ন করেন উর্মিলাকে। সে হেসে কথাটা ঘুরিয়ে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু কমলা ভয় পান—এত ভয় যে তাঁর মুখ চোখ অন্য রকম হয়ে যায়। মেয়ের জেদের কথা তিনি জানেন। কিন্তু জেদের বশে উর্মিলাকে জীবন নিয়ে তিনি ছেলেখেলা করতে দেবেন না। তাই কমলা চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

কার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছিস উর্মি?

অবাক হবার ভান করে উর্মিলা বলে, ঝগড়া করব কেন মা! আমার কি ঝগড়া করা স্বভাব?

কি হয়েছে তাহলে? আমার কাছে কিছু লুকোস না মা। আমার বড় ভয় হয়। সব খুলে বল?

কৃত্রিম রাগ দেখায় উর্মিলা, আমি এসে থাকলে যদি তোমার এইসব আজে-বাজে কথা মনে হয় তাহলে বল আমি ফিরে যাই?

আজকাল ও-বাড়ির কথা তুই একবারও বলিস না। মন মরা হয়ে ঘুরে বেড়াস। অজয় একদিনও এলনা—কি ব্যাপার উর্মি?

বারে, আমি ওকে আসতে বারণ করেছি না—

এটা ঠিক করিস নি। মাঝে মাঝে অজয় এলে তোর পড়াশুনোর কি ক্ষতি হত?

অনেক ক্ষতি হত। পরীক্ষাটা হয়ে যাক—তারপর আমি রোজ আসতে বলব। যত আজে-বাজে ভাবনা ভেবে মাথা খারাপ কর তুমি?

ব্যাপারটা হালকা করে দেবার চেষ্টা করে উর্মিলা কিন্তু কমলার মুখ দেখে সে বুঝতে পারে তাঁর আশঙ্কা দূর হয়ে যায়নি। কমলা কথা বলেন না। শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকেন মেয়ের দিকে। উর্মিলাও আর কোন কথা বলতে পারে না। ভয় পায়। মনে হয় সব কথা যেন কমলা বুঝে ফেলেছেন।

কিন্তু এমন করে তার পরাজয়ের কথা গোপন করে চলবার কি অর্থ হয় উর্মিলা নিজেই তা ভেবে পায় না। সে জানে একদিন ধরা পড়বেই। তখন আস্তে আস্তে সব কথা বলবে সকলকে। যদি কমলা তার বিয়ে ঠিক করে দিতেন তাহলে হয়তো অনেকদিন আগেই সে এই অশান্তির কথা প্রকাশ করে দিত। কিন্তু সকলকে তুচ্ছ করে সে নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করেছে। তাই মার যন্ত্রণার কথা কল্পনা করে সে ইতস্তত করে।

কিন্তু এখন থেকে অল্প অল্প আভাস না দিলে চলবে না। আরও একটা ভয় আছে উর্মিলার মনে। যদি হঠাৎ কোনদিন অজয় এসে পড়ে। হয়তো আসবে না। উর্মিলা যেমন করে তাকে ভুলেছে সে-ও ভুলবে ঠিক তেমনি করেই। দুঃসহ বিতৃষ্ণা ছাড়া কোন পক্ষের কোন আকর্ষণ নেই। প্রতিদিনের জীবনে অজয় একমুহূর্তের জন্যেও উর্মিলার মতো মেয়ের অভাব বোধ করবে না। আর উর্মিলাও কখনও ভাববে না যে সে এমন একজনকে হারিয়েছে যাকে বাদ দিয়ে তার সামনে এগিয়ে যাবার সামান্য অসুবিধা হবে।

তাহলে কেন উর্মিলা বিয়ে করেছিল? অজয় তো দেখেছে তাকে দিনের পর দিন। উর্মিলা নিজের সম্বন্ধে কিছুই গোপন রাখেনি তার কাছে। শুধু অজয়কে সে তার চেয়ে মনে মনে অনেক বড় করে দেখেছিল। বয়স অল্প বলে জীবনের চুল-চেরা বিশ্লেষণ করবার

মতো বুদ্ধি ছিল না। তাই আবার নতুন করে সে জীবনকে চিনতে চায়। তার জেদী মন বিদ্রোহ করে ওঠে। তখন ইচ্ছে করে মাকে সব কথা জানিয়ে দিতে।

এর মধ্যে একদিন কলেজে ভর্তি হয়ে এল উর্মিলা। আবার আগের মতো নিয়ম করে রোজ কলেজে যায়। সন্ধ্যেবেলা মাঝে মাঝে দিবানাথ আসে পড়াতে। উর্মিলার সঙ্গে কথা বলে সহজ-ভাবেই। কিন্তু কোথায় যেন একটা সাংঘাতিক পরিবর্তন হয়ে গেছে। উর্মিলা তেমন করে আর তাকাতে পারে না দিবানাথের দিকে। যেন একদিন একটা বিশেষ কিছু ছিল উর্মিলার—যার জোরে তখন তার নিজেকে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী বলে মনে হত। আজ সে আছে বটে যেমনকার তেমন কিন্তু তার সেই সম্পদের কিছুই যেন অবিশিষ্ট নেই। তাই দিবানাথ তার সামনে থাকলেও উর্মিলার ক্ষমতা নেই তাকে কাছে টানবার। দিবানাথ তাকে যেন ইচ্ছে করে দূরে সরিয়ে রাখে। তখন উর্মিলা ছটফট করে। সোজা কথাটা বুঝিয়ে দিতে চায় দিবানাথকে। কিন্তু ঠিক করতে পারে না কেমন করে আরম্ভ করবে।

সেদিন দিবানাথ সোজাসুজি প্রশ্ন করে উর্মিলাকে, অজয়কে একদিনও দেখি না, সে কি কলকাতার বাইরে গেছে?

ভিজে ঠাণ্ডা স্বরে উর্মিলা উত্তর দেয়, জানি না।

ঠিক বুঝেছি, দিবানাথ হেসে বলে, এর মধ্যেই ঝগড়া বাধিয়ে বসেছ?

হ্যাঁ, মাথা তুলে একটু উত্তেজিত হয়েই বোধহয় উর্মিলা বলে, এ ঝগড়া কোনদিনও মিটবে না। আমি সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে এসেছি।

হালকা ভাবেই দিবানাথ বলে, অজয়ের সঙ্গে তোমার যে সম্পর্ক তা একদিন ঝগড়া করলেই চুকে যেতে পারে না—

উর্মিলা বাধা দিয়ে বেশ জোরে বলে ওঠে, এক মুহূর্তে চুকে যেতে পারে। এমন অনেক কারণ ঘটতে পারে যার জন্যে কোন সম্পর্কই টিকে থাকতে পারে না, একটু থেমে মুখ নামিয়ে সে বল্লে, আর আমার স্বভাব আপনি তো ভাল করেই জানেন।

জানি বলেই তো বিশ্বাস করি তুমি এক কথায় সব কিছু ভেঙে চুরে চলে আসতে পারনা।

হ্যাঁ পারি। যা কিছুতেই থাকবে না সেই কৃত্রিম সম্পর্ক আমি লোকের খাতিরে বাঁচিয়ে রাখতে পারব না।

লোকের খাতিরে নয় উর্মি, তোমার নিজের জন্যেই তো অনেক কিছু বাঁচিয়ে রাখা দরকার—

অনেক কিছুর আগে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। অজয়ের বাড়িতে থাকলে আমি তা পারতাম না—

দিবানাথ সব শোনে। একটাও কথা বলেনা। আর এতদিন পর মনের যত জমা কথা উর্মিলা যেন উজাড় করে দেয়। তার লোভ তাকে মেরেছে। তার স্বার্থপরতা তাকে অপমানের বোঝা বহন করিয়েছে। সেই কথাটা স্বীকার করতে উর্মিলা সব চেয়ে আগে দিবানাথের কাছেই গিয়েছিল। নিজের মন আজ আর সংকীর্ণ নেই বলে তার হীনতার কথা বলতে বাধে না। সে ভুল করেছিল। কিন্তু আর ভুল করবে না। কারুর ক্ষমতা নেই তার জীবন ব্যর্থ করে দেয়। ও বাড়িতে বাস করলে তা হবার সম্ভাবনা বলেই সে বেরিয়ে এসেছে।

দিবানাথ বলে, রাগের মুখে অজয় একটা কঠিন কথা বলে ফেলেছে। তোমাকে সে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেই।

কিছুতেই পারবে না। আমি যাব না, হাতের খোলা বইটা বন্ধ করে দূরে ঠেলে দিয়ে উর্মিলা বলে, যার ওপর আমার একটুও শ্রদ্ধা নেই, সারাজীবন তার সঙ্গে শুধু ভানের ওপর ভরসা করে আমি কাটাতে পারব না, কিছুক্ষণের জন্যে সে চুপ করে থাকে, একটা কঠিন কথা সে আমাকে বলে নি, প্রত্যেকটি মুহূর্ত সে কঠিন করে তুলেছে—আমাকেও।

দিবানাথের মুখও উর্মিলার চোখে হঠাৎ যেন কঠিন হয়ে ওঠে। এ যেন তার অপরিচিত আর এক মানুষ। সে আবার ফিরে এসেছে শুনে আনন্দের একটা রেখাও কেন ফুটে উঠল না দিবানাথের মুখে? ভীত বিমূঢ় এক মূর্তি। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না উর্মিলা। মুখ নামিয়ে নেয়। নিঃস্ব রিক্ত মেয়ের মতোই তাকে বোধহয় মনে করছে দিবানাথ। কিন্তু কেন? যে ভুল সে করেছে তা সংশোধন করে নেবার ক্ষমতা কি তার নেই? শুধু একটা ঝড় বয়ে গেছে উর্মিলার জীবনের ওপর দিয়ে। কিন্তু কোন ক্ষতিই তো তার হয় নি। আর আজ ঝড়েরও কোন চিহ্ন নেই তার দেহে মনে। তবে কেন দিবানাথ তার দিকে তাকিয়ে দেখছে না আগের মতো করে।

সে চুপ করে থাকলেও উর্মিলা বলে, শুধু মার জন্যেই আমার ভাবনা। তিনি আমার কথা বুঝবেন না। শুধু শুধু দুঃখ পাবেন—

তুমি নিজেও কি দুঃখ পাওনি উর্মি?

পেয়েছি। তা হল আমার মিথ্যা অহঙ্কারের দুঃখ। কিন্তু আজ আমার কোন দুঃখ নেই। বরং কৃত্রিম বন্ধন কাটিয়ে আসতে পেরেছি বলে মুক্তির আনন্দ পেয়েছি।

শীত নেই। ফাল্গুনের হাওয়া দিয়েছে কয়েক দিন থেকে। সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে আজ একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। কিন্তু শীত লাগে না। আর দু-চারদিন পরেই গরম পড়ে যাবে। আজ সন্ধ্যার সিক্ত উষ্ণ বাতাসে অদ্ভুত মিষ্টি একটা ঘ্রাণ আছে। দুজনে দুদিকে বসে থাকে চুপচাপ। উর্মিলা দিবানাথকে দেখে এক দৃষ্টিতে। হঠাৎ দুজনেই যেন পড়াশুনোর কথা ভুলে যায়। এটা একটা ছল মনে করে দুজনের কথাই বোধহয় বন্ধ হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ পর উর্মিলা বলে, এমন ঝগড়া অনেক হয়। আবার দুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু আমার কথা আমি কাউকে বোধহয় কিছুতেই বোঝাতে পারব না—

আস্তে দিবানাথ বলে, আমি বুঝেছি।

যদি সত্যি বুঝে থাকেন তাহলে আমি জানি আপনি কোনদিনও আমাকে সেখানে আর ফিরে যেতে বলবেন না, দিবানাথের উত্তরের অপেক্ষা না করেই উর্মিলা বলে যায়, ওখানে ফিরে যাওয়া মানেই মৃত্যু। আমি মরতে চাই না। আত্মহত্যা করতে কে চায় বলুন?

কিন্তু অজয় যদি তোমাকে কোনদিন মর্যাদা দেয়? একদিন যদি সব সময় তোমার অভাব বোধ করে? কে বলতে পারে তার মনের পরিবর্তন হবে না?

বিদ্রূপের হাসি হেসে উর্মিলা বলে, না, হবে না। হলেও আমি মনে করব তা একটা ভান। লোকে যখন তাকে প্রশ্ন করবে—বন্ধু-বান্ধবরা জানতে চাইবে আমি কোথায়—তখন হয়তো সে আমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে আসবে—

তখন তুমিই বা বোঝাপড়া করবে না কেন?

আমার মনের সায় একেবারেই থাকবে না বলে। প্রাণের

তাগিদে যা করা যায় না আমি কারুর জন্যেই তা করতে পারব না—নিজের জন্যেও নয়।

কঠিন থেকে করুণ হয়ে ওঠে দিবানাথের মুখ। এবার সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে উর্মিলার চোখের দিকে। সে-দৃষ্টি ভাল লাগে না উর্মিলার। তার যেন আর কিছু নেই। সর্বস্ব খুইয়ে এক দুঃখিনী মেয়ের মতো সে যেন এসে দাঁড়িয়েছে দিবানাথের সামনে। কৃপার এমন বোবা দৃষ্টি উর্মিলার অসহ্য লাগে। তার কপাল ভাঙেনি। তার সব হারিয়ে যায় নি। সে নিজে যদি তার অতীত মনের জোরে নিশ্চিহ্ন করে থাকে তাহলে সে কথা ভেবে কেন দিবানাথের চোখ করুণ হয়ে উঠবে—কেন সে বুঝতে পারবে না তার মনের সূক্ষ্ম ভাবনাকে।

আজ থাক। এখনও সব কথা বলবার সময় হয় নি। দিবানাথ তাকে দেখুক দিনের পর দিন। তাহলেও যদি সে উর্মিলার ইঙ্গিত বুঝতে না পারে তখন সব ব্যবধান জোর করেই সে ঘুচিয়ে দেবে। নিজেকে এমন করে তুলবে যে আবার তাকে সেই আগের দৃষ্টিতেই দেখতে হবে দিবানাথকে। উর্মিলা তার প্রতীক্ষা করবে। যেমন করে কমলা জিতেন্দ্রনাথের প্রতীক্ষা করছেন—ঠিক তেমন করেই।

একটা কিছু আছে। সমস্ত সংসার জুড়ে শান্ত প্রতীক্ষার মধুর রূপ। গভীর শান্তি। সমবেদনার নিবিড় অনুরণন। এই বাড়িতে একমাত্র উর্মিলাই শান্তি পেত না। আর সকলেই শান্ত। সুশৃঙ্খল নিয়মের মধ্যে দিয়ে সকলে একসঙ্গে এগিয়ে চলেছে। উর্মিলার মতো একা ছিটকে বেরিয়ে যেতে চায় না কেউ। শিবেন আর বাণীকে সে দেখে নতুন চোখে।

খুব ভোরে সকলের চেয়ে আগে বাণীর ঘুম ভেঙে যায়। তখন অল্প অল্প অন্ধকার। রাস্তায় গরুর খুরের আওয়াজ। গয়লা কড়া নাড়ে। বাণী এসে দাঁড়ায় দরজার কাছে। সামনে দুধ দোয়া না হলে সে ঝগড়া করে গয়লার সঙ্গে। উর্মিলা বিছানায় শুয়ে তার গলার স্বর শুনতে পায়। আর ঠিক করে কাল সকাল থেকে সে-ও গিয়ে দাঁড়াবে তার বৌদির পাশে।

চাকরকে ঘুম থেকে তুলে বাণী উনুন ধরাতে বলে। না হলে চা খেতে দেরি হয়ে যায়। চাকরও বাজারে যেতে পারে না ঠিক সময়। আর শিবেন তখন রাগারাগি করে। না খেয়ে কলেজে বেরিয়ে যেতে চায়। যেন বাণীর জন্মেই রান্নার দেরি হয়েছে।

বাণী অভিমান করে বলে, একদিন দেরি করে গেলে কি ক্ষতিটা হয় শুনি? আমরা কি কখনও কলেজে পড়িনি? কই, প্রফেসারদের ঘোড়ায় চড়ে আসতে তো দেখিনি—

শিবেন রেগে বলে, একদিন নয়, আজকাল তো রোজই দেরি হয়—

বেশ, বাণী আরও রেগে যায়, কথা দিচ্ছি কাল থেকে সব ঠিক সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে। আজ ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখব—যেন রাত থাকতেই আমার ঘুম ভাঙে—

যা হয় কর, কাল দেরি হলে আমি সত্যি না খেয়ে বেরিয়ে যাব বলে দিলাম।

হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কথাটা তো অনেকবার শুনেছি।

উর্মিলা লক্ষ্য করে শিবেনের কলেজ থেকে ফেরবার সময় হলে আজও বাণী যত্ন নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রসাধন করে। বারবার দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। শিবেন এলে তাকে সামনে বসে

খাওয়ায়। যদি সময় থাকে তাহলে আজও ওরা একসঙ্গে বেড়াতে বার হয়। আর শিবেনের শরীর খারাপ হলে বাণীও বসে থাকে মুখ ভার করে। একটু বেশি রকম ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ডাক্তার ডাকবার জন্যে শিবেনকে সাধাসাধি করে।

বড় বাড়াবাড়ি কর, শিবেন থামিয়ে দেয় বাণীকে, কোন্ বাড়িতে আজকাল লোকে কথায় কথায় ডাক্তার ডাকে আমাকে বলতে পার?

অসুখ হলে কাকে ডাকতে হয় তাহলে?

শিবেন হাসে, আমি তো তোমাকেই ডাকি।

রসিকতা রাখ। বসে বসে ভুগছ—তা দেখতে আমার বুঝি খুব ভাল লাগে?

আমার কিছু হয়নি। শুধু একটু গা ম্যাজম্যাজ করছে।

আর বাণীর যেদিন জ্বর-জ্বর লাগে সেদিন শিবেনেরও চেহারা বদলে যায়। পড়াশুনোয় মন দিতে পারে না। তাড়াতাড়ি ফিরে আসে কলেজ থেকে। বাণীর মাথার কাছে বসে থাকে অনেকক্ষণ। ছাত্র পড়াবার দিন হলে ছল-ছুতো করে কাজে ফাঁকি দেয়।

চাপা স্বরে বাণী বলে, এমন কাণ্ড কর যেন আমি মরে যেতে বসেছি। ছি ছি, মা কি ভাববেন বল তো?

শিবেন হেসে বলে, উনিই তো আমাকে বললেন তোমার সেবা করতে। পরের বাড়ির মেয়ে তুমি—এখানে এসে কষ্ট পেলে লোকে বলবে কি?

চুপ কর। উর্মি এখানে আছে খেয়াল নেই?

শিবেন উত্তর দেবার আগেই উর্মিলা এসে ঢোকে সে-ঘরে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ইতস্তত করে। হঠাৎ ফিরে যেতেও বেধে

যায়। বাণীর খবর নিতে এসেছিল সে। হয়তো শিবেনকে এ ঘরে আশা করেনি। ঊর্মিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে দাদা আর বৌদিকে।

এস এস, আরে আমার কিছুই হয়নি, বাণী উঠে বসে বলে, সকলে মিলে এমন করছে যেন আমার আয়ু আর কয়েক ঘণ্টা—

কি বল বৌদি, উষ্ণস্বরে ঊর্মিলা বলে, বেশ জ্বর ছিল তোমার বিকেলবেলা তবুও তো রান্নাঘরে গিয়েছিলে তুমি।

বাণী ইসারায় ঊর্মিলাকে চুপ করতে বলে কিন্তু শিবেনের লক্ষ্য এড়ায় না। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, নিজের ভালও বুঝতে পারনা. কি আর বলব তোমাকে বল। এমন আশ্চর্য স্বভাবের মেয়ে আমি কখনও দেখিনি—

আরে শুধু এক মিনিটের জন্যে গিয়েছিলাম—

শিবেন রেগে যায়,—কেন? তুমি রান্নাঘরে না গেলে সংসার অচল হয়ে যেত নাকি? এত কাজ আমার এখন, কেন ইচ্ছে করে অসুখ ডেকে আন বুঝতে পারিনা। তোমাদের জন্যে কাজকর্ম না করে হাত গুটিয়ে শুধু বাড়িতে বসে থাকতে হবে দেখছি, শিবেন কথা শেষ করে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আর ঊর্মিলার দিকে তাকিয়ে বাণী হাসে।

ঊর্মিলা বসে থাকে বাণীর খাটের ওপর। নিষ্প্রভ ঠাণ্ডা মুখ। মাথাটা ধরে আছে। গরম লাগছে। খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে এলে শরীরটা হালকা হয়ে যেত। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে বাণীকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। নিবিড় অন্তরঙ্গতার উষ্ণ স্পর্শ আছে এখানে। তারই স্বাদ মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করছে ঊর্মিলা।

ছোট ঘর। ঠাণ্ডা দেওয়াল। ঐশ্বর্যের ঝলমলানি নেই। আসবাবের প্রাচুর্য নেই। কিন্তু একটা কিছু আছে বাণীর মতো সাধারণ মেয়ের, যার জোরে শিবেনের মতো সাধারণ ছেলের সঙ্গে ঘর করে ওরা দুজনেই অসাধারণ হয়ে উঠতে পেরেছে। উর্মিলা কথা বলতে পারে না। বাণীর একটা হাত শক্ত করে ধরে চুপচাপ বসে থাকে।

কি হয়েছে উর্মি?

কিছু না।

একটা কিছু যে হয়েছে সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকলেও বাণী আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না। চঞ্চল উর্মিলা শ্বশুর বাড়ি থেকে ফিরে একেবারে যেন জুড়িয়ে গেছে। তার পরিবর্তন এত আকস্মিক আর অবিশ্বাস্য যে সে অবাক হয়ে যায়। কৌতূহল হয়, সমবেদনা জাগে কিন্তু কিছু বুঝতে পারে না। সে জানে যে কমলা প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পাননি।

বোধহয় দিবানাথ এসেছে নিচের ঘরে। উর্মিলার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিম্বা শিবেনের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে—কে জানে। কোন কথা না বলে উর্মিলা উঠে দাঁড়ায়। যন্ত্রের মতো আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসে। শিবেন নেই। দিবানাথও আসেনি এখনও। একটা বই হাতের কাছে টেনে নেয় উর্মিলা। মন দিতে পারে না। বারবার বাইরে তাকায়। দিবানাথের প্রতীক্ষা করে।

অন্ধকার নামছে। এইমাত্র রাস্তার আলো জ্বলে উঠল। বড় রাস্তা দিয়ে একটার পর একটা মোটর গাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু বাইরে তাকাতে ইচ্ছে করে না উর্মিলার। ক্লান্তি আসে। অনুভূতি যেন কমে গেছে। চারপাশে কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ছাড়া ছাড়া

ভাব। খোলা বই পড়ে থাকে টেবিলের ওপর। এক লাইনও পড়তে পারে না সে।

দিবানাথ আসে ঠিক সময়। জানতে চায় উর্মিলা কেমন আছে। চেয়ার টেনে বসে পড়ে রোজকার মতন। জিজ্ঞেস করে না, কেন বিষণ্ণ দেখায় তাকে। যেন সে নিজেই বুঝে নেয় কি কারণে অদ্ভুত উদাসীনতার ছায়া নেমেছে তার মুখে। উর্মিলা কিছু বলতে গেলেই জোর করে তাকে বুঝিয়ে দেবে যে অজয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে এসেছে বলেই সে ভেঙে পড়েছে এমনভাবে।

উর্মিলার চোখ দুটো আস্তে আস্তে হিংস্র হয়ে ওঠে। বইটা জোরে দেয়ালে ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে করে। একটা বিকট শব্দ হোক। বাড়িটা কাঁপুক। আর চমকে উঠুক দিবানাথ। একবার স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখুক উর্মিলার দিকে। অজয় নেই কোথাও। তার যন্ত্রণা অজয়ের জন্যে নয়। সে-কথাটা আজ কেন বুঝতে পারে না দিবানাথ? প্রথম জীবনে তাকে যেমন করে দেখেছিল—আজ কেন আসতে পারে না তেমন করে? আজ উর্মিলা শুধু তাকেই দেখছে—আর কিছু নয়। অর্থ নয়, রূপ নয়, অট্টালিকা নয়—শুধু একটি শান্ত ধীর মানুষকে সে চায় একান্ত আপনার করে। সে-কথাটা যতই বোঝাতে চায়, দিবানাথ বুঝতে পারে না। শুধু কঠিন হয়ে ওঠে।

দিবানাথের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। শিক্ষকের নীরস ভঙ্গিতে দর্শনের একটা জটিল অধ্যায় সে ব্যাখ্যা করে যায়। খেয়াল করে না উর্মিলা শুনছে কি-না। বোধহয় তার মুখের দিকে তাকাতে সে ভয় পায়। কোন কথা উর্মিলার কানে যায় না। বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে মুখে। কিন্তু থামে না দিবানাথ।

একসময় বাধা দিয়ে উর্মিলা বলে ওঠে, আজ ভাল লাগছেনা—

দিবানাথ সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়, তবে থাক।

যেন আর কোন কথা বলবার নেই। সামান্য কৌতূহল প্রকাশ করাও বোধহয় আজ অপরাধ। উর্মিলার কি করতে ইচ্ছে করছে সে-কথাটাও যেন জিজ্ঞেস করবার অধিকার নেই তার। উর্মিলা প্রস্তুত হয়ে নেয়। যদি দিবানাথ কোন উপদেশ দিতে যায় তাহলে সব সঙ্কোচ ঘুচিয়ে দেবে এই মুহূর্তে। কিন্তু না, দিবানাথ একটা কথাও বলেনা। আপন মনেই বইএর পাতা ওল্টায়। নিজেই কোন একটা নতুন অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বোঝবার চেষ্টা করে।

উর্মিলা জিজ্ঞেস করে, এখান থেকে আপনি কোথায় যাবেন ?

সোজা বাড়ি। কেন বল তো ?

ভাবছিলাম একটু ঘুরে এলে হত। মাথাটা খুব ধরেছে। আজ একবারও বাড়ি থেকে বার হইনি—

বেশ তো। আমি এখুনি উঠব। যাও, তুমি ঘুরে এস—

বাধা দিয়ে উষ্ণস্বরে উর্মিলা বলে, এত রাতে আমি একা-একা বাইরে বার হব নাকি ? থাক, আপনাকে যেতে হবেনা।

ভীত স্তিমিত স্বর দিবানাথের, কোথায় যেতে চাও ?

চুলোয়। না না আপনাকে যেতে হবে না। আমি একাই যাব।

দিবানাথ হেসে বলে, তোমার মেজাজ ঠিক তেমনি আছে দেখছি। চল কোথায় যাবে। আমিও যাচ্ছি সঙ্গে—

যাবেন ? ভয় করবে না ?

কিসের ভয় ?

আপনিই জানেন, কথাটা বলে ফেলে উর্মিলা ওপরের ঘরে চলে যায় তৈরি হয়ে নিতে। দিবানাথ বসে আছে টেবিলের ওপর

দুই হাত রেখে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।' একটা ভয় আছে তার মনে নিশ্চয়ই। বুঝতে না পারার ভান করলে কি হবে, উর্মিলা জানে কোথায় তার ভয়।

মুখ ধুয়ে সে শাড়িটা বদলে নেয়। আয়নার সামনে ইচ্ছে করেই একটু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। কপালের কয়েকটা রেখা স্পষ্ট হয়েছে। শীর্ণ মুখ। চোখের কোন ভাষাও যেন আর নেই। জোর করে নিজেরই আঙুলের কঠিন স্পর্শে সে আগেকার রূপ ফিরিয়ে আনতে চায়।

না না, উর্মিলার চোখের ভুল। কোন পরিবর্তন তার হয়নি। অকারণ উত্তেজনা তার সব কিছু গোলমাল করে দিচ্ছে। দিবানাথের ওপর হঠাৎ অসন্তুষ্ট হবার তার নিজের কোন অধিকার নেই এখন। আর তাকে সে এখনও তার অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়নি। উর্মিলা যেমন একটা বিশেষ জায়গায় থাকেনি তেমনি দিবানাথও হয়তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। তাই তাকে আবার নতুন করে পরিবেশ রচনা করতে হবে। যা ঝরে গেছে, আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে তা ফুটিয়ে তুলতে হবে। মনগড়া একতরফা অধিকার নিয়ে অধীর হয়ে উঠলে নিজেকে আবার স্বার্থপর প্রমাণ করা হবে আর একজনের কাছে।

আপনি আমাকে কি ভাবেন জানিনা, লেকের কাছে টানা চওড়া রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে উর্মিলা বলে দিবানাথকে, কিন্তু কয়েকদিন ধরে মনে মনে আমি জ্বলে যাচ্ছি—

দিবানাথ কথা বলে না। চলার গতি হ্রাস করে দেয়। হাওয়ার জোর আছে এদিকে। উর্মিলার সব কথা সে শুনতে পায় কি-না মুখ দেখে বোঝা যায় না। মাথার ওপর নীল আলো জ্বলছে।

পায়ের তলায় তাজা সবুজ ঘাস। আশে-পাশে অনেক মানুষের ভিড়। হয়তো ভয় পায় দিবানাথ।

উর্মিলা বলে, মনের বিলাসে আমি কষ্ট পাচ্ছি না, সে থেমে যায়। হাওয়ায় কপালের ওপর উড়ে পড়া চুল হাত দিয়ে ঠিক করে নেয়।

দিবানাথ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন কষ্ট পাচ্ছ উর্মি?

কারণ জীবনকে দেখেছিলাম বিকৃত করে। সে-লজ্জার কথা আজ আপনাকেই শুধু বলতে পারছি, বোধহয় মনে মনে ভাষা সাজিয়ে নেয় উর্মিলা, অজয় আমার সব অভাব ঘুচিয়ে দিয়েছিল। আমি যা চেয়েছিলাম সবই তো পেয়েছিলাম তার কাছ থেকে—

দিবানাথ হেসে বলে, জানি।

আমিও ইচ্ছে করলে যা খুশি করতে পারতাম। খুব সহজেই রুকি বুকির মতো হয়ে উঠতে পারতাম। কিন্তু পারলাম না। হঠাৎ একদিন দেখলাম অজয় আমাকে কিছুই দিতে পারেনি। আর তার মনের গঠনটাই এমনি যে আমি যা চাই তা দেবারও ক্ষমতা তার নেই। এখন আমি কি করব বলতে পারেন?

পড়াশুনো তো আরম্ভ করে দিয়েছ উর্মি—

দিয়েছি। হ্যাঁ, দেখবেন আমি ঠিক পাশ করব। তারপর আপনিই আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবেন। কিন্তু তার আগে আমার হিসেবে যে-ভুল হয়েছিল তার জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার ভুল সংশোধন করে দেবারও চেষ্টা করবেন—

দিবানাথ আস্তে বলে, করব।

আপনাকে দুঃখ দিয়েছি কি-না জানি না, তবে অভদ্রের মতো ব্যবহার করেছি ভেবে আজ জ্বলে যাই। এই কথাটা

বলতেই সেদিন আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম কিন্তু কিছুই বলতে পারিনি—

আমি সব বুঝি ঊর্মি, তোমাকে কিছুই বলতে হবে না।

তাহলে এত ভয় পান কেন? কেন আমার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারেন না? দিবানাথকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে ঊর্মিলা বলে যায়, কাকে আপনার ভয়? অজয়কে? তার সমাজকে? একটু থামে সে। অপ্রকৃতস্থ অবস্থা সামলে নিয়ে হেসে বলে, না, ভয় করবার কিছু নেই। আমি যাদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম, তাদের আর যা-ই থাক—একটুও সাহস নেই।

আমি সব জানি, চলতে চলতে ঊর্মিলার দিকে দেখে দিবানাথ, ভয় আমার কাউকেই নয়—ভয় শুধু তোমাকে।

ঊর্মিলার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। দিবানাথের কথায় একটা ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে। তা বুঝতে দেরি হয় না তার। অন্য কোন প্রশ্ন করতেও সঙ্কোচ হয়। ঊর্মিলাকেই দিবানাথের ভয়। যদি আবার সে তাকে অপমান করে—যদি আবার দূরে ঠেলে দেয়। সেই ভয়ে দিবানাথ যেন অটুট গাম্ভীর্যের একটা কঠিন আবরণ ছড়িয়ে রেখেছে তার মুখের চারপাশে।

ঊর্মিলা বলে, আমাকে আপনার আর ভয় করতে হবে না। সব বোঝাবুঝির পালা শেষ হয়ে গেছে—সব দ্বন্দ্ব চুকে গেছে।

আর একটু বোধহয় বাকি আছে, দিবানাথ থেমে থেমে বলে, অজয়ের একটা রূপই তুমি দেখেছ কিন্তু আর একটা দিক তুমি দেখতে পাওনি—

ঊর্মিলা দিবানাথকে থামিয়ে দেয়, আমি তার আর কিছু দেখতে চাইনা—এতদিন ধরে অনেক দেখেছি—

কিন্তু আরও একটা রূপ আছে তার—দীন করুণ একটা রূপ। একসময় সেটা তোমার চোখে পড়বেই।

অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। রাত অনেক হল। এবার ফিরতে হবে। কিন্তু উর্মিলার ফিরতে ইচ্ছে করছে না। খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এসে তার মাথা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বুকের ভারী পাথরটাও যেন নড়ে উঠেছে। এবার বোধহয় সত্যিই সে পড়াশুনোয় মন দিতে পারবে। জীবনকে দেয়াল ঘেরা ছোট ঘরের মধ্যে ধরে না রেখে ছড়িয়ে দিতে পারবে অনেক দূর অবধি। আর দিবানাথের মতো অবিচল ব্যক্তিত্বে নিজের কাজ নিয়ে ও মেতে উঠতে পারবে।

উর্মিলাকে চুপ করে থাকতে দেখে দিবানাথ আবার বলে, অজয়ের দৈন্য তোমার চোখে পড়েনি বলেই তুমি উত্তেজিত হয়ে আছ—তোমার সব কিছুর মধ্যেই জ্বালার ছাপ রয়েছে—

না আর কিছু নেই, দিবানাথের কথার মাঝে উর্মিলা বলে ওঠে, অজয়ের কোন রূপই আমি আর দেখতে পাব না। যা-ই হোক না কেন, আমার মনে আর কোন দাগই পড়বে না, সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির পথ ধরে, আপনি নিজের কাজ নিয়ে যেমন সব ভুলে থাকেন—সকলের সব অন্যায় সহ্য করেন—আমিও ঠিক তেমনি করেই চলতে পারব, কথা শেষ করে উর্মিলা নিজের কথার অর্থ সংশোধন করে দেয়, আমি কাউকে ভুলে থাকবনা, কারণ আপনি বিশ্বাস করুন, আমার জীবনের একটা কলঙ্কিত অধ্যায় আমি মন থেকে একেবারে মুছে দিয়েছি। ঠিক আগের মতো হয়ে আমি আবার এ বাড়িতে ফিরে এসেছি।

একটু তাড়াতাড়ি পা চালায় দিবানাথ। রাত অনেক হয়েছে। শিবেনকে বলে আসা হয়নি আর কমলাও জানেন না যে উর্মিলা

তার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে। বিচলিত হয়ে পড়ে সে। ঊর্মিলা দিশাহারা হয়ে পড়েছে বলে তার হয়তো আজকাল কোন-দিকে খেয়াল থাকে না। আর তার স্বভাব এমনি যে কিছু মনে করিয়ে দিতে গেলেই অসন্তুষ্ট হয়। নিরুপায় দিবানাথ তাকে সঙ্গে নিয়ে জোরে জোরে পথ চলে।

যতীন দাস রোডের মোড়ে এসে রাস্তার একটা আলোর তলায় সে দাঁড়ায়। তারপর ঘড়ি দেখে চমকে ওঠে, ঊর্মি, দশটা বেজে গেছে যে—

রাস্তায় দাঁড়িয়ে হেসে ওঠে ঊর্মিলা, তাতে কি হয়েছে? আপনি এত ভীতু হয়ে গেলেন কবে থেকে বলুন তো?

ভয়ের কথা নয়, এত রাত অবধি তোমাকে না দেখতে পেলে মাসিমা ভাববেন তাই বলছি—

আপনার সঙ্গে বার হলে কবে মাসিমা ভেবেছেন? ঊর্মিলা হেসে বলে, অত ভয় পাবেন না। কাল আসবেন, সে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। একবার পিছন ফিরে দেখে দিবানাথকে।

আজও কমলা বসে আছেন বসবার ঘরে। পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেন। ঊর্মিলার হাত ধরে তাকে টেনে ভেতরে নিয়ে আসেন। মার চেহারা দেখে ঊর্মিলা চমকে ওঠে। আজ আবার কি হল বুঝতে পারে না। কমলার চোখে-মুখে বিরক্তির রেখা। অস্বাভাবিক উত্তেজনায় তিনি কাঁপছেন।

তুই কি আরম্ভ করেছিস ঊর্মি? তোকে নিয়ে আমি কি করব বলতে পারিস? তুই আমায় শান্তিতে মরতে দিবি না দেখছি—

মার কথা শুনে ঊর্মিলা যেন কাঠ হয়ে যায়। রুক্ষ গলার স্বর কমলার। কে জানে কি হয়েছে। কিন্তু এমন কঠিন কথা শুনতে

উর্মিলার ভাল লাগে না। নিজেকেই নিজে ধিক্কার দেয়। স্বাধীন-ভাবে তার বাস করবার একটা জায়গা নেই সে-কথাটা ভেবে অসহায় বোধ করে। মার হাত ছাড়িয়ে কাছের চেয়ারটায় সে বসে পড়ে। হঠাৎ নিজেকে তার বড় ক্লান্ত মনে হয়। এখনও পাখা চালাবার সময় হয়নি কিন্তু মাথার ওপর পাখাটা খুব জোরে চালিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

অজয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছিস, কমলা নীরস স্বরে বলে যান, আমাকে সেকথা বলিসনি। কলেজে ভর্তি হলি, দিবা-নাথের সঙ্গে রাত দুপুরে বেড়িয়ে ফিরলি—কেন বুঝিস না যে যা খুশি তাই করে চললে লোকে দুর্নাম দেয়?

উর্মিলা চুপ করে বসে থাকে। কমলাকে উত্তরে কিছু বলতে পারে না—ইচ্ছেও করে না। কিন্তু তাঁর কথা শুনে একটু মজা পায় যেন। দিবানাথ আজ তাঁর চোখে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। উর্মিলাকে নিয়ে কোথাও যাবার অধিকার তার আর নেই। মার কথা শুনে হাসি পায় উর্মিলার। তার আশে-পাশের প্রত্যেকটি মানুষকে ভীষণ রকম অসহায় মনে হয়। একটা নিয়মের দড়িতে সকলেই যেন বাঁধা আছে। যতই যন্ত্রণা হোক, সে-বাঁধন আলগা করা চলবে না। কিছুদিন আগে দিবানাথের সঙ্গে এত রাতে ফিরলে কমলা খুশি হতেন—উৎসাহ দিতেন। কিন্তু আজ উর্মিলা নিয়মের দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারছে বলে তিনি ভয় পাচ্ছেন। কমলার উত্তেজনা যতই প্রবল হোক উর্মিলা তার ভয়কেই স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে। আর তা পারছে বলেই একটা নতুন রকম কৌতুকের স্বাদও অনুভব করছে।

উর্মিলা বলে, এই তো কাছেই গিয়েছিলাম, মার রাগ দেখে

সত্যিই সে হাসে এবার, কে আবার দুর্নাম দেবে? আজে-বাজে কথা ভেবে তুমি বড় বেশি মাথা ঘামাও না—

থাম, কমলা একটু জোরেই বলে ওঠেন, আমাকে তুই আর কিছু বোঝাতে আসিস না। কি কাণ্ড করে তুই ও বাড়ি থেকে চলে এলি বল তো? জীবনটা ছেলেখেলা পেয়েছিস নাকি? মতি বেয়ারা এসেছিল একটু আগে। আমাকে সব কথা বলে গেছে। ছি ছি, তোর জন্যে আমারই এখন লজ্জা করছে। অজয় আমাদের কি ভাববে বল তো?

মতির নাম শুনে উর্মিলা চমকে ওঠে না। নিশ্চিন্ত হয়। যদিও সে জানে মতির পক্ষে কমলাকে আগাগোড়া সব কথা বলা সম্ভব নয়, তাহলেও তিনি যে অনেকখানি শুনেছেন সেকথা মনে করেই সে খুশি হয়। এখন উর্মিলা সহজেই তাকে বাকিটা বলতে পারবে। কিন্তু সে দিবানাথকে যতটা বলেছে কমলাকে ততটা বলবে না—তর্ক করে এই মুহূর্তে তাঁকে জোর করে কিছু বোঝাতেও যাবেনা। অজয়ের সঙ্গে যে তার সাংঘাতিক রকম একটা গোলমাল হয়েছে এখন তিনি শুধু সেইটুকুই জেনে রাখুন।

উর্মিলা বলে, তুমি যদি আমাকে থাকতে না দাও, বল বেরিয়ে যাই? কিন্তু ও বাড়িতে গিয়ে ওদের সঙ্গে আমি আর কোনদিনও থাকতে পারব না—

বাধা দিয়ে কমলা চিৎকার করে ওঠেন, তার মানে? উর্মি ভুলে যাস না তুই এখন আর ছেলেমানুষ নেই। ওখান থেকে এমন করে চলে আসবার কোন অধিকার তোর আর নেই—

কেন থাকবে না মা? সংযতস্বরে উর্মিলা বলে, অপমান সহ্য করে কোথাও থাকবার শিক্ষা তুমি তো আমাকে কোনদিনও দাওনি—

কি বুঝিস তুই মান-অপমানের? স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় ওসব বড় বড় কথা আসতেই পারে না, ঝাঁজালো স্বরে কমলা বলেন, আমি তোকে বারবার বলছি এমন করে তুই নিজের পায়ে কুড়ুল মারিস না—

আমার জন্যে তুমি ভেবনা মা—

তবে কে ভাববে শুনি? এতটুকু বুদ্ধি তোর নেই, কমলা এক সুরে বলে যান, এমন করে কেউ কখনও চলে আসে? মতি বলল যে অজয়ের বাবার খুব অসুখ। বাঁচে কি-না ঠিক নেই। আর অজয় যদি হঠাৎ একদিন এখানে আসে তাহলে কি দেখবে? তিনি নিজেই নিজের কথার উত্তর দিয়ে দেন, তার স্ত্রী আর একজনের সঙ্গে বেড়িয়ে রাতদুপুরে বাড়ি ফিরছে—

মার ওপর উর্মিলা অসন্তুষ্ট হয়। তাঁর মুখে এ ধরনের কথা শুনতে ভাল লাগে না। সে ভেবেছিল সব শুনে তাকে দোষ দিয়ে তিনি বলবেন যে নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করলে সকলেরই এমন অবস্থা হয়। কিন্তু সে-সব কথা না তুলে কেন তিনি বারবার দিবানাথের নাম করছেন সে বুঝতে পারে না।

উর্মিলা বলে, তার সঙ্গে আমি আগেও বেড়িয়ে ফিরতাম মা। তখন তোমরা তো রাগ করতে না—

এসব কথা বলতে তোর লজ্জা করছে না? ছোট মেয়ের মতো কথা তুই আমাকে আর শোনাস না, কমলা এদিকে-ওদিকে কিছুক্ষণ উন্মাদিনীর মতো ঘোরাঘুরি করে বলেন, শ্বশুরবাড়ির জন্যে একটুও ভাবনা নেই তোর। কালই আমি অজয়ের সঙ্গে দেখা করে তোর হয়ে ক্ষমা চাইব। ছি ছি, আমার নাম ডোবালি তুই—

তুমি কখনও কারুর সঙ্গে দেখা করবে না মা, মার মুখের দিকে

চোখ রেখে দৃঢ়স্বরে উর্মিলা বলে, আমি না থাকলে তাদের কিছুই যায় আসেনা, কমলার একটা হাত শক্ত করে ধরে সে, আমি নিজে ওদের কাছে অনেক ছোট হয়েছি। কিন্তু তোমাকে কিছুতেই মাথা নিচু করতে দেবনা।

তুই এভাবে এখানে থাকলে বুঝি আমার মাথা খুব উঁচু থাকবে?

হ্যাঁ, একটু চুপ করে থেকে উর্মিলা বলে, আমি তোমার কাছ থেকেই মাথা উঁচু করে থাকতে শিখেছি মা—

ভুল কথা। সারাজীবন আমি সকলের কাছে ছোট হয়ে আছি। আমি তোর হাতে ধরে বলছি উর্মি, তোরা আমাকে লোকের কাছে আরও ছোট করে দিস না। তোরা তো জানিস, আমার বেলায় নিজের কোন হাত ছিল না। তুই বল, যেমন করে যত শীগগির পারিস অজয়ের সঙ্গে সব ঝগড়া মিটিয়ে ফেলবি? ওখানে ফিরে যাবি?

মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে উর্মিলা থেমে থেমে বলে, যদি ও আমাকে তেমন করে নিতে আসে তাহলে নিশ্চয়ই যাব মা।

আমি জানিনা তোদের কি গোলমাল হয়েছে—কিন্তু যা-ই হোক না কেন, তুই সব ঠিক করে না নিলে আমি মরে যাব উর্মি—

মার চেহারা দেখে ভয় পায় উর্মিলা। মেয়ের কথা ভেবে নিজের ব্যর্থতার দুঃখ বোধহয় দ্বিগুণভাবে নতুন করে আবার তিনি অনুভব করছেন। উর্মিলার জেদ ব্যক্তিত্ব মান-অপমানবোধ সবই যেন তাঁর চোখের জলে ঢেকে যায়। সমবেদনার মৃদু সূক্ষ্ম একটানা অনুরণন তাকে যেন হঠাৎ আর এক নতুন মানুষ করে তোলে। মার মনে দুঃখ দিয়ে কোন কাজই করতে ইচ্ছে করে না।

সব ব্যাপারটা সহজ করে দেবার জন্যে হালকা হাসি হেসে সে

বলে, তুমি এখনও খাওনি মা? কটা বাজে খেয়াল আছে? আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি?

ওপর থেকে চটির শব্দ করতে করতে শিবেন নেমে আসে। এখনও খাবার ডাক না আসার কারণ জানতে চাইবে নিচে নেমেই। তার পায়ের শব্দ শুনে কমলা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলেন। উর্মিলার হাত ঠেলে তাকে দূরে সরিয়ে দেন। খুব জোরে ধাক্কা দেননা কমলা, কিন্তু উর্মিলা মনে মনে একটু বেশিরকম আঘাত পায়। মা যে এবার তার কাছ থেকে সত্যিই দুঃখ পেয়েছেন সে-কথা বুঝতে পেরে বুক ঠেলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

পথ নিঝুম হয়ে গেছে। রাস্তার ওপারে ছোট পানের দোকানটায় টিমটিমে বাল্‌বটা এখনও জ্বলছে। আর হাওয়ায় চিত্র-তারকার ছবিওলা পুরনো ক্যালেণ্ডারটা দুলছে। জানলা দিয়ে বুড়ো পান-ওলার চেহারা স্পষ্ট দেখতে পায় উর্মিলা। উত্তেজনার একটা রেখাও নেই মুখে। মাথা তুলে তাকিয়ে দেখছেনা কোনদিকে। এখনও হাত চলছে সমানে। এত রাতে আর কত খদ্দের আসবে তার। পানের দোকানের পাশে দীর্ঘ তালগাছটার পেছনে নিষ্প্রভ চাঁদ আস্তে আস্তে নিজেকে ফোটাচ্ছে। কবে পূর্ণিমা হয়ে গেছে উর্মিলা জানে না। জানবার কোন আগ্রহও নেই। একটা কুকুর ডেকে ওঠে হঠাৎ। কর্কশ ক্লান্তিকর চিৎকার। তারপরই কুলপি বরফ-ওলার ভারীগলার ঝিমোনো ডাক। খাবার ইচ্ছে না থাকলেও মা আর দাদার সঙ্গে উর্মিলা খাবার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ায়। বাণী আজ নিচে নামতে পারবে না। তার জন্যে দুধ-সাবু বোধহয় অনেকক্ষণ আগেই ওপরে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

শেষ চৈত্রের ঝড়ের মতো ভাবনা আসে ধুলোর ঘূর্ণি উড়িয়ে। সেই এক ভাবনা। কি আছে আর কি নেই। কি ছিল আর কি হারিয়েছে। কি চেয়েছিল আর কি পায়নি। নিজেকে রীতিমতো দুর্বল মনে হয় উর্মিলার। ক্লান্ত অবসন্ন বৃদ্ধার মতো। সব যেন শেষ হয়ে গেছে। কিছুতেই মন লাগে না। ভারী এলোমেলো একটা ব্যর্থ জীবন এড়িয়ে গড়িয়ে শুধু হাঁপাচ্ছে। কোন উদ্দেশ্য নেই। কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। অকারণ এক জেদ, ভয়ঙ্কর এক রুদ্ধ আক্রোশ তিল তিল করে শুধু নিজেকেই ক্ষয় করছে। দিবানাথের কৃপাদৃষ্টি, কমলার যন্ত্রণা আর দাদা-বৌদির বিরক্তি উর্মিলার সব কিছুই যেন গোলমাল করে দিচ্ছে। সকালে ঘুম ভাঙবার পর উঠতে ইচ্ছে করে না। দুপুরে কলেজে গিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে। আর সন্ধ্যেবেলায় দিবানাথ এলে মনের মধ্যে অদ্ভুত এক অস্বস্তি দানা বাঁধতে থাকে। যে তেজ নিয়ে সে অজয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল এই অল্প সময়ের মধ্যে তার কিছুই যেন অবশিষ্ট নেই। বিষাক্ত একটা কীট দংশন করে-করে তার চেহারা রুক্ষ করে দিয়েছে। প্রাণশক্তিও থিতিয়ে দিয়েছে। মাধুর্যের রেশ নেই কোথাও।

দিবানাথ তাকে এমনভাবে ফিরে আসতে দেখে যে খুশি হয়নি সেকথা বুঝতে আজকাল উর্মিলার দেরি লাগেনা। হয়তো তার মনের কথা বুঝতে পেরে তাকে করুণা করে—অজয়ের দীন করুণ রূপের কথা বলে তাকে ফেরাতে চায়। এখন তাকে ভয় করে দিবানাথ। কিসের ভয়? ঘর ভাঙার? যে-মেয়ে ঘর ভেঙে বেরিয়ে এসেছে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার সাহস করে কোন পুরুষ?

নিজের মান বাঁচাবার জন্যে আর সুখ ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে বলে একদিনও তো সে তার প্রশংসা করেনি। যেন উর্মিলার মান-সম্ভ্রম কিছু নয়। সব কিছু সহ্য করে ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে এমন একজনের সঙ্গে জীবন কাটাতে হবে যে তাকে দেখবে হীন চোখে। শুধু করুণা করবে।

কমলা উর্মিলার সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারেন না আজকাল। হাসি আসে না তাঁর মুখে। কিন্তু তাঁর কাজের কামাই নেই। যন্ত্রের মতো ঘাড় গুঁজে রোজই তিনি কাজে বেরিয়ে যান। আর ছুটির দিনে যখন বাড়িতে থাকেন তখন এক কোণে বসে আপন মনেই কাঁদেন। এ কান্নার অর্থ বোঝে উর্মিলা। শুধু নিজের জন্যে তিনি কাঁদেন না। নিজের দুঃখ এতদিনে তিনি মেনে নিয়েছেন আর দুঃখ সহ্য করবার এক অলৌকিক ক্ষমতা এসে গেছে তাঁর। মেয়ের জীবন তাঁরই মতো হতে চলেছে দেখে তিনি দুঃখ পান।

মাকে কিছু বোঝাতে পারেনা উর্মিলা। তাঁকে বলতে পারে না যে দিনকাল আর আগের মতো নেই। আজকালকার মেয়েদের জীবন কথায় কথায় ব্যর্থ হয়ে যায় না। উর্মিলাকে তার মার মতো করে দিন কাটাতে হবে না। কিন্তু কমলার মুখ দেখে সে তাঁকে কিছু বলতে পারে না। তিনি তাঁর কোন কথা শুনতে চাননা। জানতে চাননা কার দোষ। তার না অজয়ের ?

শিবেন আর বাণী অজয়ের নাম করেনা উর্মিলার কাছে। কোন উপদেশ দেয় না তাকে। কিন্তু সে বুঝতে পারে তার পায়ের শব্দও আজকাল এদের অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই সকলের ওপর উর্মিলা বিশ্বাস হারায়। তার চারপাশে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের সব কিছুকেই বিরাট ভান বলে মনে হয়। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায়

হোক, বাঁধা ছকে মিলিয়ে মিলিয়ে পা ফেলে প্রত্যেকে। একটু এদিক-ওদিক হলেই তাল কেটে যায়। সেই কারণে সকলেই সতর্ক—সকলেই ভীত।

দিবনাথের ভয়ই উর্মিলাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত দেয়। নিজের সঙ্গে কারুর মিল সে খুঁজে পায় না। মনটা হঠাৎ তেতো হয়ে ওঠে। মনে হয় সব মিথ্যা। আজকের সব বন্ধন—সব ভালবাসা—সব নিয়ম-কানুন। যেন সে একাই একথাটা বুঝতে পেরেছে। নিজের সমস্যার সমাধান উর্মিলা নিজেই করে নেয়। যা মিথ্যা তা নিয়ে সে শুধু শুধু দুঃখ পাবে কেন। তার চেয়ে অনেক বড় কিছু নিয়ে সে ভাবুক। এমন কোন ভাবনা—কাজের এমন কোন ধারা যা তার পরিধি আরও অনেক বাড়িয়ে দেবে। মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরবার জন্যে দিনের পর দিন নষ্ট করেছে মনে করে নিজেকে ক্ষমা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে।

যদি আজকের সব কিছু মিথ্যা না হবে তাহলে অজয়ের মতো একটা মানুষের রাতারাতি অমন আশ্চর্য পরিবর্তন হবে কেমন করে! তার নিজের আকাঙ্খার রূপটাই বা একেবার বদলে যাবে কেন! সব কথা সকলকে বলা যায় না—দিবানাথকেও নয়। কিন্তু যেটুকু বাকি ছিল তা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে যেদিন সে ও বাড়ি থেকে চলে আসে সেদিন। অজয়কে জানিয়ে দিয়েই এসেছিল উর্মিলা। কিন্তু সে স্পষ্ট দেখেছে তার কথা শুনে চমকে ওঠেনি অজয়। তাকে বাধা দেবার কোন চেষ্টা করেনি। হয়তো খুশি হয়েছিল। যেন সে তাকে মুক্তি দিয়ে আসবে সব দায় থেকে। একটা মানুষ, যাকে একেবারেই মানায় না ও বাড়িতে, সে যদি নিজের ইচ্ছেয় চলে যায় তাহলে কার কি বলবার আছে।

সেই কথাটাই বলেছিল অজয়, তুমি ভেবনা আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনবার জন্তে ও বাড়িতে ছুটোছুটি করব—

করলেও ফল হবে না, গলার স্বর ইচ্ছে করেই বিকৃত করে তুলেছিল ঊর্মিলা, তোমাকে—এ বাড়ির কাউকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না বলেই চলে যাচ্ছি।

বেশ করছ, অজয় রাগ করেনি। ঊর্মিলার কথাটা মেনে নিয়েই বলেছিল, অভিনয় করে দিন কাটাবার বয়েস তোমারও নেই, আমারও নেই। সব যখন বুঝতে পারছ তখন জোড়াতালি দিয়ে কারু কোন লাভ নেই—

ঊর্মিলা কোনদিকে তাকায়নি। রুকি আর সুধাংশুমোহনের সঙ্গে দেখা করবারও দরকার মনে করেনি। একটা ছোট স্যুটকেশ, কয়েকটা শাড়ি আর নিজের ব্যবহারের ছু-একটা ছোটখাট জিনিস নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এক মুহূর্তের জন্তেও থমকে দাঁড়ায়নি—একটুও ইতস্তত করেনি। এ ঘর থেকে ও ঘরে যাবার মতো করেই ও বাড়ি থেকে এ বাড়িতে চলে এসেছে।

কারুর সঙ্গে মতে মিলল না—কেউ সমর্থন করল না বলে আর কোন বেদনা নেই ঊর্মিলার মনে। সকলের অদ্ভুত রকম এক ভয়-ভয় ভাব দেখে রাগও নেই আজ কারুর ওপর। তার চারপাশের ভাল মানুষদের কথা ভেবে হাসি আসে তার। কে জানত এত ভালমানুষ আছে পৃথিবীতে যারা আঘাত পেলেও মুখ খোলে না, অপমান সহ্য করেও প্রতিবাদ জানায় না।

জোলো হাওয়ার ঝাপটা আসে হঠাৎ। রাস্তায় লোকগুলো জোরে জোরে চলে। প্রথমবার বুঝতে পারেনি, দ্বিতীয়বার আওয়াজ শুনে ঊর্মিলা বুঝল মেঘ ডাকছে। কমলা বাড়ি নেই। ছাত্রী

পড়াতে গেছেন। উর্মিলা সোজা হয়ে বসে। এ ঘরে ঘড়ি নেই। সে বুঝতে পারে না এখন ঠিক ক-টা বেজেছে। মা বৃষ্টির আগে ফিরে এলেই ভাল হয়। উর্মিলা বাইরে এসে সিঁড়ির ওপর দাঁড়ায়। তারপর আস্তে আস্তে রাস্তায় নেমে অনেক দূর অবধি তাকায়। বিদ্যুৎ চমকে-চমকে উঠছে। বৃষ্টির ছোট ছোট ফোঁটা কাচের কুচির মতো গায়ে পড়ে। তবু সে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটা ট্যাক্সি আসছে খুব আস্তে আস্তে। মোটরের জোরালো আলোয় হালকা বৃষ্টির রূপটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আশে-পাশের বাড়ির জানলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে খটাখট। একটা গরু আশ্রয়ের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আর একটু পরেই রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে।

ট্যাক্সির হর্ন বাজে। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে একটা নম্বর খুঁজছে। কমলারও ফেরবার সময় হল। উর্মিলা জানে যে এই অল্প বৃষ্টিতে মা কখনও ট্যাক্সিতে ফিরবেন না। কিন্তু তাহলেও সে তাকিয়ে থাকে ট্যাক্সিটার দিকে। উর্মিলাকে দেখে গাড়ি থামায় ড্রাইভার। এ বাড়ির নম্বর কত জানতে চায়।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বাড়ি, শীর্ণ বয়স্ক এক ভদ্রলোক টিপটিপ বৃষ্টিতে উর্মিলার উত্তর শুনে নেমে পড়েন। কমলা এ বাড়িতে থাকেন কি-না জানতে চান। জলের ঝাপটা বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়েন ঘরের ভেতর। অবাক হয়ে উর্মিলাও আসে তার পেছন পেছন। অনেক মালপত্র ট্যাক্সিতে। স্যুটকেশ বিছানা, ছোট ছোট আরও কত কি।

এমন করে হঠাৎ কে এসে তার মাকে খুঁজছেন উর্মিলা বুঝতে পারে না। কিছু জিজ্ঞেস করবে কি-না কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভাবে।

দাদা বৌদিকে খবর দেবে কি-না ঠিক করতে পারেনা। ট্যাক্সিটা স্টার্ট বন্ধ করে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ঝিমোয়।

ঊর্মিলা কিছু বলবার আগেই সেই ভদ্রলোক বসে পড়েন চেয়ারে। হাঁপান। ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়েন। কাঁচা-পাকা চুল। চোখ বসে গেছে। অবসন্ন শরীর। বোধহয় অনেক দূর থেকে এসেছেন। কিছু বলতে গিয়ে ভাবছেন। বিশ্রাম করে নিচ্ছেন। কোন কথা না বললেও মাঝে মাঝে অদ্ভুত এক বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন ঊর্মিলার দিকে। পকেট থেকে রুমাল বের করে জলের ছিটে মুছে নিলেন। থেমে থেমে বললেন কমলাকে খবর দিতে।

ঊর্মিলা বলতে যাচ্ছিল যে তার মা বাড়ি নেই। এখুনি এসে পড়বেন। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই গড় গড় করে একটা রিক্স এসে দাঁড়াল ট্যাক্সিটার ঠিক পেছনেই আর জলের ঝাপটা বাঁচাবার জন্যে কমলা প্রায় ছুটে এলেন ঘরে। চোখে-মুখে জল চিকচিক করছে। নিচের দিকে শাড়িটাও বেশ ভিজেছে। ঊর্মিলাকে কিছু একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেই ভদ্রলোকের দিকে। আরও জোরে জল পড়ছে। ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে রিক্সটা এড়িয়ে এড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে।

মার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে যায় ঊর্মিলা। ইচ্ছে থাকলেও কোন কথা বলতে পারে না। চোখ দুটো আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠছে কমলার। হিংস্র। বিস্ফারিত। আর কোন দিকে দেখছেন না। তখনও তাকিয়ে আছেন সেই ভদ্রলোকের দিকে। কে উনি? কেন কমলা এমন করছেন? পাথরের মতো কঠিন দেহ। কপালটাও যেন ভয়ঙ্কর বিদ্বেষে ছোট হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আর যিনি এসেছেন

তিনি মাত্র একবার মাথা তুলে তাকালেন কমলার দিকে। শুধু তাঁর ঠোঁট দুটো সামান্য নড়ে উঠল। কিন্তু বোধহয় তাঁর চেহারা দেখে তিনি একটিও কথা বলতে সাহস করলেন না। মুখ নামিয়ে তাকিয়ে রইলেন মাটির দিকে।

কি চাও? চিৎকার করে উঠলেন কমলা। আর্তনাদের মতো তাঁর গলার স্বর। উর্মিলা চমকে মার দিকে তাকায়। দেহের রঙটা যেন এই অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে বদলে গেছে তাঁর। জ্বলন্ত লোহার মতো লালচে আভায় দপ দপ করছে সারা শরীর। চোখ দেখলে মনে হয় শীগগির পলক পড়বে না। মার এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর রূপ দেখে সাংঘাতিক ভয়ে উর্মিলা পিছিয়ে আসে।

কি চাও তুমি এতদিন পর আমার কাছে? আরও রুক্ষ আরও কর্কশ হয়ে ওঠে কমলার কথা বলার ভঙ্গি, চাকরি পাকা করে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছ বুঝি?

না, অপরাধীর মতো থেমে থেমে বলেন সেই ভদ্রলোক, চাকরি নেই আমার। আমি সব ছেড়ে এসেছি—

আর তোমার নতুন বউ?

মরে গেছে। আজ আমার আর কিছু নেই কমলা—

তাই আমাকে তুমি তোমার দুঃখের কাহিনী শোনাতে এসেছ?

আমি আমার ছেলেমেয়েদের দেখতে এসেছি, ভিজে-ভিজে বোবা চোখে সেই লোক হঠাৎ তাকান উর্মিলার দিকে। কিছু একটা বোঝবার চেষ্টা করেন। কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে চান। কিন্তু কথা বলতে পারেন না। দুই হাতে শক্ত করে নিজের মাথাটা চেপে ধরেন।

আর উর্মিলা হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে যায়। মার ঘরে টাঙানো বাবার

ছবিটার কথা মনে পড়ে। খুশির দমকা ঝাপটায় ছিটকে পড়ে যেতে চায় দরজার ওপর। তার সমস্ত জীবনের কথা বলে নালিশ জানাতে চায়। কৈফিয়ৎ আদায় করতে চায় তার বাবার কাছ থেকে। ওপরে ছুটে গিয়ে দাদাকে বলতে ইচ্ছে করে যে জিতেন্দ্রনাথ ফিরে এসেছেন। কিন্তু পা চলে না উর্মিলার। জিবটাও যেন অসাড় হয়ে গেছে। মুখে কথা আসে না। চারপাশ থেকে অস্বাভাবিক শব্দের তরঙ্গ ছুটে আসছে। উন্মত্ত সমুদ্রের মতো। কমলার সব কথা বুঝতেও তার যেন কষ্ট হয়।

না না না, যেন বুক চিরে-চিরে কথা বেরিয়ে আসছে কমলার, ওরা তোমার কেউ নয়। যা চাপা পড়ে গেছে, তুমি এত বছর পর তা আবার ঝালিয়ে তুলে ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পাঁচজনের কাছে লজ্জায় ফেল না। কেন এলে তুমি এখানে? আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। তুমি চলে যাও।

উঠে দাঁড়ান জিতেন্দ্রনাথ। মাথা তোলেন না। শীর্ণ অসহায়। কিন্তু হঠাৎ যেন এক বৈছ্যুতিক আঘাতে সবল হয়ে উঠেছেন। আর একটা কথাও বলেন না। ফিরে তাকান না উর্মিলার দিকে। আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে যান ট্যাক্সিটার দিকে। কোথায় যাবেন কে জানে!

নিষ্ঠুর—অমানুষ, এক জায়গায় এক ভাবে দাঁড়িয়ে এখনও ঠিক তেমন করেই কমলা চিৎকার করেন, একদিনের জন্যে আসতে পারনি? মরে গেছি কি বেঁচে আছি জানতে ইচ্ছে হয় নি? আজ উনি এসেছেন ওঁর আদরের ছেলে মেয়েদের দেখতে—নির্লজ্জ!

ঠাণ্ডা মেঝে চুম্বকের মতো দুটো পা যেন টেনে রেখেছে উর্মিলার। কেন সে ছুটে গিয়ে হাত ধরে ফিরিয়ে আনতে পারছে না জিতেন্দ্র-

নাথকে ? চিৎকার করে বলতে পারছে না, বাবা, এই যে আমিই ঊর্মি ? চোখ টান করে শুধু ট্যাক্সিটার দিকেই সে তাকিয়ে আছে। অনেক সময় ছিল কিন্তু কিছুই করতে পারল না ঊর্মিলা। বার দু-এক হর্ন বাজিয়ে ট্যাক্সিটা চলে গেল যতীন দাস রোড ছাড়িয়ে। ঝিম-ঝিম বৃষ্টির একটানা শব্দ। হাওয়ায় টেবিলের চাদর গুটিয়ে গেছে ফুলদানের ওপর। আর এক ঝাপটা এলেই সবসুদ্ধ উল্টে যাবে।

হঠাৎ একটা ভারী শব্দে কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল ঊর্মিলার। চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখে কমলা পড়ে গেছেন মাটিতে। তার দেহের ধাক্কায় পাশের চেয়ারটা হেলে পড়েছে টেবিলটার গায়ে। ঊর্মিলা ঝুঁকে পড়ে মাকে দেখে। দুই চোখ বন্ধ। মুখ হাত—সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেছে। কমলা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

মা! ওমা—বুক কাঁপে ঊর্মিলার। ভয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে। দরজাটা বন্ধ করে দেয়ার কথাও খেয়াল থাকে না। ছুটে চলে যায় শিবেন আর বাণীর ঘরে। যন্ত্রের মতো কোনরকমে সব কথা বলে ওদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে নিচের ঘরে। তারপর আবার কমলার দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে, তাঁর নাকের কাছে হাত দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে এখনও নিশ্বাস পড়ছে কি-না।

শিবেন হঠাৎ বুঝতে পারে না এখন কি করা উচিত। অসহায়ের মতো এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর নিচু হয়ে কমলাকে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে দোতলায় এসে খাটে শুইয়ে দেয়। জোরে পাখা চালিয়ে দিতে বলে বাণীকে। আর ঊর্মিলাকে বলে কমলার চোখে-মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটে দিতে। চাকরকে জোরে ডাকে শিবেন। উঠে খস খস করে চিঠি লেখে ডাক্তারকে। আর লিখতে লিখতে তার মনে হয় যে এ কাজটা অনেক আগে করা উচিত ছিল।

মার কপালে ভিজে হাত রেখে উর্মিলা জিজ্ঞেস করে, কি হবে? চোখ দুটো ভিজে ওঠে তার।

অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না শিবেন। শুধু আস্তে অনুযোগ করে, এই বয়সে এত পরিশ্রম—কতবার বারণ করেছি—

বাবার কথা বলতে গিয়ে থেমে যায় উর্মিলা। কেমন বাধো-বাধো ঠেকে। শিবেনের আরও কাছে সরে এসে বলে, মার তেমন চেহারা আমি কখনও দেখিনি। কপালের শিরা এত ফুলে উঠেছিল যে মনে হচ্ছিল বুঝি ছিঁড়ে যাবে—

শিবেন বোধহয় উর্মিলার কথা শোনে না। মার হাতটা ধরে নাড়ী দেখে। খুব আস্তে নিশ্বাস পড়ছে এখন কমলার। চেহারাটা এই অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে বদলে গেছে। গাল দুটো চুপসে গেছে। যেন প্রাণ নেই। চোখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি সে দেয়ালের দিকে তাকায়।

এখনও বৃষ্টি থামে নি। মাটির গন্ধ আসছে হাওয়ায়। বাজের কড়-কড় শব্দে চমকে উঠছে উর্মিলা। বাণী দাঁড়িয়ে আছে কমলার মাথার কাছে। শুকনো মুখ। চোখ দুটো ভিজে উঠেছে। কারুর কিছু করবার নেই কিন্তু সকলেই একটা কিছু করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কমলাকে এই অবস্থায় বেশিক্ষণ দেখতে ওরা কেউই চায় না।

খটখট জুতোর শব্দ করে ডাক্তার আসে। চেনা লোক। এ বাড়িতে এসেছে অনেকবার। আপনার লোকের মতোই যত্ন করে কমলাকে পরীক্ষা করে অনেকক্ষণ। মুখটা গম্ভীর হয়ে যায় ডাক্তারের। ব্যাগ খুলে কি খুঁজতে খুঁজতে বলে, ইন্‌জেক্‌সন দিতে হবে।

কেমন দেখলেন? ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করে শিবেন।

এখন কিছু বলতে পারছি না। তবে হার্ট খুব দুর্বল। আজ সারা রাত দেখতে হবে—ইন্‌জেক্‌সন দিতে গিয়ে ডাক্তার ইতস্তত করে। আবার ভাল করে নাড়ী দেখে। তারপর খুব সাবধানে আস্তে আস্তে ইন্‌জেক্‌সন দেয়। কি হয় জানবার জন্যে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে ডাক্তার। একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রত্যেকের মুখের দিকে হঠাৎ একবার তাকায়।

শিবেনবাবু, ঘরের বাইরে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ায় ডাক্তার, কখন জ্ঞান ফিরে আসবে কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু আর দেরি করা যাবে না। এখুনি অক্সিজেন দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি যাচ্ছি, আপনি শুধু একটা লোক দিন আমার সঙ্গে, আর—একটু থামে ডাক্তার। হাত বেঁকিয়ে ঘড়ি দেখে, একবার ডাক্তার মুন্সীকেও খবর দিতে হবে—

কোন আশা আছে নাকি ডাক্তারবাবু?

ঠিক বলা যাচ্ছে না, হাসবার চেষ্টা করে ডাক্তার, দেখা যাক। বোধহয় খুব বড় একটা ধাক্কা খেয়েছেন—

হ্যাঁ, মাথা তুলে সংক্ষেপে শিবেন সব কথা বলে ডাক্তারকে। চাকরকে ডাকে না। নিজেই যায় ডাক্তারের সঙ্গে। কাছেই ওষুধের দোকান। সেখান থেকে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে ডাক্তার মুন্সীকে ফোন করবে। এই ডাক্তার শিবেনকে নিজের মোটরে তুলে নেয়।

সারা রাত কেটে গেল। সেই এক অবস্থা কমলার। ঘুম নেই। খাওয়া নেই কারুর। অক্সিজেনের লালচে লম্বা টিউব শুধু উঠছে নামছে। তাঁর ছাত্রীরা দেখতে আসছে। দিবানাথ ঠায় বসে আছে একটা কাঠের চেয়ারে। জোর করে এদের কিছু না কিছু খাওয়াবার

চেষ্টা করছে। বার বার বোঝাচ্ছে, এত ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই। এমন অবস্থা হলে পাঁচ-ছদিন পরেও লোকের জ্ঞান ফিরে আসে।

মার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছে না ঊর্মিলা। তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে যেন অল্প অল্প করে অন্ধকার নেমে আসছে। চারপাশ একেবারে নিস্তব্ধ। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে খুব জোরে। কিন্তু একটুও শব্দ নেই। চোখের জ্যোতি বোধহয় ক্ষীণ হয়ে আসছে ঊর্মিলার। তার খুব কাছে আছে সকলে তবু অস্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রত্যেকের মুখ। ঘরটা কাঁপছে। নিজের শরীরটাও খুব দুর্বল মনে হচ্ছে—যেন মাথা ঘুরে সেও এখুনি গড়িয়ে পড়বে মাটিতে।

কাল সারা রাত ডাক্তার ছিল এ বাড়িতে। আজও থাকবে। বড় ডাক্তারও এসেছিলেন। কিন্তু কোন পরিবর্তন নেই কমলার। আরও শীর্ণ মনে হচ্ছে মুখ। সেদিকে তাকিয়ে ঊর্মিলা কান্না চেপে রাখতে পারে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। শুধু দিবানাথ তাকিয়ে থাকে তার দিকে। সান্ত্বনার একটা কথাও আর বলতে পারে না কেউ।

ঘড় ঘড় একটা শব্দ। বোধহয় কমলার বুক থেকে আসছে। ডাক্তার তাঁর আরও কাছে সরে আসে। অন্য সকলে ভাবে হয়তো জ্ঞান ফিরে আসবে এখুনি। এ যেন তারই সঙ্কেত। কিন্তু বিষণ্ণ হয়ে ওঠে ডাক্তারের মুখ। আস্তে আস্তে আবার সরে যায়। শিবেনকে ডেকে থেমে থেমে কি যেন বলে।

দাদা।

কান্না থেমে যায় ঊর্মিলার। কমলা চোখ খুলেছেন। করুণ উৎসুক দৃষ্টি। তাকিয়ে দেখলেন প্রত্যেকের মুখের দিকে।

অস্থির দুটো চোখে অস্বাভাবিক কৌতূহল কাঁপছে। এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছেন।

মা? কমলার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় শিবেন।

ও মা কথা বল, উৎসাহের ঝোঁকে বেশ জোরেই বলে ওঠে উর্মিলা।

কিন্তু কোন কথা বলেন না কমলা। চোখ দুটো আস্তে আস্তে আপনি বন্ধ হয়ে যায়। বুকের ঘড় ঘড় শব্দও আর শোনা যায় না। দেয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি থমকে স্থির হয়ে আছে। পাখার হাওয়ায় ক্যালেণ্ডারের পাতা সেঁটে আছে আর একটার সঙ্গে। দূরে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করে ডাক্তার। এই সময় অক্সিজেনের টিউবটা কমলার নাক থেকে খুলে ফেলবে কি-না ঠিক করতে পারে না।

॥ পাঁচ ॥

গ্রীষ্মের কড়া রোদ্দুরে শুকনো বকুলগাছটা নির্জীব হয়ে ঝিমোয়। একটা পাতা নড়ে না। মাঝে মাঝে কোথা থেকে কাক এসে সরু ডালে বসে ঠুকরে ঠুকরে কি খায়। সেই আধ-খাওয়া জিনিসটা হঠাৎ কাকের ঠোঁট ফসকে মাটিতে গড়ায়। ঘরে বসে ঊর্মিলা দেখে। কাক নাচানাচি করে শুকনো ডালে। ডাকে। কিন্তু ডানা ঝাপটে নিচে নেমে সেই ফলটা আর শক্ত করে ঠোঁটে ধরে না।

ভিজে-ভিজে রাস্তা। পিচ গলে। ভয়ঙ্কর একটা তাপ এসে লাগে ঊর্মিলার গায়ে। রুক্ষতার অদ্ভুত এক যন্ত্রণা। পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যায় না কিছু। হু হু করে আগুন জ্বলে ওঠে না কোথাও। শুধু দূর থেকে আগুনের আঁচ সব কিছু ঝলসে দিতে চায়। রোদ আর রোদ। তাজা খটখটে চোখ ধাঁধানো। স্থির হয়ে ঘরে বসে থাকে ঊর্মিলা। ঝিমোয়। সারা দুপুর ক্লান্তিতে মাটিতে গড়ায়।

বাড়িটাতে শোক থমথম করে। টেবিল চেয়ার পর্দা চাদর যেন রুক্ষ কঠিন শোকের এই ঝাপটা এখনও সামলে উঠতে পারে না। ঊর্মিলাকে দেখে। প্রশ্ন করে। কেন কমলা এত কঠিন হয়ে উঠলেন? কেন জোর করে নিষ্ঠুর হয়ে নিজের মরণ ডেকে আনলেন? সারা জীবনের প্রতীক্ষার শেষ কি এমনি করেই হল!

সেই এক ভাবনা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে যেন ঊর্মিলার সমস্ত মনটাকে বেঁধে ফেলে। তার চোখের সামনে জিতেন্দ্রনাথের ক্লান্ত করুণ মূর্তি সারাক্ষণ চলে ফিরে বেড়ায়। সে বুঝতে পারে না কেন তাঁর হাত ধরে তাঁকে ঠেকিয়ে রাখল না। তৎপর হয়ে চাকরকে

ডেকে ট্যাক্সি থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নিলেই তো তাঁকে ধরে রাখা কঠিন হত না। কমলা চোখ খুলে জিতেন্দ্রনাথকে যদি তাঁর ছেলেমেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতেন তাহলে অন্য এক প্রতিক্রিয়ায় হয়তো তিনি একেবারে সেরে উঠতেন।

তুই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন উর্মি? শিবেন উর্মিলাকেই দোষ দেয়, মার অবস্থা দেখে বুঝতে পারিস নি যে ওঁর কোন জ্ঞান ছিল না—

আমারও বোধহয় জ্ঞান ছিল না দাদা। ইচ্ছে থাকলেও আমি বাবার কাছে ছুটে যেতে পারিনি। সব জিনিসটা আজ ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট মনে হচ্ছে। এত বড় ভুল আমি কেমন করে করলাম।

কমলার বাঁধানো বড় একটা ছবির দিকে তাকিয়ে শিবেন বলে, সব কাগজে প্রায় রোজই তো লিখছি, কিন্তু আশ্চর্য কোন খবর পাচ্ছি না বাবার। কোথায় আছেন কে জানে।

শিবেনের কথার উত্তর দেয় না উর্মিলা। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। সে কেমন করে বুঝতে পারে যে হাজার বিজ্ঞাপন দিলেও জিতেন্দ্রনাথ আর কখনও এ বাড়িতে তাঁর ছেলে-মেয়েকে দেখতে আসবেন না। তাঁর চোখ দুটো দেখে প্রথমেই উর্মিলা বুঝতে পেরেছিল বুকে প্রবল একটা আশ্বাস নিয়ে তিনি কমলার কাছে এসেছিলেন। তিনি যেখানেই থাকুন আর যেমন করেই কাটান জীবনের এতগুলো দিন—একটা স্থির বিশ্বাস ছিল তাঁর মনে যে একদিন এক বিশেষ জায়গায় বিশেষ একজনের কাছে তাঁকে আসতেই হবে। আর সেখানে তাঁর কোন অপরাধের কোন কৈফিয়তের দরকার হবে না। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে মনের স্বতঃ-

স্ফূর্ত দাবী নিয়ে এসেছিলেন বলেই এ বাড়িতে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে অত সহজ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এ যেন একটা মস্ত বড় ভুল। আচমকা রূঢ় ধাক্কায় তিনি একেবারে রাস্তায় ছিটকে পড়লেন। ছেলেমেয়েকে দেখবার ক্ষীণতম ইচ্ছে তাঁর আর থাকবে কেমন করে। তিনি কি শুধু শিবেন আর উর্মিলাকেই দেখতে এসেছিলেন।

একটু-একটু করে ঘন কুয়াশার ধোঁয়াটে আবরণ উর্মিলার সামনে থেকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যায়। জিতেন্দ্রনাথ আকস্মিক হতাশার হিম-ঝাপটায় যা বুঝতে পারেননি—সে এখন সেই সহজ কাথাটা স্পষ্ট করেই বুঝতে পারে।

প্রথম যৌবনের শুরু থেকে যতক্ষণ জ্ঞান ছিল কমলার ততক্ষণ যত জ্বালা আর অভিযোগ, বেদনা আর অভিমান তিল তিল করে মনের মধ্যে জমা হয়ে উঠেছিল মাত্র একজন মানুষকে উপলক্ষ্য করে। তাঁকে হঠাৎ চোখের সামনে দেখে সব অনুভূতির বিকট প্রতিক্রিয়া কমলাকে অপ্রকৃতস্থ করে তোলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। তাই এই নিদারুণ উদ্গীরণ। তাই এই করুণতম পরিণতি।

কান্নার প্রবল চাপে ঝাপসা হয়ে আসে উর্মিলার চোখ। জিতেন্দ্রনাথ তাদের সংসারে ছিলেন না বলে তার চরিত্রের যে দিকটা প্রধান হয়ে উঠেছিল আজ তা নিতান্তই স্থূল বলে মনে হয়। তার দিক থেকে সে যেন একটা মস্ত বড় ভুল। মার দিকে তাকিয়ে তাঁকে প্রথম থেকে অনুকরণ করে চললে হয়তো তার জীবনের রূপটা আজ একেবারেই অন্যরকম হত।

ইতস্তত করে কথা বলে দিবানাথ, অজয় এসেছিল?

না, ফিসফিস করে যেন আপন মনেই বলে উর্মিলা, সে কেন আসবে?

হয়তো খবর পায়নি, দিবানাথ একটু থেমে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করে, তাকে জানানো উচিত। একটা খবর পাঠাব?

করুণার হাসি খেলে উর্মিলার ঠোঁটে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে সে দেখে দিবানাথকে। তাকে ভাল করে চিনতে পেরেছে বলে মজা পায়। একটুও রাগ হয়না তার ওপর। আসল চেহারাটা দেখে মায়া হয়। একটা মানুষ প্রাণপণে নিয়মের দড়ি আঁকড়ে ধরে আছে। সব সময় ভয়, দড়ি ফসকে গেলে পাছে সব গোলমাল হয়ে যায়—দুর্নাম রটে।

দিবানাথের কথার উত্তরে কিছুক্ষণ পর উর্মিলা বলে, খবর পাঠাবার কোন দরকার নেই। দাদা তো বাবাকে আসতে বলে রোজই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। অজয় কাগজ দেখলেই খবর পাবে।

না না, মানে—উর্মিলাকে বোঝায় দিবানাথ, তোমার দিক থেকে একটা কর্তব্য আছে তো?

উর্মিলার রাগ হয় না। সমস্ত জেনে এতদিন পরেও কেন দিবানাথ একথা বলে তা বুঝে উঠতে তার দেরি হয় না। অন্যদিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে সে বলে, না, কোন কর্তব্য নেই।

দিবানাথ বসে থাকে চুপচাপ। শান্ত ঠাণ্ডা একটা মানুষ। কোন কথা না বললেও উর্মিলা বুঝতে পারে সে তারই কথা ভেবে নিঃঝুম হয়ে আছে। সূক্ষ্ম অনুভূতির আঁচে জ্বলে যাচ্ছে। তার মতো নিয়মের দড়ি ধরা লোকের নিশ্চয়ই উর্মিলার সম্পর্কে একটা কর্তব্য আছে। একটা নিবিড় বেদনাও আছে। আর সব

ছাড়িয়ে যা আছে তা প্রকাশ করবার সাহস তার মতো মানুষের যে কোনদিন হবে না সেকথা উর্মিলা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে বলেই করুণা জাগে দিবানাথের ওপর।

বাড়িটা শীগগিরই বদলাবে শিবেন। খোঁজাখুঁজি চলেছে। এখন এত বড় একটা বাড়ি রেখে কোন লাভ নেই। তার পক্ষে অত ভাড়া দিতেও বেশ অসুবিধা হবে। কমলা কিছুই রেখে যান নি—রেখে যাবার কথাও নয়। এখন থেকে সতর্ক হয়ে না চললে অসুবিধায় পড়তে হবে।

যা হোক, সব ব্যবস্থা পাকা করে নেবার বুদ্ধি আছে তার। কিন্তু এখনও শুধু উর্মিলার ব্যাপারে সে কোন বুদ্ধি খাটাতে পারে না। যদিও একেবারে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কোন কথা জিজ্ঞেস করে না তাকে কিন্তু উর্মিলা বোঝে যে সে এখন একটা বোঝার মতো হয়ে জোর করে ঝুলে আছে এ সংসারে। তাকে দিয়ে কারুর কোন প্রয়োজন মিটবে না।

তাই আস্তে আস্তে উর্মিলার মনের তেজ জুড়িয়ে যায়। চারপাশের অবস্থা দেখে তার সমস্ত জীবনীশক্তি থিতিয়ে যায়। সেই নিয়মের দড়িটা ধরে সে-ও এদের সকলের মতো ঝুলে পড়তে চায়। মাথা তুলে কোন কিছুর প্রতিবাদ করবার মতো শক্তির ক্ষয় কখন যে হয়ে গেছে সে বুঝতে পারেনি।

দিবানাথ আর কমলা—দুজনের ওপর ভরসা করেই সে অজয়ের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। একজন শেষ হয়ে গেলেন। আর একজন তাকে দেখাল আর এক চেহারা। উর্মিলা অবসন্ন হয়ে পড়ে। মা বেঁচে থাকলে তার একটা অধিকার থাকত এ বাড়িতে। আজ শিবেনের ওপর নির্ভর করতে তার নিজেরই সঙ্কোচ

হয়। অন্য একটা থাকবার জায়গার কথা ভেবে ভেবে ক্লান্তি আসে।

শিবেন নাকি এখান-ওখান থেকে নানা কথা শোনে উর্মিলার সম্পর্কে। তা শুনতে ওর ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে এমন দুর্নাম রটাবার সুযোগ মানুষকে দেয়ার কি দরকার সে বুঝতে পারে না।

দাদার সঙ্গে তর্ক করে না উর্মিলা। কাউকেই আর যুক্তি-তর্ক দিয়ে কিছু বোঝাতে ইচ্ছে করে না তার। মা-বাবার এই ব্যাপারের পর মনে মনে সে নিজেই যেন সব যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বে উঠে গেছে। শুধু নিজের ওপর ভরসা করে এখন থেকে কি করবে আর কোথায় থাকবে সে-কথাটা ভেবে ভেবেই তার সারাদিন কাটে।

আর মাত্র একটি বছর কোনরকমে কাটাতে পারলে সে পরীক্ষাটা দিয়ে দিতে পারে। তখন চেষ্টা করলে হয়তো তার মার ইস্কুলেই একটা চাকরি জুটে যেতে পারে। তারপর দেখা যাবে এই বিকট প্রতিকূল অবস্থায় সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে কি-না। কিন্তু এই ক-টা মাস উর্মিলা কাটাবে কেমন করে। শিবেনের সংসারে সে বোঝা হয়ে থাকতে চায় না। মেয়েদের কোন হস্টেলে তার পক্ষে জায়গা পাওয়া নিশ্চয়ই কঠিন। আর জায়গা হলেও সে খরচ চালাবে কেমন করে।

প্রবল একটা ক্ষোভে উর্মিলা আজকের সব নিয়ম-কানুন চুরমার করে দিতে চায়। ধারালো নখ দিয়ে পুরু জালটা টুকরো-টুকরো করে বিপুল শক্তি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। আর তখন শুধু নিয়মের দড়িটা কাঁপে তার চোখের সামনে। যেন সেটা ধরে ঝুলে পড়লেই এক মুহূর্তে এই নিদারুণ অবস্থার রকমফের হবে। আর সব যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তি পাবে। তখন হাসি ফুটে উঠবে দিবানাথের

মুখে। শিবেন নিশ্চিন্ত হবে। আবার চোখ বুজে যদি সে অজয়ের বাড়িতেই ফিরে যায় তাহলে সকলের সব দুর্নাম ঘুচে যাবে। একটা ছোট তুচ্ছ কারণকে উপলক্ষ্য করে উর্মিলা সকলকে অশান্তি দিচ্ছে সে কথাটা সে তো শুনেছে অনেকের মুখ থেকে অনেকবার। তা-হলে কেন এখনও সে চুপ করে বসে আছে, বোধহয় শুধু সে-কথাটাই ওরা কেউ বুঝতে পারে না। সে নিজেও নয়। এত কথা জেনেও মুক্তি পাবার সহজ উপায়টা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। প্রতিকূল অবস্থায়ও অন্ত একটা কিছু আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল উর্মিলা। একেবারে অনিচ্ছায়। খুব অল্পক্ষণের জন্যে। শুধু একটু ঠিকঠাক হয়ে নেয়া। আলতো-ভাবে মুখে সাদা পাউডারের পাফ বুলিয়ে পরিষ্কার একটা সাধারণ শাড়ি পরে নিয়েছিল।

সারাদিন ঘরে বসে ভাবনায়-ভাবনায় শুকিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। সারা বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করে। বুকটাও। আজ ভেবেছিল একবার বেড়িয়ে আসবে। একা একা তার কলেজের কোন নতুন বন্ধুর বাড়িতে। দুটো আজে-বাজে কথা বলে মুষড়ে যাওয়া মনটা একটু তাজা করে তুলবে। পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করবারও চেষ্টা করবে। হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে ঝিমিয়ে কোন লাভ নেই।

কিন্তু দিনটা হঠাৎ যেন ফুরিয়ে গেল। জোলো হাওয়া আর টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল উর্মিলা তৈরি হয়ে নিচে নেমে আসবার আগেই। বাধা পেয়ে চোখ দুটো কুঁচকে গেল তার। বিরক্তির

ছোট একটা শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। অসময়ে এত ঘন ঘন বৃষ্টি হচ্ছে কেন এ বছর! সেটা ভাল না খারাপ—সেকথা ঘরে বসে বিচার করবার মতো মনের অবস্থা তার এখন নয়। আজ আর বোধ-হয় বার হওয়া হল না তার। বৃষ্টি থেমে গেলেও জল টপকে কাদা ছিটকে শাড়ি নষ্ট করতে সে চায়না।

বাইরের ঘরে বসে উর্মিলা তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে। বৃষ্টি শীগগির থামবে না। জলের আওয়াজ বেশ জোর। এই ঝড় জল মাথায় করে দিবানাথও আসতে পারবে না। না আসুক। সেই পুরনো কথা শোনবার ইচ্ছে উর্মিলার আর নেই। পড়াশুনোও এখন বন্ধ। পরীক্ষা দেবে কি-না সেকথা নিজেই বুঝতে পারেনা বলে বই খুলতে চায় না আজকাল। আর কিছুদিন যাক। যা হয় একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হোক। কিছু ঠিক না করে আন্দাজে সামনে এগিয়ে যাবার ইচ্ছে তার নেই।

হাতের কাছে যে বই পায় সেটাই খুলে বসে উর্মিলা। এক-লাইনও পড়ে না। বোধহয় কি বই সেটাও বুঝতে পারে না। যদিও ঘরে কেউ নেই, কারুর আসবারও সম্ভাবনা নেই এখন। তা-হলেও চুপচাপ বসে নিজের অস্বস্তি জাহির করতে চায় না বলেই বই খুলে পড়বার ভান করে। মাঝে মাঝে মাথা তুলে বাইরে তাকায়। ভিজে মাটির মধুর গন্ধ নাকে এসে লাগে।

ট্যাক্সিটা যেন হঠাৎ থেমে যায়। এখানে থামবার কথা প্রথমটায় ড্রাইভার বোধহয় বুঝতে পারেনি তাই পেছনে যে মানুষটি বসে আছে তার নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামায়। উর্মিলা উঠে দাঁড়ায় না। অবাক হয়ে মুখ বাড়ায়।

ভাল করে কাউকে দেখা যায় না। মোটরে বসেই একজন

ভাড়া চুকিয়ে দিচ্ছে ড্রাইভারকে। তারপর দরজা খুলে সে লাফিয়ে নামে রাস্তায়। লম্বা একটা লোক। বর্ষাতির কলার তোলা। দরজা খোলা দেখে হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢোকে। ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্যে ইচ্ছে করেই দরজাটা খুলে দিয়েছিল ঊর্মিলা। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে না। শব্দ করে চলে যায়।

হাতের বইটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করার অদ্ভুত শব্দ হয়। কিন্তু ঊর্মিলা চমকে ওঠে না। যে এসেছে তার দিকে তাকিয়ে থাকে দু-এক মিনিট। শুধু জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে। কপালে ঘাম জমে ওঠে আর বুকের কাঁপনের গতিটাও যেন বেড়ে যায়।

কঠিনস্বরে একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নেয় ঊর্মিলা। বৃষ্টিতে ভেজা জিতেন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে যায়। কমলা তাঁকে প্রথমে কথা বলবার অবসর দেননি। অজয়কে আসতে দেখে ঊর্মিলা তাই আজ কথা বলতে গিয়েও থেমে যায়। সে বলুক কি বলতে চায়। তার সব কথা শুনে তারপর ঊর্মিলা বলবে যা বলবার।

একটা উদ্দেশ্য নিয়ে অজয় এসেছে নিশ্চয়ই। হয়তো ঊর্মিলার সঙ্গে এখনও একটা আইনগত সম্পর্ক আছে বলে তার নানা রকম অসুবিধা হচ্ছে। আদালতে গিয়ে এবার পাকাপাকি বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা দরকার মনে করছে বলেই কথাবার্তা বলতে এসেছে। করুক না তার যা খুসি। তার জন্যে এই দুর্যোগে এখানে আসবার কি দরকার ছিল।

ঘরে ঢুকেই বর্ষাতিটা খুলে ফেলে অজয়। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘষে ঘষে মাথা আর মুখ মোছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঠিক করতে পারে না বর্ষাতিটা কোথায় রাখবে। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি। সে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

আমার অনেক আগেই আসা উচিত ছিল—দিবানাথ যে চেয়ারে বসে উর্মিলাকে পড়ায় সেটাতেই বসে পড়ে অজয়। উর্মিলার মুখোমুখী। বর্ষাতিটা হাতে নিয়েই তাকে দেখে।

কেন? বাইরে তাকিয়ে উর্মিলা বলে, কি এমন দরকার পড়ল হঠাৎ?

না না, কোন দরকারের জন্যে নয়—

বর্ষাতিটা ওই চেয়ারটার ওপর ছুঁড়ে দাও।

হ্যাঁ, এক মুহূর্তের একটা শব্দ। টেবিলের ওপর হাত দুটো মেলে দিয়ে অজয় বলে, আমি মোটে কাল সব শুনলাম।

কে বলল?

মতি। ও কোথা থেকে শুনেছে আমি জানি না।

আমিও বুঝতে পারছিনা, টেবিলের ওপর জোরে জোরে আঙুল ঘষে উর্মিলা, এসেছ বলে অনেক ধন্যবাদ, বুকের ধিকিধিকি আগুনটা ছিটকে বেরিয়ে এসে অজয়কে যেন ছেঁকা দিতে চায়। সে ছটফট করে। হঠাৎ যদি শিবেন এসে পড়ে এ ঘরে তাহলে অজয়কে নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি রকম ভদ্রতা আরম্ভ করবে যে উর্মিলার মাথাটা আপনিই নিচু হয়ে যাবে।

পকেট হাতড়ে সিগ্রেটের কেসটা অজয় খুঁজে বের করে। একটা সিগ্রেট বের করে হাতে নেয়। ধরায় না। আস্তে জিজ্ঞেস করে, এখন কেমন আছ?

ভালই, টেবিল থেকে হাত তুলে নিয়ে উর্মিলা বলে, আমি তো কোনদিনও খারাপ ছিলাম না—

আমি কিন্তু খুবই খারাপ ছিলাম, সিগ্রেট ধরিয়ে শুকনো হাসি হাসে অজয়, আশ্চর্য, এখনও মাথাটা কেমন করে ঠিক আছে।

কি হয়েছিল ?

সে অনেক ব্যাপার। তুমি চলে আসবার পর একটা না একটা কিছু তো লেগেই আছে। বাবার ভীষণ অসুখ। বোধহয় আর বাঁচবেন না। সারারাত মার নাম ধরে শুধু চিৎকার করেন— অজয় কথা শেষ না করে পর পর কয়েকটা টান দেয় সিগ্রেটে।

অজয়ের এই হঠাৎ আসার পেছনে কি উদ্দেশ্য আছে উর্মিলা এখনও স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না। তার গলার স্বরটা একেবারেই উষ্ণ নয়। ক্লান্ত। ঠাণ্ডা। অকাল বার্ধক্যে তার শরীর যেন ভেঙে পড়েছে। তার দিকে মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে উর্মিলা চোখ নামিয়ে নেয়। ভিজে ভিজে এসেছে লোকটা। মনের কোন বিশেষ টানে নয়, ভদ্রতার খাতিরেই তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে চা এনে দেবে কি-না। কিন্তু কথা বলতে পারে না সে।

অজয় বলে, ওদিকে বুকিও ফিরে এসেছে। কিছু না ভেবে হঠাৎ হুম করে একটা কাণ্ড করে আর নিজেই ভোগে, একটু থেমে সে বলে, আর অন্য সকলকেও অসুবিধার মধ্যে ফেলে।

উর্মিলা জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে বুকির ?

নন্দলালের সঙ্গে ভীষণ গোলমাল করেছে। প্রায় লাঠালাঠি ব্যাপার। বুকিই কেস করেছে ওর নামে। এখন রোজ উকিলের বাড়ি ছুটোছুটি।

রুকি কেমন আছে ?

অনেকক্ষণ কথা বলে না অজয়। ভিজে চুলে রুমালটা আর একবার ঘষে নেয়। হাতের সিগ্রেট শেষ হয়ে এসেছে। কোথাও ছাইদান না দেখতে পেয়ে পা দিয়ে সেটা চেপে দেয়। দু-একবার কাশে। সিগ্রেট কেসটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণ।

ওই যে বাবলু? আম্রার বন্ধু?

হ্যাঁ বুঝেছি।

অন্য একজন মেয়েকে বিয়ে করেছে। আর খবরটা পেয়ে রুকি একেবারেই বদলে গেছে। বাড়ি থেকে বার হতে চায় না। সাদা শাড়ি ছাড়া পরে না। আর আজকাল তার কথাবার্তা বলবার ধরনটাও একেবারে বদলে গেছে। আপন মনে একা একা আবোল তাবোল বকে যায়। ওর মাথাটা বোধহয় একটু খারাপ হয়েছে।

সে কি! উর্মিলা চমকে উঠে বলে, এমন একটা সামান্য ব্যাপারের জন্যে মাথা খারাপ করবার মেয়ে তো রুকি নয়।

উর্মিলার কথা শুনে অজয় হাসে, আমারও তো সেই রকম ধারণা ছিল। ও যে এটাকে একটা আঘাত বলে মনে করবে তা ভাবতেই পারি নি। কিন্তু এখন দেখছি কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না—

উর্মিলা এতক্ষণ পর মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে, তুমি কেমন আছ?

অজয় হাসে না। দীর্ঘ একটা নিশ্বাস পড়ে তার, আমার শুধু মাথাটাই খারাপ হতে বাকি। কাকে দেখব? রুকি দিনরাত এক সুরে বলে, আমি বিয়ে করব। সংসার করব। কেন কেউ আমাকে বিয়ে করতে চায় না? তোমরা কেন আমাকে অন্য রকম করে মানুষ করলে না? আর ওদিকে বুকির চিৎকার, দেখে নেব কত বড় শয়তান নন্দলাল। টাকার জন্যে নিজেকে কি মনে করে রাস্কেল। বলে আমার সঙ্গে নাকি দেশসুদ্ধ ছেলের মাখামাখি ছিল। স্কাউণ্ড্রেল!

অজয় কথা বলে যায় অনেকক্ষণ। সহজে থামতে চায় না। এত কথা অনেকদিন সে বলে নি উর্মিলার সঙ্গে। সেই গল্প করত বিয়ের আগে আর বিয়ের পর প্রথম-প্রথম। আগেকার মতোই একটা

আন্তরিকতার সুর ফুটে ওঠে আজ অজয়ের কথায়। যেন সে শুধু মন খুলে তার নিজের কথাই বলতে এসেছে।

কয়েকদিন হল তার মোটরগাড়িটা সে বিক্রী করে দিয়েছে। এখন সংসারের সব ভার পড়েছে তার ওপর। দু-একদিনের মধ্যেই রুকিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। অজয় নিজেই স্বীকার করে, কোনদিক এখন সে সামলাবে বুঝতে পারে না। তাই দিশা হারিয়ে আজ এসেছে এখানে।

ঊর্মিলা মুখ তোলে না। কোন কথা হঠাৎ বলতে পারে না অজয়কে। কিন্তু ও বাড়ির কারুর ওপর এখন আর রাগ থাকে না তার। এতদিন পর ওখানকার প্রত্যেকের ওপর তার করুণা জাগে। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন সুধাংশুমোহন। রুকির মাথার ঠিক নেই। বুকির ভবিষ্যৎ ভাঙা-চোরা অন্ধকার। এ যেন অন্য আর এক অজয় সব কথা জানাচ্ছে ঊর্মিলাকে। নিষ্প্রভ চোখ। ভিজে গলার স্বর। আর শিথিল অঙ্গভঙ্গি। তার ওপর ঊর্মিলার রাগ করে থাকতে ইচ্ছে হয় না। মায়ার আলোড়ন জাগে মনের মধ্যে।

মতি কেমন আছে?

ওই তো এখন আমার দেখাশোনা করে, একটু থেমে শুকনো হাসি হেসে অজয় বলে, কিন্তু মন খুলে আমি তো আর ওর সঙ্গে সমস্ত রকম আলোচনা করতে পারি না। তাই মাঝে মাঝে ভয়ানক ক্লান্ত মনে হয়। কতদিন ভেবেছি তোমার এখানে চলে আসব কিন্তু—

ঊর্মিলা মাথা তুলে বলে, এলে না কেন?

কেন আসিনি, অজয় ইতস্তত করে। কি একটা বলতে গিয়ে বলতে

পারে না। ঊর্মিলা তাকায় তার দিকে। হাওয়ার ঠাণ্ডা ঝাপটায় চুল ওড়ে। জিতেন্দ্রনাথের চলে যাওয়ার দিনটা আবার নতুন করে মনে পড়ে। ঊর্মিলার স্বর যেন বৃষ্টির ভিজে বাতাসের মতো মনে হয় অজয়ের।

আমি সব ভুলে গেছি।

আর একটা সিগ্রেট ধরায় অজয়, তাহলে এখানে একা বসে আছ কেন?

কোন কথা নেই ঊর্মিলার মুখে। কিন্তু চোখ দুটোর অদ্ভুত এক ভাষা আছে। তা অজয় বুঝতে পারে কি-না বোঝা যায় না। যদি জিতেন্দ্রনাথ না আসতেন, যদি কমলার মৃত্যু না হত আর অজয় যদি এমন করে তার নিজের আর সংসারের বিবর্ণ টলোমলো ছবি না তুলে ধরত তাহলে এখানে ঊর্মিলা বসে না থাকলেও সব যে ভুলে যেত না সেকথা ঠিক।

আর কারুর জন্যে নয়, ঊর্মিলার একটা আঙুল চেপে ধরে অজয়, শুধু আমারই জন্যে আমি তোমার কাছে এসেছি—

আমি কি করব?

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে অজয় [illegible], তুমি [illegible] যাবে।

নিজের আঙুল হঠাৎ এক সময় মুক্ত করে নেয় ঊর্মিলা। দূরের চেয়ারে অজয়ের বৃষ্টিতে ভেজা ভারী বর্ষাতিটা পড়ে আছে। [illegible] এসেছে বাইরে। কিন্তু ঊর্মিলার চোখ একটু একটু [illegible]। সে-রূপ নেই অজয়ের। সূর্যকিরণের মতো আজ মনে হয় না তাকে। মুখের উগ্র দীপ্তিটাও নেই। ভারী দরদে গলার স্বরটা শুধু চেনা চেনা লাগে।

কবে যাবে? আজ? এখুনি?

যন্ত্রের মতো উর্মিলা বলে, হ্যাঁ—

আমি ট্যাক্সি নিয়ে আসি?

না। আমি দেখছি।

উর্মিলা উঠে দাঁড়ায়। প্রসাধন করবার জন্যে নয়। ঠিক যেমন আছে তেমন করেই সে যাবে অজয়ের সঙ্গে। শিবেন আর বাণীকে সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছে সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উর্মিলা ভাষা সাজিয়ে নেয় মনে মনে।

অদ্ভুত সূক্ষ্ম এক অনুভূতি। ঈর্ষা নেই। অহঙ্কার নেই। উন্মাদনা নেই। কাউকে দেখাবার মতো অজয়ের কিছুই নেই এখন। তবু তার সঙ্গে ও বাড়িতে যাবার আগ্রহে নিবিড় একটা প্রেরণা পায় উর্মিলা।

কেন পায় সে-কথাটা কাউকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে যেতে পারবে না বলেই ছোট একটা নিশ্বাস পড়ে। আস্তে আস্তে সে সিঁড়ি পার হয়ে ওপরে উঠে যায়।